সমসাময়িক
সাহিত্য
সংস্কৃতি
সমাজ
জিজ্ঞাসা

শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮২ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম-২য় যুগ্ম সংখ্যা

পত্রগুচ্ছ ॥

অন্নদাশঙ্কর রায় । **পালাবদল** ॥ ফকীরমোহন সেনাপতি । আত্মজীবনী ॥ রয় জেঙ্কিন্‌স্‌ । সংবাদপত্রের কতোখানি স্বাধীনতা বাঞ্ছনীয় ॥ বারিদবরণ ঘোষ । শিবনাথ শাস্ত্রীর ডায়েরী প্রসঙ্গে ॥ বারট্রাণ্ড রাসেল্‌ । আমার আত্মজীবনীর চুম্বক ॥ সাধনকুমার ঘোষ । পথে-বিপথে ॥ হিরণকুমার সান্যাল । ভ্রমণে উপেক্ষিত ॥ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ । মোহিতলাল-স্মৃতিকথা ॥ চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় । অপরাজিত বিভূতিভূষণ ॥ পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য । পারসী সাহিত্যে চিত্রবেখা ॥ সমাজচিন্তা ।

WE HOPE HIS CHILD ISN'T YOURS..

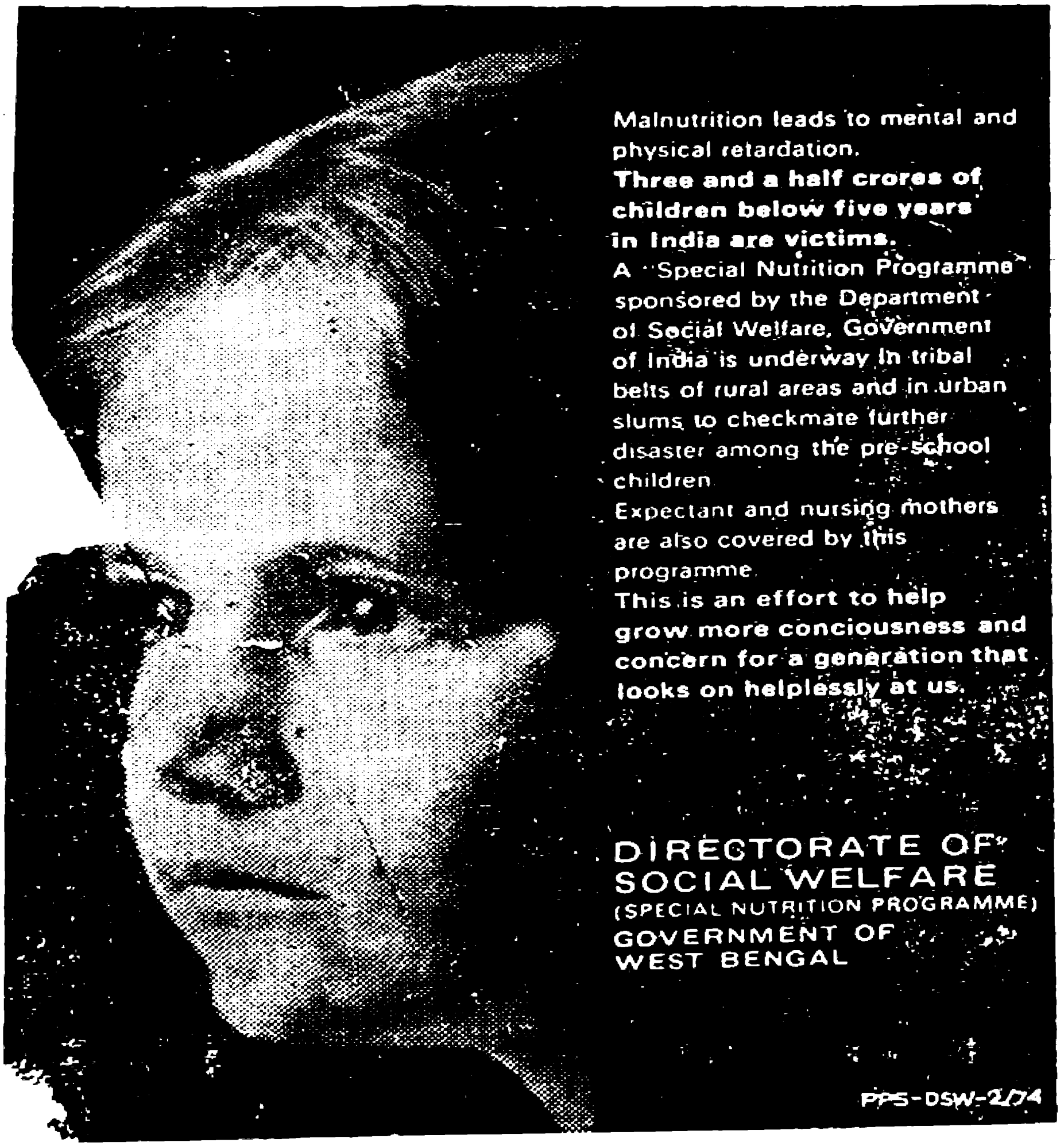

Malnutrition leads to mental and physical retardation.

Three and a half crores of children below five years in India are victims.

A Special Nutrition Programme sponsored by the Department of Social Welfare, Government of India is underway in tribal belts of rural areas and in urban slums to checkmate further disaster among the pre-school children.

Expectant and nursing mothers are also covered by this programme.

This is an effort to help grow more conciousness and concern for a generation that looks on helplessly at us.

DIRECTORATE OF SOCIAL WELFARE
(SPECIAL NUTRITION PROGRAMME)
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

PPS-DSW-2/74

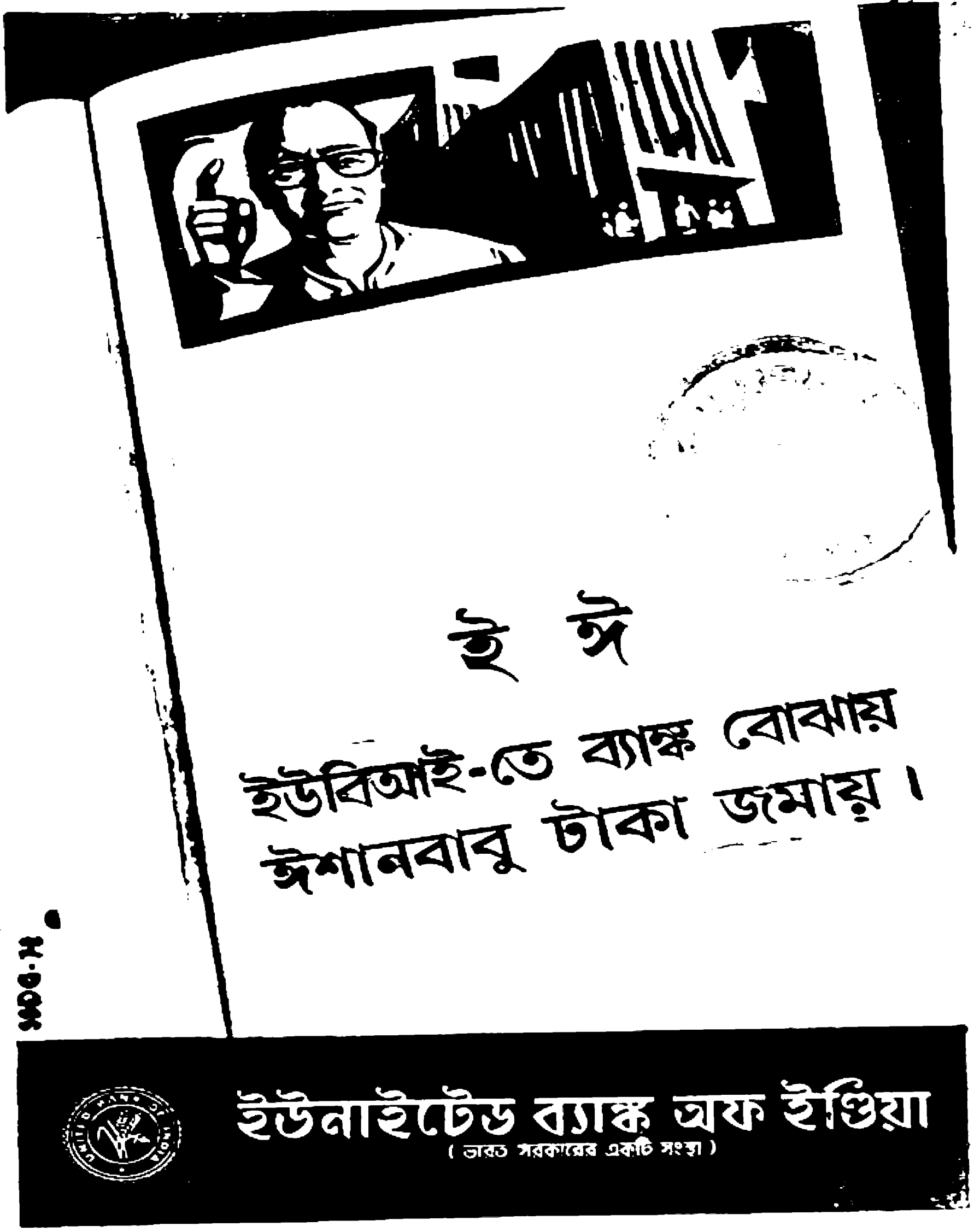
ই ঈ
ইউবিআই-তে ব্যাঙ্ক বোঝায়
ঈশানবাবু টাকা জমায়।
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

আমাদের দেশে বেকারের হার শিক্ষিতের হারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। শুধু বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দেশের বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারছে না। কিন্তু খাদি কমিশন ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামে তার কর্মোদ্যোগ ছড়িয়ে দিয়ে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান করেছে।

তাই আপনি যত বেশী খাদি এবং গ্রামোদ্যোগ সামগ্রী ব্যবহার করবেন ভারতের বেকার সমস্যার সমাধান তত সহজ হবে।

খাদি ভবনে নানারকম খাদি, সিল্ক ও তৈরী বস্ত্রাদি ছাড়াও সরিষার তেল, ঘি, সাবান, মধু, গুড়া মসলা, পাপড় ইত্যাদি পাবেন। বাজারের ভেজালের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলুন।

খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবন

২৪, চিত্তরঞ্জন এভিঃ ও গোলপার্ক—কলিকাতা,
বর্দ্ধমান, আলিপুরদুয়ার।

পশ্চিম বাংলার তাঁতবস্ত্র আমাদের গর্ব্ব আর আনন্দের জিনিষ

পশ্চিম বাংলার তাঁতশিল্প তার রেশম ও সুতীর বিরাট বস্ত্র সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। বয়ন বৈচিত্র্যে আর উৎকর্ষে পশ্চিম বাংলার তাঁতবস্ত্রের তুলনা নাই।

পশ্চিমবঙ্গ তাঁত ও বস্ত্রশিল্প অধিকার কর্তৃক প্রচারিত।

পশ্চিম বাংলার কারুশিল্প
উৎসবে, আনন্দে ও নিত্যপ্রয়োজনে
একান্ত অপরিহার্য

প্রাপ্তিস্থান :

(১) সরকারী বিপণন কেন্দ্র

৭।১ ডি, লিণ্ডসে স্ট্রীট.

কলিকাতা-১৬.

(২) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কারু শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

৮ বি, আর, এন, মুখার্জি রোড,

কলিকাতা-১

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকার কর্তৃক প্রচারিত

চাষ বাস ও ঘর গৃহস্থালীর
নানান সামগ্রী যোগান দিতে এগিয়ে এসেছে

এ্যাগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন
লিমিটেড্

আধুনিক প্রথায় চাষ ও আরো
বেশী ফলনের জন্য পাবেন :—
উন্নত মানের বীজ, রাসায়নিক সার,
জৈব সার,
রোগ ও কীটনাশক ঔষধ,
মাটি সংশোধন করার সরঞ্জাম,
জেটর ট্রাক্টর
কিউবোটা পাওয়ার টিলার
সুজলা পাম্প
হস্ত চালিত বেনাগ্রো স্প্রেয়ার
বেনাগ্রো পাওয়ার থ্রেসার

ঘর গৃহস্থালীর দৈনন্দিন
সামগ্রীর মধ্যে পাবেন :—
ফলজাত জিনিষের বিভিন্ন রকম
মুখরোচক খাবার এবং সূর্য্যমুখী
ও তিলের তেল।

আমাদের অগ্রগতিতে আপনাদের শুভেচ্ছা কামনা করছি।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন লিমিটেড

২৩ বি, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা-৭০০০০১

গ্রাম : এগ্রিনপুট

ফোন : ২২-২৩১৪
(৩টি লাইন)

WE ALSO HELP
BUILD UP A NEW BENGAL

* We finance the poor farmer in his cultivation through Co-operatives
* We finance Engineers' Co-operatives
&
Industrial Co-operatives to provide gainful employment to the unemployed Youth of Bengal
* We assist transport-workers through Co-operatives
* We also help hold the price line through financing of Consumers' Co-operatives

We Are Here To Serve Bengal Even With Our Small Means

K. D. SEN GUPTA, M. L. A,
CHAIRMAN

West Bengal State Co-operative Bank Limited
24/A, Waterloo Street, Calcutta-1

আজকাল সকলেরই সময় কম। বাড়ির কাছাকাছি দোকানে কেনাকাটা করাই সুবিধে। এই কাছেই আমাদের দোকান 'তন্তুজ'। এবার পূজোবাজারের সময় দেখতে আসুন।

'তন্তুজ'

বাংলার তাঁতের কাপড়—শাড়ী * ধুতি * বিছানার চাদর,
লুংগি * সার্টিং, তোয়ালে ইত্যাদি।
চাহিদার সময় দাম বাড়ে না

কম খরচে আভিজাত্য আনবে 'তন্তুজ'

দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট্ হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটী লিমিটেড

৬৭, বঙ্গীদাস টেম্পল্ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৪

গ্রাম : কো-হ্যাণ্ডপুম ফোন : ৩৫-৩৬৫৮
৩৫-৬৩৪৮

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক
প্রকাশিত দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

চিন্তা-ভাবনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক ও অন্যান্য যাঁদের বিশিষ্ট অবদান আছে, তাঁদের চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধাদি এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের আর্থনীতিক এবং সামাজিক পুনরুজ্জীবনে গভীরভাবে আগ্রহান্বিত তাঁদের কাছে এই গ্রন্থটি মূল্যবান বলে বিবেচিত।

•

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি

মূল্য ঃ সাড়ে পাঁচ টাকা

লোক-সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক ও অনুরাগীদের পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক সংকলন-গ্রন্থ।

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

প্রকাশন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণালয়
৩৬, গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭

প্রকাশন বিক্রয়কেন্দ্র, নিউ সেক্রেটারিয়েট
১, কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলিতাকা-১

প. ব. (তথ্য জনসাযোগ)···৩১৩১ / ৭৫

পশ্চিমবঙ্গে

আপনার কলকারখানার উদ্যোগ করুন
শিল্পকে সাহায্যদানের মেয়াদ আরও
তিন বছর বাড়ানো হয়েছে

গত আর্থিক বছরে অর্থাৎ মার্চ ৩১, ১৯৭৫ পর্যন্ত ডব্লু-বি-আই-ডি-সি এই পরিকল্পনা অনুযায়ী অনেকগুলি শিল্পকে সাহায্য করেছেঃ

পরিকল্পনাকে রূপায়ণের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে গবেষণা—১০
বিক্রয় কর ফেরত—২৭
বৈদ্যুতিক শক্তি পরিপূরণ—১৭
অকট্রয় ফেরত—২১
শেয়ার মূলধন—১৩

রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গে শিল্পকে সাহায্যদানের মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছেন।

ডব্লু-বি-আই-ডি-সি, সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে, মাঝারী এবং বড় শিল্পোদ্যোগগুলিকে নানারকম আকর্ষণীয় সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত।

বিস্তারিত বিবরণের জন্যে যোগাযোগ করুন :

পাবলিক রিলেসন্স অফিসার

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশন লিমিটেড

২৩-এ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১

টেলিফোন : ২২-২৪৪৮

আলেখ্য

৬ষ্ঠ বর্ষ | আষাঢ়-শ্রাবণ.
১ম ও ২য় যুগ্ম-সংখ্যা | ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৮২

সূচীপত্র

দুঃসময় ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ১

পত্রগুচ্ছ ঃ বিভূতিভূষণ, অর্দ্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, দিলীপ-কুমার রায়-এর পত্রাবলী ॥ ৩-১২

প্রবন্ধ ঃ পালা-বদল ॥ অন্নদাশঙ্কর রায় ॥ ১৩ ॥ সংবাদপত্রের কতখানি স্বাধীনতা বাঞ্ছনীয় ॥ রয় জেঙ্কিন্‌স্ ॥ ৩২ ॥ শিবনাথ শাস্ত্রীর কিছু অপ্রকাশিত ডায়েরী প্রসঙ্গে ॥ বারিদবরণ ঘোষ ॥ ৪৯ ॥ পারস্য সাহিত্যের চিত্ররেখা ॥ পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য ॥ ৯৮ ॥ হজরত আমীর খসরু দেহল্‌ভী ॥ জগদীশনারায়ণ সরকার ॥ ১০৫

বিচিত্র প্রবন্ধ :—মোহিতলাল স্মৃতিকথা ॥ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ॥ ৪৭ ॥ অপরাজিত বিভূতিভূষণ ॥ চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় ॥ ১৩৭ ॥ পথে-বিপথে ॥ সাধনকুমার ঘোষ ॥ ১১৩ ॥ ভ্রমণে উপেক্ষিত ॥ হিরণকুমার সান্যাল ॥ ১৪৫

আত্মজীবনী :—আত্মজীবনচরিত ॥ ফকীরমোহন সেনাপতি ॥ ১৯ ॥ আমার আত্মজীবনীর চুম্বক ॥ বারট্রাণ্ড রাসেল ॥ ৮৭

কবিতা :—বোধন ॥ হরপ্রসাদ মিত্র ॥ ৪০ ॥ সময়কে নিয়ে ॥ গোপাল ভৌমিক ॥ ৪১ ॥ প্রবীণ বৃক্ষের মতো ॥ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ৪১ ॥ একটী প্রেমে কবিতা ॥ আলোক সরকার ॥ ৪২ ॥ জীবন অন্ত আকাশ ॥ নচিকেতা ভরদ্বাজ ॥ ৪৩ ॥ একা ॥ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥ ৪৪ ॥ নামিল আঘাত ॥ নির্ম্মোক ॥ ৪৫ ॥ মুখ ॥ বীতশোক ভট্টাচার্য ॥ ১১০ ॥ খেলা ॥ বাজীরাও সেন ॥ ১১১ ॥ হলুদ ফুলের বনভূমি ॥ গীতাঞ্জলি বিশ্বাস ॥ ১১২ ॥ নেমেই চলেছি ॥ মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ॥ ১১২

উপন্যাস :—আঁধারের ওপারে ॥ মৈনাক ॥ ৬৫

সমাজচিন্তা—সংস্কৃতি প্রসঙ্গ ॥ ১৪৯-১৬০ ॥ গ্রন্থ সমালোচনা ১৬০ ॥

সম্পাদক—ক্ষিতীন্দ্র চন্দ্র ঘোষাল
৫০, সন্তোষপুর এভিনিউ
কলকাতা—৩২

বার্ষিক গ্রাহক-চাঁদা
(সডাক) নয় টাকা মাত্র

শারদীয় সংখ্যা
১৩৮২

আলেখ্য

আষাঢ়-শ্রাবণ,
ভাদ্র-আশ্বিন,
যুগ্ম সংখ্যা

দুঃসময়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্ দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা ॥

এ নহে মুখর বন-মর্মর গুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে ।
এ নহে কুঞ্জ কুন্দ-কুসুমরঞ্জিত,
ফেন হিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে ।
কোথা রে সে তীর ফুল-পল্লব-পুঞ্জিত,
কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয়-শাখা ।
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা ॥

এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শর্বরী,
ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত-অচলে ।
বিশ্ব-জগৎ নিশ্বাসবায়ু সম্বরি',
স্তব্ধ আসনে প্রহর গনিছে বিরলে ।
সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি'
দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা ।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা ॥

ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি' অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি তোমা পানে আছে চাহিয়া।
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি'
শত তরঙ্গে তোমাপানে উঠে ধাইয়া।
বহুদূর তীরে কা'রা ডাকে বাঁধি' অঞ্জলি
এসো এসো সুরে করুণ মিনতি-মাখা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা॥

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ-মোহবন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুল-শেজ রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন
ঊষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির আঁকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা॥

[বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের সৌজ

বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীঅরুণেন্দ্রমণি দত্তকে লিখিত]

বারাকপুর, সোমবার

(১)

কল্যাণভাজনেষু

অরুণেন্দ্র, আমার পিঠের কার্ব্বঙ্কলের কথা নিশ্চয়ই শুনেছ। আজ দেড়মাস ভুগছি। এখন অনেক সেরে উঠেছি। বাবলুরও অসুখ হয়েছিল। এখন সেরেছে—তবে ভাত খায়নি। তোমরা এসেছ খুবই আনন্দের কথা। আমি ও তোমার কাকীমা ভাল আছি অন্তদিক দিয়ে। সেরে উঠে একদিন তোমার ওখানে যাবো—হেঁটেই যাবো। দত্তকে কাল বাজারে জিগ্যেস করেছিলাম—বল্লে ১৬ মাইল রাস্তা। আমাদের বাড়ীতে লোকের বড় অভাব—তোমার কাকীমা বাবলুকে নিয়ে বিব্রত—কাজেই কোথাও নড়তে পারিনা হটাৎ। আজ কলকাতায় যাবো বিশেষ কাজে। ২/৩ দিন পরে ফিরবো। হেঁটে দত্তপুলিয়া যাওয়ার কথাটা আমায় লিখো। কোন কোন পথ দিয়ে যেতে হবে। পল্লীবাংলার বিভিন্ন রূপের মধ্যে দিয়ে সে বিচিত্র পথযাত্রা আমায় বড় আনন্দ দেবে।

তোমার বাবা ও মাকে নমস্কার দিও। তুমি আশীর্ব্বাদ নিও। ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্রপরিচিতি :

চিঠির উপরে কোন তারিখ নেই, কিন্তু পোষ্টঅফিসের ছাপে দেখা যায় ২রা মে ১৯৪৯ সাল।

বাবলু—বিভূতিভূষণের পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার কাকীমা—শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

দত্ত—গোপালনগর স্কুলের শিক্ষক নিতাইপদ দত্ত

তোমার বাবা ও মা—৺অপূর্বমণি দত্ত ও ৺সুশীলাবালা দত্ত।

দত্তপুলিয়া—নদীয়া জেলার অন্তর্গত ইছামতী নদীর তীরবর্ত্তী গ্রাম।

(দ্রষ্টব্য : এই পত্রের মূলের অনুলিপি ও পরিচিতি শ্রীঅরুণেন্দ্রমণি দত্তের নিকট হতে পাওয়া গেছে। —শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।)

[শ্রীযুক্ত অরুণ কুমার সেনকে লিখিত]

(১)

ঘাটশিলা পোঃ, গৌরীকুঞ্জ
১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫

কল্যাণভাজনেষু,

তোমার পত্র পেয়ে সুখী হয়েছি। যে সাধুর কথা লিখেছিলাম, তিনি এখান থেকে ২৫০ মাইল দূরে গয়া জেলার অন্তর্গত এক অরণ্য প্রদেশে বাস করেন। গত শ্রাবণ মাসে তারই নিকটবর্ত্তী বারকাট্টা নামক স্থানের ডাক-বাংলায় আমি সাত-আটদিন ছিলাম, সেই সময় ওঁর সঙ্গে দেখা হয়। এখন আছেন কিনা জানিনা।

'ছোটদের পাততাড়ির' দল ঘাটশিলায় এসেছিল এবং আমি ওদের একটি সভায় সভাপতিত্ব করি, 'যুগান্তর'এ নিশ্চয়ই দেখে থাকবে। তবে পাহাড়-জঙ্গল দেখবার চোখ ওদের তৈরি হয়নি।

মহুখুটি চা বাগানের বর্ণনা পড়ে আমার বড় কৌতূহল জেগেছে আরও জানবার। আমায় লিখো ওর বিস্তৃত বর্ণনা। কোথায় কি ভাবে যেতে হয় ওখানে যেতে হোলে? ভগবানের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করতে গেলে তাঁর সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে দিয়েই তা করতে হয়। তাঁকে আর কোথায় পাচ্চি? ঐ সোপানের ধাপে ধাপে উঠে তবে তাঁর কাছে পৌছুনো যায়। নয় কি?

তোমার দুই কাকার কথা আমার বড় ভাল লাগলো। ওদের বোলো আমার কথা। আমার বন্ধুত্বের কথা তাদের কাছে পৌছে দিও।

খোকার নাম বাবলু। তার একটা ফটো তোমায় পাঠাবো। তেরো মাস মাত্র বয়েস।

আমি চিঠি না দিলেও তুমি মাঝে মাঝে চিঠি দিও। তোমার বাড়ির সবাইকে আমার নমস্কার জানিও। তুমি নিও আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা।

ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

ঘাটশীলা ১৬-১-৫০

কল্যাণবরেষু,

অরুণ, বড় আশ্চর্য্যের কথা যে তুমি আমার পত্র পাওনি। তোমার সেই 'আকো পাকো পিপল পাকো' লেখা চিঠি পড়ে আমার বড় ভাল লাগে এবং

আমি তার একটা দীর্ঘ উত্তর দিই। ঘাটশিলা থেকেই সে পত্রখানা লেখা। তুমি কেন সে চিঠি পাওনি? আমি বরং ভাবচি তুমি কেন আমাকে উত্তর দিচ্চনা! তোমার কথা প্রায়ই মনে ভাবি। এই পত্র পেয়েই উত্তর দেবে।

এখানে বড় শীত পড়েচে। গত সপ্তাহে আমার নতুন উপন্যাস 'ইছামতী' প্রকাশ হয়েছে। আমি কলকাতায় গিয়েছিলুম, দেখে এসেচি। মধ্যে মাসখানেক আগে সারাণ্ডা অরণ্যে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলুম—অদ্ভুত সব সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্থান দর্শন করে এসেচি। ঠিক যেন আফ্রিকা বলে মনে হবে এক এক জায়গায় নিবিড় অরণ্যের রূপ দেখে।

বাবলুর ফটো এবার একটা তোলা হবে, তারপর পাঠাবো। সামনের পত্রের সঙ্গে পাবে। তোমার পাঠানো ফটোটা খুব চমৎকার। তুমি কি ছবি তুলে থাকো? তোমার দাদা ভাল ছবি তোলে।

অরুণ, তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে। যদি কলকাতায় আস এ বছরে, আমায় খবর দিও। তোমার সুন্দর মন আমায় বড় আনন্দ দিয়েছে। আশীর্ব্বাদ করি জীবনে উন্নতি কর। পত্র দিও ঠিক।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার সেই খামের চিঠিখানা (যাতে বনপাদপের বর্ণনা ছিল) ছাড়া আমি তোমার আর কোনো পত্র পাইনি কিন্তু। 'দেবযান' তোমাদের ভাল লেগেছে জেনে সুখী হয়েছি। তোমার যে বন্ধুর পিতৃবিয়োগ হয়েচে, তাকে বলো আমায় পত্র যেন দেয়, আমি বুঝিয়ে দেবো।

প্রসিদ্ধ কলাসমালোচক ও ভারততত্ত্ববিদ
অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্র

[শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

(১)

2, Ashutosh Mukherjee Road,
Calcutta-20
17 : January 1959

Dear Friend,

I was very interested to hear of your cultural organisation at Barrackpur. What is the number of members who support your Sanskriti Parisad. How much money you can pull from subscriptions or donations. Generally—our

Cultural Societies—are only interested in Literature, Singing and Dancing—but they boycott the Great Visual Arts of India.

You should develop an active interest—in the study of Indian Painting, Sculpture & Architecture. We now pay an exaggerated attention to Literature, Poetry & Fiction—and thoroughly boycott—the Visual Arts. Rabindranath—wrote poetry, as well as painted *picture*.

Have you seen—any old number of my journal RUPAM—which I edited for 11 years (1920-31). I am going to revive and republish it—from the beginning of this year. I am relying on the support and subscriptions from our nationalists—in Free India—to support this great Journal which has been acclaimed as "The Finest Art Journal—ever published from any part of the World".

With my good wishes,

Yours sincerely.
Sd/-O. C. Ganguly.

Sri Chandidas Chatterjee,
General Secretary,
Sahitya-O-Sanskriti Parishad
"Aranyak"
Station Road,
P. O. Barrackpore,
24-Parganas

(২)

2 Ashutosh Mukherjee Road,
Calcutta-20,
25th Jany. 1959

Dear Friend,

On the 12th January, you wrote to me, that your members are enthusiastic about my famous Art Journal Rupam. On the 15th instant I sent you Prospectus of the Journal. As the Journal will be printed only in such number of copies—as are actually subscribed for—it will

not be possible to procure the Journal afterwards. Please get your members to send their subscriptions.

Yours sincerely,
Sd/-O. C. Ganguly.

Sri Chandidas Chatterjee,
General Secretary,
Sahitya & Sanskriti Parisad,
Aranyak, Station Road,
P. O. Barrackpore, 24-Parganas.

(৬)

O. C. Gangoly

Phone No. : 47-1710
2. Ashutosh Mukherjee Road
Calcutta-20, India,
Dated the 27. 12. 1967

Dear Mr. Chatterjee,

Your letter dated 7th Dec. '67 reached my hands only 2 days ago. I can send you a colour print of A. N. Tagore's "Radhika" Printed in London, It will cost Rs. 10/-each.

As regards "Rupam" I can supply you with 2 loose numbers of "Rupam" at Rs. 20/-each. They are purchased by Americans at Rs. 50/-each. On hearing from you I will do the needful.

Even at your service.

Yours sincerely,
Sd/-O. C. Gangoly.

(৪)

2, Ashutosh Mukherjee Road.,
Calcutta—20
1. 1. 68

My Dear Friend,

I am sure, you have received my letter. Please come and see me as soon as possible. I wish you a happy New Year.

Yours sincerely.
Sd/-O. C. Gangoly,

(৫)

2 Ashutosh Mukherjee Road.,
5. 1. 68

My dear friend,

I have written to you three letters which I am sure you have received.

Kindly let me know on what date you will call on. me.

Yours sincerely
Sd/-O. C. Ganguly.

(৬)

2, Ashutosh Mukherjee Road,
Calcutta-20
9th Jan. 68

My dear friend,

I have written to you several letters, with no reply. Kindly let me know immediately when you can come to meet me.

Yours sincerely,
Sd/-O. C. Ganguly.

(৭)

2, Ashutosh Mukherjee Road.,
Calcutta-20
15. 2. 68

My Dear Friend,

Please let me know on what day you will call on me.

Yours sincerely,
Sd/-O. C. Gangoly.

P. S. I attach Post Card for reply.

(৮)

2, Ashutosh Mukherjee Road.,
Calcutta-20
6. 3. 68

My dear Friend,

I wish to consult you about some publications.

Would you kindly call on me as soon as convenient.

I will leave Calcutta for Varanasi for two weeks on the 22nd March next.

Good wishes,

Yours sincerely,
Sd/-O. C. Gangoly.

অর্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলী (ও. সি. গাঙ্গুলী)-র চিঠি

(৯)

২, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা—২০

১৭।১।৬৮

প্রিয় বন্ধু,

আপনার পত্রে আপনার পিতার মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। আশাকরি ভগবান আপনাকে এই মর্ম্মান্তিক শোক সহ্য করিবার শক্তি দিবেন।

ভবদীয়
ও, সি, গাঙ্গুলী

(১০)

শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়
"শ্যামা"
স্টেশন রোড, পোঃ ব্যারাকপুর
জেলা ২৪ পরগণা।

১৮।১।৬৮

মহাশয়,

আপনার পিতৃদেবের শ্রাদ্ধবাসরের নিমন্ত্রণ পাইয়া সম্মানিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার চক্ষুতে অপারেশন হওয়ায় আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হইবে না। আশাকরি আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

ও. সি. গাঙ্গুলী

শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়
শ্যামা
স্টেশন রোড, ব্যারাকপুর
২৪ পরগণা।

(১১)

ডি ৪৮।১৩৫ মিশ্রীপুকুর
বেনারস সিটি
শনিবার ৬।৪।১৯৬৮

প্রিয় বন্ধু,

আপনাকে জানাই যে আমরা বুধবার ১০ই এপ্রিল সকালে কলিকাতায় পৌছাইব।

আপনি তাহার পরে আপনার সুবিধামত আমার সঙ্গে সন্ধ্যার দিকে দেখা করিবেন। পূর্বে সংবাদ দিয়া আসিলে ভাল হয়। সুধা বসুকে হাজির থাকিতে বলিব। ইতিমধ্যে—সুধার পুস্তকের প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে পারেন ত চেষ্টা করিবেন। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবেন। ভবদীয়

ও, সি, গাঙ্গুলী

শ্রীচণ্ডীদাস চ্যাটার্জ্জি
ষ্টেশন রোড, ব্যারাকপুর.
পশ্চিমবঙ্গ, ২৪ পরগণা

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের পত্র

(১)

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
২৬।১২।৬৮

প্রিয়বরেষু.

চণ্ডীদাস বাবু,

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বাবুর[১] সঙ্গে আপনার সস্নেহের উপহার "অলৌকিক"[২] পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম। বিভূতিভূষণ[৩] আমার বন্ধু ও ভ্রাতার তুল্য তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যিক। তাঁর পুস্তকের আদর ও প্রশংসা সর্ব্বত্র। আপনার ভগ্নী[৪] (বিভূতি ভূষণের স্ত্রী) আমাকে জানেন—বার্নপুরে বিভূতি ভূষণ সস্ত্রীক এসেছিলেন সেই সময় দেখা। আপনার সব সংবাদ জানতে চাই। "বিভূতি প্রকাশন" বড় প্রতিষ্ঠান হোক আমি আশীর্ব্বাদ করি। আপনার সাফল্য ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

ইতি শুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়
ষ্টেশন রোড
পোঃ ব্যারাকপুর, জেলা ২৪ পরগণা।

পরিচিতি :

১। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মজুমদার

২। "অলৌকিক" বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি গল্প-সংকলন

৩। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক

৪। বিভূতিভূষণের পত্নী শ্রীযুক্তা রমা বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাক নাম কল্যাণী)

(২)

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
নূতন হাট পোঃ, বর্দ্ধমান
৭।২।৭০

প্রিয়বরেষু,

আপনার সুন্দর পত্রখানি পড়িয়া বড় আনন্দিত হইলাম, উহা উপাধি[১] প্রাপ্তির চেয়ে আমাকে বেশী আনন্দ দিয়াছে। আপনাদের স্নেহ প্রীতি ভালবাসা আমার পরম সম্পদ। দীর্ঘজীবি যশস্বী ও পরম সুখী হোন। বহু ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। ইতি

স্নেহধন্য
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়
"আরণ্যক"
ষ্টেশন রোড, পোঃ ব্যারাকপুর
জেলা, ২৪ পরগণা।

১। 'পদ্মশ্রী' উপাধি প্রাপ্তির পরে অভিনন্দন বার্ত্তার উত্তরে কবি কুমুদরঞ্জন এ পত্র লেখেন।

সঙ্গীতজ্ঞ, সুরকার ও আশ্রমিক শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের পত্র

[চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

ওঁ

১৩।১।৭৩
হরিকৃষ্ণ মন্দির
পুনা ১৬

কল্যাণীয়েষু,

আমার প্রবন্ধটি[১] ছাপতে পারো স্বচ্ছন্দে। কিন্তু আমি ভুলে গেছি কী লিখেছিলাম।

তুমি সম্পাদক মণ্ডলীতে সুপ্রতিষ্ঠিত তাই লিখছি—আমার "জীবনমুক্ত

গুরুদয়াল''[২] দেশে[৩] বেরিয়েছিল আট কিস্তিতে। বইটির কোনো সম্পাদক—সাধু প্রকাশক যোগাড় করতে পারো কিনা। বইটির ইংরাজী সংস্করণ বম্বেতে ছাপা হয়েছে, এখন বাংলা প্রবন্ধটি ছাপলে ষোল কলা সম্পূর্ণ হয়।

নববর্ষের প্রীতি নিও। মিত্র এণ্ড ঘোষ তো পকেট এডিশন বই বার করেছেন—কেমন বই, এক কপি পাঠাতে পারো।

কলকাতায় আমার তিনটি বই যন্ত্রস্থ। নিউইয়র্কে আমার একটি ইংরাজী স্মৃতিরচনা ম্যাকমিলান[৫] নিয়েছে। ওদেশে আমার লেখা সমাদৃত। তাই আশাকরি আমার জীবনমুক্ত গুরুদয়ালও সমাদৃত হবে এদেশে। যাই হোক তোমার অভিমত জানিও।

আমার নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা নিও।

ইতি—

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়
"আরণ্যক"
ষ্টেশন রোড, পোঃ ব্যারাকপুর
২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ

১। 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র উপরে লেখা প্রবন্ধ।
২। গুরু দয়াল মল্লিক ('বিশ্ব ভারতী'র অধ্যাপক)
৩। প্রসিদ্ধ বাংলা সাপ্তাহিক পত্র
৪। প্রসিদ্ধ বাংলা গ্রন্থের প্রকাশক
৫। ইংরেজি গ্রন্থের পৃথিবী বিখ্যাত প্রকাশন-সংস্থা

[এই পত্রগুচ্ছের সমস্ত পত্রের অনুলিপি শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের মারফত পাওয়া গেছে এবং তাঁরই সৌজন্যে প্রকাশিত হলো।—স. আলেখ্য]

পালা বদল

অন্নদাশঙ্কর রায়

"বামুন গেল ঘর। লাঙল তুলে ধর।" সেই যে একটি প্রবাদ আছে সেটি আমি দেড় বছর আগে বাংলাদেশ থেকে ফিরে এসে আমার একটি প্রবন্ধে ব্যবহার করেছি। তা দিয়ে এই কথাই বোঝাতে চেয়েছি যে শেখ মুজিবর রহমান চলে গেলে সেকুলারিজমের পাটও উঠে যাবে। শব্দটি বিদেশ থেকে আমদানী। তার অর্থ ও অনুষঙ্গ দেশের লোকের অজানা। সেটা কেবল বাংলাদেশেই নয়, ভারতেও। তবে ভারতের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা পাঁচ পুরুষ ধরে সেকুলার। সরকারী স্কুল কলেজে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয় না। মিশনারী স্কুলগুলি ও তাদের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মুসলমান শিখ ও আর্যসমাজী স্কুলগুলির কথা আলাদা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্নপত্র থাকে না। কলেজে একদা সবাইকে ইংরেজীর অঙ্গ হিসাবে বাইবেল পড়তে হতো। তার ভাষা উত্তম ইংরেজীর উদাহরণ। ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্ররা বাইবেলের সাহিত্যিক মূল্য মানতেন। তাত্ত্বিক মূল্য উপেক্ষা করতেন।

হিন্দুর ছেলেরা পাঁচ পুরুষ ধরে ইংরেজী শিক্ষায় লালিত। বিশেষত তিনটি তৎকালীন প্রেসিডেন্সীতে। মুসলমানের ছেলেরা পাঁচ পুরুষ ধরে নয়, তিন পুরুষ ধরে ও তাও খুব কম সংখ্যায়। শিক্ষা থেকে যে সেকুলার বিচার বিবেচনা দৈনন্দিন জীবনে প্রবেশ করে সেটা রাজনীতিতেও ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়। সেইজন্যে শিক্ষিত হিন্দুদের রাজনৈতিক আদর্শ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাদিবস থেকেই সেকুলার। আর শিক্ষিত মুসলমানদের রাজনৈতিক আদর্শ মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা দিবস থেকেই ধর্মীয়। মুসলিম লীগ যতদিন মুসলিম সম্প্রদায়ের মনের উপর রাজত্ব করেছিল ততদিন সেকুলারিজমের নাম-গন্ধ ছিল না। তার প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী মুসলিম লীগও মাঝখানকার বিশেষণটি বাদ দিতে প্রথমদিকে সাহসী হয়নি। যখন বাদ দিতে সাহস পায় তখন থেকেই সেকুলারিজমের সূচনা। সে পার্টির পূর্বে অবশ্য কৃষকপ্রজা পার্টির পত্তন হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষিত মুসলমানদের মনের উপর তেমন কোনো প্রভাব ছিল না সে পার্টির। তার নেতারা মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে

বিলীন হয়ে যান। পরে আবার মাথা তুললেও মাথা খাড়া রাখতে পারেন না।

পার্টিশনের পরে আধুনিক আদর্শের শিক্ষাবিস্তার বিপুল পরিমাণে হয়েছে। তবু তার মূল তত গভীর নয় শাখাপ্রশাখা যত ব্যাপক। এক পুরুষে ওর বেশী গভীরতা প্রত্যাশা করা যায় না। বিশেষত এমন এক দেশে যেখানে ভোট পেতে হলে ধর্মের দোহাই দেওয়া দেশের দোহাই দেওয়ার চেয়ে লাভজনক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন নিহত। তিনি শেখ মুজিবর রহমান। চারজন বন্দী। তাঁরা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামান। বাকী একজন এখন ক্ষমতার শীর্ষে। তিনি খোন্দকার মুস্তাক আহমদ। এই একজনের উপরেই নির্ভর করছে সেকুলার সূত্রটির ভবিষ্যৎ। ইনি তাকে রাখতেও পারেন, ছাড়তেও পারেন। এঁর এখন সর্বময় কর্তৃত্ব।

পাকিস্তানী আমলেও হিন্দুকে কেন্দ্রীয় তথা প্রাদেশিক সরকারে মন্ত্রীপদ দেওয়া হয়েছিল, হাইকোর্টের বিচারপতি পদ দিতেও বাধেনি। খ্রীস্টানকে দেওয়া হয়েছিল সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাস্টীস পদ। ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান বিধর্মীদের একেবারে বঞ্চিত করেনি। সেকুলার স্টেট হওয়া না হওয়া সংখ্যা-লঘুকে উচ্চতর পদ দেওয়া না দেওয়ার দ্বারা নির্ধারিত হয় না। গজনীর মাহমুদেরও হিন্দু সেনাপতি ছিলেন, রণজিৎ সিংহেরও মুসলিম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁদের রাষ্ট্র ছিল ইসলামী রাষ্ট্র বা শিখ রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের সেকুলার চরিত্র যার দ্বারা নির্ধারিত হয় সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যাপারে ধর্মের আশ্রয় না নেওয়া আর ধর্মীয় ব্যাপারে রাজনীতিকে প্রশ্রয় না দেওয়া। পাকিস্তান এই দুটি মানদণ্ডকেই অস্বীকার করে এসেছে। এদিক থেকে সে আধুনিক নয়, মধ্যযুগীয়। আর ভারত মধ্যযুগীয় নয়, আধুনিক। পাকিস্তানের নিকটতম প্রতিবেশীর সঙ্গেই তার কালগত বৈপরীত্য। আফগানিস্তান ও ইরানও অপেক্ষাকৃত আধুনিক, কিন্তু সৌদী আরব তা নয়, অধিকাংশ আরব রাষ্ট্র তা নয়, মুসলমান অধ্যুষিত অধিকাংশ রাষ্ট্র তা নয়। অথচ খ্রীষ্টান অধ্যুষিত ও বৌদ্ধ অধ্যুষিত রাষ্ট্রগুলির বেলা ঠিক বিপরীত নিয়ম।

দুনিয়াকে ধর্ম অনুসারে ভাগ করা আজকাল ইসলামধর্মী জোটের বাইরে আর কোনো দেশ করে না। একমাত্র ব্যতিক্রম ইসরায়েল। আরব তথা ইসরায়েল এখনও ধর্মযুদ্ধের কল্পনায় বিভোর। ভারতের মতো এ যুদ্ধে নিরপেক্ষ না থেকে পাকিস্তান আরবদের ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়েছে ও

বাংলাদেশকেও সেখানে টেনেছে। ভারতও আরবদের প্রতি এ বিরোধে সহানুভূতিশীল, কিন্তু তারা মুসলমান বলে নয়, তারা আরব বলে। আরবদের মধ্যে খ্রীষ্টান আরবও আছে। যেমন ভারতীয়দের মধ্যে আছে মুসলিম ভারতীয়। আরব শব্দটা ধর্মবাচক নয়; দেশবাচক তথা জাতিবাচক। ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিলেই কেউ আরব বলে গণ্য হয় না। আরব বংশে যাদের জন্ম তারা ধর্মে মুসলমান না হলেও আরব। যেমন কবি খলিল জিব্রান। যেমন প্যালেষ্টাইন গেরিলানেতা জর্জ হাবাশ। লেবাননও আরব রাষ্ট্র, কিন্তু আধাআধি খ্রীষ্টান। তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বানাতে গেলে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে।

বাংলাদেশ বলতে বোঝায় বাঙালীদের দেশ। তা হলে কথায় কথায় বলা হচ্ছে কেন মুসলিম কান্ট্রি? অধিকাংশ লোক ধর্মে মুসলমান, তবু তুরস্ককে কেউ বলে না সে মুসলিম কান্ট্রি। কামাল আতাতুর্ক তাকে সেকুলার স্টেট করে যান। তাঁর পরে আবার সে পিছু হটে। কিন্তু তার মুখটা ইউরোপের দিকে বলে সে আবার সামনের দিকে পা ফেলে। সে ইসরায়েলকে গোড়া থেকেই স্বীকৃতি দিয়েছে ও তার সঙ্গে লড়তে চায়নি। যুদ্ধ বাধলে সে নিরপেক্ষই থাকবে। তবে তার সহানুভূতি আরবদের প্রতি। যেমন ভারতের সহানুভূতি আরবদের প্রতি। কারণ ইসরায়েল তাদের জন্মভূমি অধিকার করেছে।

আরবরা বলে বটে তারা এক নেশন। কিন্তু কোথায় তার বহিঃপ্রকাশ? ধর্ম এক, ভাষা এক, জাতি এক, অবস্থানও পাশাপাশি, তবু মরক্কো, আলজিরিয়া, টিউনিস এক রাষ্ট্র হতে চায় না। মিশর, সুদান, লিবিয়া এক রাষ্ট্র হতে চাইলেও হতে পারছে না। সীরিয়া, জর্ডান, ইরাক এক রাষ্ট্র হবে না। সৌদী আরব, উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেন, সংযুক্ত আমীরশাহী, কুবাইত, কাতার, আবু ধাবি প্রভৃতি এক রাষ্ট্র হতে নারাজ। এক রাষ্ট্র না হলে এক নেশন হওয়া মুখের কথা। জার্মানরাও হাজার বছর ধরে বলে এসেছিল যে তারা এক নেশন। তবু বিসমার্কের পূর্বে জার্মানী নামক এক রাষ্ট্র সংগঠিত হয়নি। অষ্ট্রিয়া তাতে যোগ দেয়নি। হিটলার তাকে জোর করে জুড়ে দিয়েছিলেন। হিটলারের পর জোড় খুলে গেছে। জার্মানী নিজেই দু'ভাগ হয়ে গেছে।

এই তো আরবদের ঘরের হাল। ইসলাম এক্ষেত্রে ব্যর্থ। মুসলিম লীগ স্বপ্ন দেখেছিল ভারতের মুসলমানরা এক নেশন হিসাবে ইসলামের ভিত্তিতে

পাকিস্তান বলে এক রাষ্ট্র পত্তন করবে। সে স্বপ্ন সফলও হয়েছিল। কিন্তু স্বপ্ন যখন ভেঙে গেল তখন বাস্তবের উপর জোর খাটাতে গিয়ে ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণনাশ হলো। এখনো কি সকলের স্বপ্নসাধ মিটেছে? না, পশ্চিম পাকিস্তানীরা এখনো আশা ছাড়েনি যে দুই পাকিস্তান মিলে আবার এক হয়ে যাবে। বাংলাদেশেও তাদেরই মতো আশাবাদী আছে। "আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু, হায়" এর মধ্যেই ভুলে গেছে। তবে যারা বাস্তববাদী তারা বোঝে দুই দেশ আর এক দেশ হবে না, দুই রাষ্ট্র আর এক রাষ্ট্র হবে না, দুই নেশন আর এক নেশন হবে না। তা সত্ত্বেও তাদের অনেকেরই বিশ্বাস মুসলমানে মুসলমানে এমন এক আশ্চর্য ঐক্য আছে যে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান শুধুমাত্র এক ধর্মের মহিমায় একজোট হবে। প্যান-ইসলামিজম বলে সেই যে এক মতবাদ সে মতবাদ এখনো তেমনি সক্রিয় যেমন সক্রিয় Zionism বলে অপর এক মতবাদ। যুগ এদের কাছে একটা গণনাই নয়। এদের এ দুই মতবাদ সর্ব যুগে সত্য। যেহেতু ইসলাম ও ইহুদী ধর্ম সর্ব যুগে সত্য।

কামাল ছিলেন আতাতুর্ক। অর্থাৎ তুর্কজাতির জনক। তেমনি শেখ মুজিবর রহমানও ছিলেন বাঙালী জাতির জনক। দু'জনেই জাতীয়তাবাদী নেতা। আর সেইসঙ্গে সেকুলার মতবাদে বিশ্বাসী। কামালের প্রস্থানের পর তুরস্ক আর মুজিবের প্রস্থানের পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, কিন্তু সেকুলার মতবাদে অটল যে নয় তা তুরস্কের বেলা ঘটতে দেখা গেছে, বাংলাদেশের বেলা ঘটতে পারে দেড় বছর আগেই এটা আমি অনুমান করি। আমার অনুমানের পোষক প্রমাণ পনেরোই আগষ্ট মুজিবনিধনের সঙ্গে সঙ্গে নানাভাবে পাওয়া গেল। বাংলাদেশ বেতার নয়, পাকিস্তান বেতার দুনিয়াকে জানায় যে বাংলাদেশে ইসলামিক রেপাবলিক সংস্থাপিত হয়েছে। তাকে পাকিস্তানই প্রথমে স্বীকৃতি দেয়, তারপরে সৌদী আরব ও সুদান। বাংলাদেশ বেতার সেদিন শুধু নজরুল গীতিকা শোনায়। মাঝে মাঝে আল্লার নাম ওঠে। নতুন রাষ্ট্রপতির ভাষণেও ইসলামের ব্যাপ্তির বার্তা। মরক্কো থেকে ফিলিপাইনস পর্যন্ত তার বিস্তার। বাংলাদেশ তারই একটি লিঙ্ক।

সাত কোটি লোক যখন ভাবে যে তারা সত্তর কোটি লোকের সামিল তখন তাদের মনের জোর কত বেশী বেড়ে যায়! তখন তারা মনে মনে ভারতের সঙ্গে টক্কর দেয়, চীনের সঙ্গে টক্কর দেয়, রুশের সঙ্গে টক্কর দেয়, মার্কিনের সঙ্গে টক্কর দেয়। নইলে তারা বল পাবে কোন্ ভাণ্ডার থেকে! ইসলাম কেবল

একটি বলভাণ্ডার নয়, পেট্রোলের দৌলতে ধনভাণ্ডারও বটে। ইসলামের বলভাণ্ডার বা ধনভাণ্ডারের সঙ্গে তুলনায় বাংলাভাষার রসভাণ্ডার বা ভাব-ভাণ্ডার আর কতটুকু! বাংলাদেশ তার জন্যে পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকাবেই বা কেন আর কতদিন? ভারতীয় সংস্কৃতিকে তো অধিকাংশ লোক স্বজাতীয় সংস্কৃতি বলেই মনে করে না।

কামাল আতাতুর্ক এ সমস্যার সমাধান করেছিলেন তুরস্ককে স্বেচ্ছায় ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত করে। তুরস্কের একটি অংশ তো আজ অবধি ইউরোপেরও একটি অংশ। বহু শতাব্দী ধরে তার প্রাণকেন্দ্র ছিল কনস্টান্টিনোপল। যার অপর নাম ইস্তান্‌বুল। রাজধানী সেখান থেকে সরিয়ে নিলেও এখনো সে তুরস্কের সংস্কৃতিকেন্দ্র। আর তার সংস্কৃতি এখন ইউরোপীয় সংস্কৃতি। সারা তুরস্কের সংস্কৃতিও তাই। কামাল আতাতুর্ক তাঁর দেশের আইন কানুন ইউরোপ থেকেই নিয়েছিলেন পোশাক পরিচ্ছদ ও লিপি আর সমস্ত ইউরোপীয় দেশের মতন করেছিলেন। তাঁর সেসব প্রবর্তন পরে বাতিল হয়নি। তুরস্ক এখন স্বেচ্ছায় নাটো শক্তিপুঞ্জের সদস্য। তার বলভাণ্ডার তথা ধনভাণ্ডার পশ্চিম ইউরোপ তথা আমেরিকা। খ্রীষ্টানদের গোষ্ঠীতে সে মুসলমান বলে কেউ তাকে আলাদা চোখে দেখে না। কারণ গোষ্ঠীশুদ্ধ সবাই এখন সেকুলার।

মুজিবকে আমি কামালের সঙ্গে তুলনা করেছি। বাংলাদেশকে তুরস্কের সঙ্গে। তা হলে ভারতকেও করতে হয় ইউরোপের সঙ্গে। কিন্তু তুলনাগুলোর কোনোটাই যথার্থ নয়। মুজিব যদি কামাল সদৃশ হতেন তা হলে লাহোরের ইসলামী শীর্ষ বৈঠকে যোগ দিতেন না। রাজনীতির মধ্যে ধর্মকে ডেকে আনতেন না। বাংলাদেশ যদি তুরস্ক সদৃশ হতো তা হলে মুসলিম কান্ট্রি বলে দাবী করত না। মুসলিম কান্ট্রি আর মুসলিম বাংলা একই সত্তা। ভুট্টো সাহেবের মানস সন্তান, শেখ সাহেবের নয়। ইতিমধ্যেই সে "জয় বাংলা" ভুলে "বাংলাদেশ জিন্দাবাদ" ধ্বনি দিতে শুরু করেছে। আর ভারতও কি ইউরোপ সদৃশ? না, সেটাও ইংরেজ আমলের পর থেকে একটু একটু করে মিলিয়ে যাওয়া এক স্বপ্ন। ইউরোপীয় জীবনের যেসব মূল প্রত্যয় সেসব একে একে বিদায় হচ্ছে এক একটা আবর্জনার মতো। রুল অফ ল, সিভিস লিবার্টি, সিভিস পাওয়ার ওভার মিলিটারি, জুরি সীস্টেম প্রভৃতি কত কী আমরা ইতিহাসে প্রথমবার পেয়েছিলুম। মূল্য দিইনি, মূল্য বুঝিনি, একে একে হারিয়ে ফেলছি। খোলস নকল করে ইউরোপ সদৃশ হওয়া যায় না। ইউরোপ

সদৃশ হওয়াটা আমাদের জাতীয়তাবাদীদের মতে একটা গুণ নয়, একটা দোষ। তেমনি ভারত সদৃশ হওয়াটাও বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদীদের মতে একটা গুণ নয়, একটা দোষ। কিন্তু ব্রিটেনের যেমন রোমান উত্তরাধিকার ভারতেরও তেমনি ব্রিটিশ উত্তরাধিকার। সমস্টাই সাম্রাজ্যবাদ বলে বর্জনীয় নয়।

বাংলাদেশ অর্থাৎ পুর্ব বাংলা একবার ধর্মের ইস্যুতে ভারতের থেকে স্বেচ্ছায় বিযুক্ত হয়েছে। আরেকবার ভাষার ইস্যুতে পাকিস্তানের থেকে স্বেচ্ছায় মুক্ত হয়েছে। এর পরে যেটা আসবে সেটা শ্রেণীর ইস্যুতে সমাজবিপ্লব। মুজিব যাকে বলতে চেয়েছিলেন দ্বিতীয় বিপ্লব। সেটাকে আপাতত ঠেকিয়ে রাখা হলো মিলিটারি ক্যু (coup) দিয়ে। পাকাপাকিভাবে রোধ করতে হলে করতে হবে ইসলামের বাঁধ দিয়ে। ইসলামী জোটে যোগ দিয়ে। পাকিস্তানের সঙ্গে পা মিলিয়ে, হাত মিলিয়ে। রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করবে ধর্ম। ধর্মের মধ্যে রাজনীতি। এবার এটা হিন্দু বিদ্বেষ থেকে নয়। বিপ্লববিদ্বেষ থেকে। এর উদ্দেশ্য শ্রেণীদ্বন্দ্ব পরিহার। উদ্দেশ্যটা মন্দ নয়, যদি লোকে দুটো খেতে পরতে পায়, বেকার বলে কেউ না থাকে, ভিক্ষুক বলে কেউ না থাকে, চোর ডাকাত বলে কেউ না থাকে, অসাধু বলে কেউ না থাকে। কিন্তু তা বলে আমরা স্বীকার করতে পারিনে যে রাজনীতির মধ্যে ধর্মকে টেনে আনা বা ধর্মের মধ্যে রাজনীতিকে টেনে আনা ভালো। এসব করতে গিয়ে হিন্দু মেরেছে মুসলমানকে, মুসলমান মেরেছে হিন্দুকে, হিন্দু মেরেছে হিন্দুকে, মুসলমান মেরেছে মুসলমানকে। ইয়হিয়া খান্, টিক্কা খান্ যা করেছেন তারই পুনরাবৃত্তি চলেছে আজ। মুজিবকে দিয়ে শুরু, কিন্তু শেষ নয়। "শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে।"

আত্মজীবন চরিত

ফকীরমোহন সেনাপতি

মূল ওড়িয়া থেকে অনুবাদ—**দিলীপকুমার বিশ্বাস**

[ফকীরমোহন সেনাপতি (১৮৭৩-১৯১৮) আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় উজ্জ্বল নাম। তিনি ছিলেন মুখ্যতঃ কথা-সাহিত্যিক—গল্প, উপন্যাস ও রসরচনার ক্ষেত্রে তাঁর কালে ওড়িয়া সাহিত্যে অদ্বিতীয়। বস্তুতঃ রাধানাথ রায় (১৮৪৮ —১৯০৮), মধুসূদন রাও (১৮৫৩—১৯১২) ও ফকীর মোহন সেনাপতি—এই ত্রয়ীর সাহিত্য সাধনার ভিত্তিতেই আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্য গড়ে উঠেছে। এঁদের মধ্যে রাধানাথ ও মধুসূদন ছিলেন কবি—এঁরা বর্তমান যুগের ওড়িয়া কাব্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। বয়োজ্যেষ্ঠ ফকীরমোহনকে ওড়িয়া গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা বলে অভিহিত করা যায়। যদিও ফকীরমোহন কাব্যও রচনা করেছিলেন তাঁর প্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশ ঘটেছিল গদ্যে। তাঁর জীবন ছিল বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। সুবিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে সমকালীন ওড়িয়া সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন ও এদের সুখদুঃখের অংশভাগী হয়েছিলেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসের চরিত্রগুলিও এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে আহৃত। অনেকাংশে সাধারণ গ্রাম্য মানুষের মুখের ভাষাকেই সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করে তিনি তাঁর নিজস্ব বিশিষ্ট রচনাশৈলী গড়ে তুলেছেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসে তাই ওড়িশার মাটি-বন-পাহাড়ের স্বকীয় সৌরভ আছে। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে বালেশ্বরে অবসর-জীবন যাপন কালে তিনি তাঁর 'আত্মজীবনী' রচনা করেছিলেন। অল্প-পরিসরে এই গ্রন্থে তিনি তাঁর জীবনের নাটকীয় অভিজ্ঞতাগুলির যে সরস বর্ণনা দিয়েছেন তার আকর্ষণ তাঁর রচিত যে কোন গল্প-উপন্যাসের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। এর পাঠককে যা মুগ্ধ করে তা গ্রন্থকারের অকপট সরলতা ও বলিষ্ঠ কৌতুকবোধ। সমকালীন ইংরেজ ও দেশীয় নৃপতি শাসিত ওড়িশার একটি নিবিড় ও অন্তরঙ্গ পরিচয়ও এই গ্রন্থ বহন করছে—যার স্বাদ আধুনিক পাঠকের অরুচিকর মনে না হতে পারে। মনে রাখবার কথা—ফকীরমোহন তদানীন্তন অপরাপর ওড়িয়া সাহিত্যিকগণের মত বাঙলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন। বাঙলা তিনি মাতৃভাষার মতই জানতেন-বাঙলা

দেশের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক যোগাযোগও ঘটেছিল—তাঁর পুত্রবধূ ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত বাঙালী ব্রাহ্ম পরিবারের কন্যা। তৎসত্ত্বেও ওড়িয়া ভাষা সম্পর্কে সে-সময়কার ওড়িশাবাসী বাঙালীদের উন্নাসিক অবজ্ঞা তাঁকে পীড়া দিয়েছিল। 'আত্মজীবনী'তে তাঁর এই বেদনা তিনি গোপন করেন নি। ফকীরমোহনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ছ-মাণ আঠ গুণ্ঠ' বাঙলায় অনূদিত হয়ে 'সাহিত্য-আকাদেমী' কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে—অনুবাদিকা তাঁর পৌত্রী শ্রীমতী মৈত্রী শুক্ল।

—অনুবাদক]

১

বংশলতা

কটক জেলার কেন্দ্রাপাড়া মহাকুমার অন্তর্গত কুশিন্দা নামক গ্রামে এক ক্ষমতাশালী খণ্ডায়েত[১] বংশের অধীনে একটি চৌপাটী[২] ছিল। উৎকলের পূর্বতন স্বাধীন মহারাজদত্ত অনেকগুলি ভূসম্পত্তি উক্ত খণ্ডায়েত বংশ সুদীর্ঘ-কাল ধরে ভোগ করে আসছিলেন। কথিত আছে উৎকলের মহারাষ্ট্রশাসন কালে এই সম্পত্তি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।

মহারাষ্ট্র-অধিকার কালে ঐ খণ্ডায়েত বংশজাত হনুমল্ল নামক এক যুবক মারহাট্টা সেনাপতির অধীনে পাইক[৩] পদে নিযুক্ত হয়ে প্রথম বালেশ্বরে আসেন। মুসলমান সৈন্যগণকে ঠেকিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে ফুলবারঘাটের নিকট প্রহরীরূপে অবস্থান করা ছিল তাঁর কাজ। এই কাজের বেতনস্বরূপ তিনি পঁয়তাল্লিশ বাটী[৪] নিষ্কর জমি পেয়েছিলেন। দলপতি হনুমল্লের অধীনে যে বহুসংখ্যক পাইক নিযুক্ত ছিল তাদের জন্যও স্বতন্ত্র পাইকালী[৫] হিসাবে নিষ্কর জমি নির্দিষ্ট ছিল। গত ১২৫০ সালের প্রথম বন্দোবস্তের সময় পর্যন্ত পাইকদের বংশধরগণ সেই সব জমি নির্বিবাদে ভোগ দখল করে আসছিল। বন্দোবস্তের সময়ে কতক পাইক বংশ লোপ পেয়ে গেল। যারা সনদ দেখাতে পারল তাদের জমি বহাল থাকল। সনদহীন পাইকদের দখ্‌লী জমি সরকারে বাজেয়াপ্ত হল। হনুমল্লের মারহাট্টা-সরকার প্রদত্ত প্রদবী ছিল 'সেনাপতি'। তাঁর অযোগ্য বংশধরগণ আপন বংশ-নাম পরিত্যাগ করে, ভূসম্পত্তিহীন ও সৈন্যহীন হয়েও 'সেনাপতি' পদবী ব্যবহার করে আসছেন; পিতৃশ্রাদ্ধ বা ঐ জাতীয় কোন ধর্মানুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁরা 'মল্ল' নামটি উল্লেখ করে থাকেন মাত্র।

এই বংশ কি ভাবে মারহাট্টা আমলে প্রাপ্ত জায়গির সম্পত্তি হারাল তা সত্যই এক রহস্যময় কাহিনী। মহামান্য ইস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন বালেশ্বর অধিকার করেন (১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ), লেখকের পিতামহী কুচিলা দেই সে-সময়ে

যুবতী বিধবা, কোলে চার বছরের ও দুই বছরের দুটি শিশু সন্তান।

ঠাকুরমা গল্প করতেন—কোম্পানীর ফৌজ দক্ষিণ ও পূর্ব—দুই দিক থেকে বালেশ্বরে প্রবেশ করেছিল। সৈন্যরা বালেশ্বরের পূর্বাঞ্চলে নদীর মোহানায় অবস্থিত বলরামগড়ে এসে পৌছেছে এই সংবাদ শুনবামাত্র গ্রামবাসীরা প্রাণের ভয়ে বাড়ীর সব জিনিসপত্র ফেলে কেবল পরিবারের লোকজনদের নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। এদিকে অল্প দিনের মধ্যেই দেশে শান্তি স্থাপিত হল। কোম্পানী বাহাদুরের অভয় ঘোষণা শুনে গ্রামবাসীগণ আপন আপন ঘরে ফিরে এল। এদের মধ্যে অনেকে পালাবার সময়ে এতই আতঙ্কিত হয়েছিল যে বাড়ীর দরজাটি পর্যন্ত বন্ধ করে যাবার তর সয়নি। তারা ফিরে এসে দেখে নিজ নিজ গৃহ সংলগ্ন জমির গাছের ফল সমস্ত পেকে মাটিতে পড়ে আছে। সবাই নিজের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত, চুরি করবার লোক কোথায় ?

লেখক তাঁর বাল্যকালে গ্রামবাসী প্রত্যক্ষদর্শী অতি বৃদ্ধ লোকেদের মুখে শুনেছেন, মারহাট্টা শাসনের অবসান কালে দেশে এমন অরাজক অবস্থা হয়েছিল, যে চোর, ডাকাত, নাগা সন্ন্যাসী প্রভৃতির উপদ্রবে লোকে সোনা, রূপা এমন কি কাঁসা পিতল পর্যন্ত বাড়ীতে রাখতে সাহস করত না। সাধারণ মানুষ ছিল নিতান্ত দরিদ্র ও ভয়ার্ত। সেই সময়ের তুলনায় এখন আমরা স্বর্গরাজ্যে বাস করছি।

ওড়িশায় বা বালেশ্বরে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবার কয়েক মাস পরে সরকার বাহাদুর দেশের মধ্যে ঘোষণা করলেন, মারহাট্টা-অধিকারের সময়ে যিনি যেরকম বৃত্তি ভোগ করে এসেছেন সেগুলি ঠিক ঠিক বহাল থাকবে, কারও সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করা হবে না। এর জন্য বৃত্তিধারী-গণকে একটি নির্দিষ্ট তারিখে নিজ নিজ সনদ সহ কাছারিতে হাজির থেকে কালেক্টার সাহেবের হুজুরে নাম লিখিয়ে যেতে হবে। রাজকীয় ঘোষণার মর্ম বুঝতে না পেরে অথবা আশঙ্কাবশতঃ অধিকাংশ বৃত্তিভোগী নির্দিষ্ট দিনে কাছারিতে উপস্থিত হন নি। তাঁদের হাজির করানোর উদ্দেশ্যে কাছারি থেকে পরোয়ানা সমেত পেয়াদা পাঠানো হয়। এই রকম এক পেয়াদা পরোয়ানা নিয়ে আমাদের বাড়ীতেও এসেছিল। ঠাকুরমা তখন অল্প বয়স্কা বিধবা। সরকারী পেয়াদাকে বাড়ীতে আসতে দেখে তিনি গ্রামবাসীদের শরণাপন্ন হলেন। নির্বোধ গ্রামবাসীরা স্থির করল—মারহাট্টা পক্ষীয় লোকজনকে হত্যা করবার জন্যই কোম্পানীর পক্ষ থেকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। ঠাকুরমা ত্রস্ত হয়ে বাচ্চা দুটিকে ঘরের কোণে শুইয়ে তাদের উপর মাদুর চাপা দিলেন এবং

দরজার ফাঁক দিয়ে বলে দিলেন, "এই পরিবারে কোন পুত্র সন্তান নেই,—আমাদের জমির দরকার নেই।" উপস্থিত গ্রামবাসীগণ ঠাকুরমার উক্তি সমর্থন করায় পেয়াদা ফিরে গেল এবং আমাদের বংশগত ভূসম্পত্তিও বিলুপ্ত হল।

পূর্বোক্ত হনুমল্লের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিম্নলিখিত বংশলতিকা থেকে বোঝা যাবে :

হনুমল্ল (সেনাপতি)
|
গোবিন্দমল্ল (সেনাপতি)
|
কুশমল্ল (সেনাপতি)
|
পুরুষোত্তম সেনাপতি — লক্ষণচরণ সেনাপতি
|
চৈতন্যচরণ সেনাপতি — ফকীরমোহন (ব্রজমোহন) সেনাপতি

২
শৈশবের কথা

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে (১২৫০ সালের মকর-সংক্রান্তি, শুক্রবার) বালেশ্বর সহরের উপকণ্ঠস্থিত মল্লিকাশপুর গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমার মাতার নাম তুলসী দেই ও পিতার নাম লক্ষ্মণচরণ সেনাপতি। জ্যোতিষীরা আমার যে জন্মকোষ্ঠী তৈরী করেছেন তা এই :

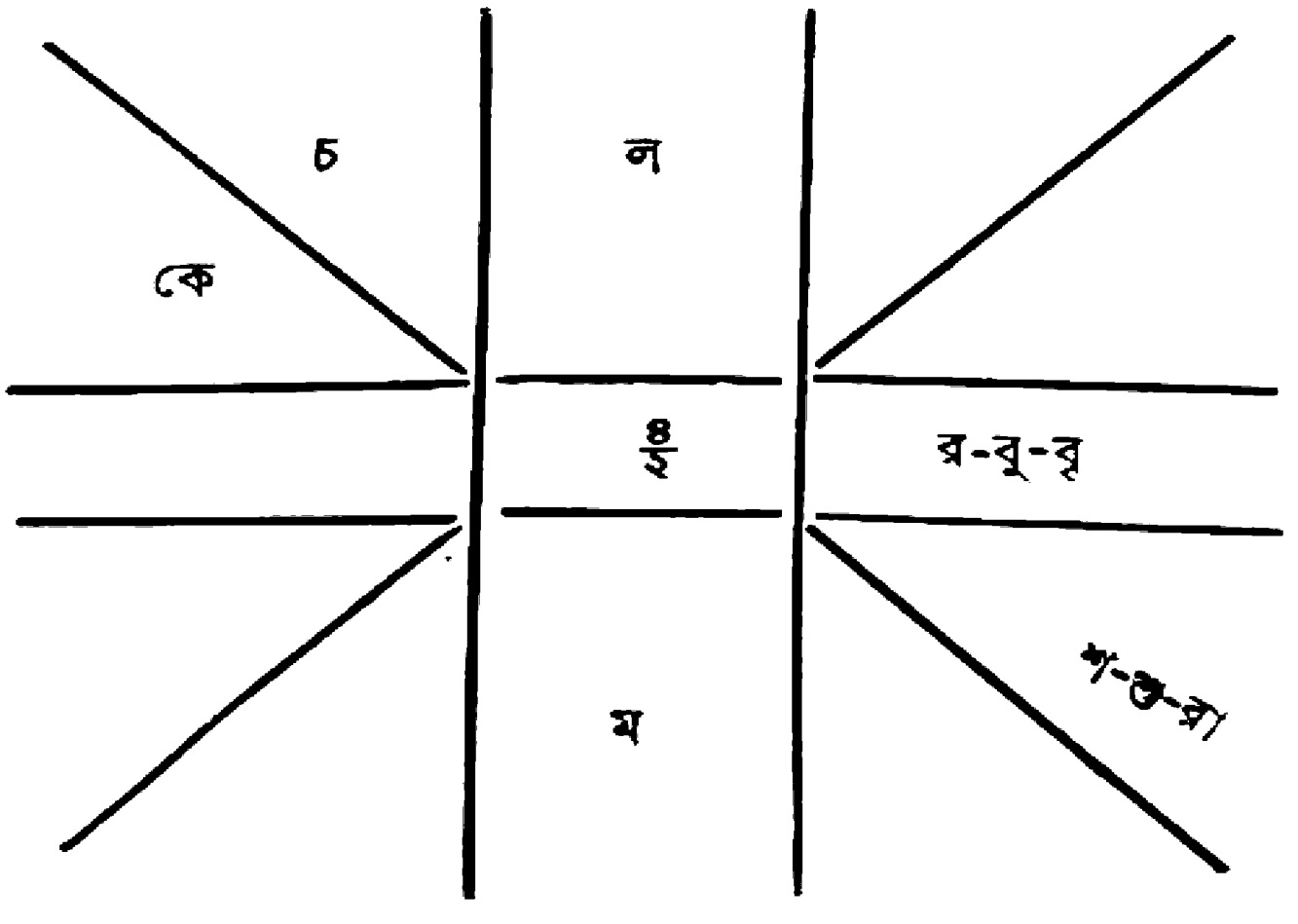

শুনেছি জন্মাবামাত্র আমার বাঁ কানের উপরের পাটা বিঁধিয়ে একটি সোনার টাপ পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চৈতন্য চরণ নামে আমার এক বড় ভাই ছিলেন। আমার জন্মের পুর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। সাধারণ সংস্কার ছিল, বড় ছেলের মৃত্যু হলে পরবর্তী ছেলের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কান বিঁধিয়ে দিতে হয়, তাহলে যম তাকে উপেক্ষাবশতঃ স্পর্শ করে না। ছেলেবেলায় আমি একরম শত শত কান বিঁধানোর দৃশ্য দেখেছি।

আমার এক বছর পাঁচ মাস বয়সের সময় পিতৃদেব জগন্নাথ রথযাত্রা দর্শনের উদ্দেশ্যে পুরী যান। ফিরবার পথে ভুবনেশ্বরে ওলাউঠা রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। সহযাত্রী ছিলেন কয়েকজন গ্রামবাসী ও তাঁর জননী (আমার ঠাকুরমা)। ঠাকুরমার কাছে শুনেছি ভুবনেশ্বরের মন্দির সমীপস্থ বিন্দুসাগর নামক পুষ্করিণীর পাথর বাঁধানো ঘাটের উপর তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়ে। তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে গ্রামবাসীরা কান্নাকাটি করতে লাগলেন। বাবার একটি পোষা কুকুর ছিল। সেও লোকজনদের সঙ্গে মিলে আর্তনাদ করতে লাগল। লোকেরা এক সময় নীরব হল কিন্তু তার কান্না থামল না। বাবা যেখানে যেখানে যেতেন, গ্রামের মধ্যে যেখানে যেখানে বসতেন, কুকুরটি সেই স্থানগুলি বার বার শুঁকে বেড়াতে লাগল এবং আটদিন অনাহারে থেকে শেষ পর্যন্ত প্রাণ বিসর্জন দিল।

বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মা সেই যে শয্যাগ্রহণ করলেন তার থেকে আর তিনি ওঠেন নি। চোদ্দমাস অশেষ শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করবার পর ১২৫২ সালের ভাদ্র শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

সেই দিন থেকে সংসারে আমি নিতান্ত অসহায় হয়ে পড়লাম। আমার সমবয়স্ক, সহায়সম্পন্ন, অনেকাংশে সুস্থশরীর, বলিষ্ঠ ও সৌভাগ্যবান বহু ব্যক্তি আজ পৃথিবী ত্যাগ করে গেছেন। অথচ মাতাপিতৃহীন, চিররুগ্ন আমি জীবনে নানাপ্রকার ভয়ংকর বিপদসংকুল অবস্থা অতিক্রম করে সম্প্রতি জরাজীর্ণ দুর্বল হাতে আমার দীর্ঘ জীবনের অসার কাহিনী লিখতে বসেছি। কার আদেশে, অনুগ্রহে ও সহায়তায় এমন অসম্ভব সম্ভব হল ? ক্ষুদ্রতম দূর্বাদলের সৃষ্টিও উদ্দেশ্যহীন নয়। কি উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ভগবান আমাকে এতকাল জীবিত রেখেছেন ?

পিতামাতার বিয়োগের পর যেন ঈশ্বরের আদেশেই পিতামহী কুচিলা দেই আমাকে কোলে তুলে নিলেন। দেশে প্রবাদ আছে, "পালন করে তো বাপের মা, পালন করে তো মায়ের মা"। আমার জীবনরক্ষার জন্য ঠাকুরমা যত যত্ন করেছেন, স্বয়ং যে নিদারুণ কষ্ট সহ্য করেছেন বর্তমান বৃদ্ধ বয়সে অস্পষ্টভাবে

সেসব কথা মনে পড়লে প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। হায়! সেই উপকারের প্রতিদান আমি কিছুমাত্র দিতে পারিনি।

মায়ের মৃত্যুর পর সাত-আট বৎসর পর্যন্ত আমি গ্রহণী, অর্শ প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক রোগে শয্যাগত হয়ে পড়েছিলাম। ঠাকুরমা দিবারাত্র আমার রোগশয্যার পাশে সতর্ক হয়ে বসে থাকতেন। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর,—কতকাল এইভাবে কেটে গেল। সে-সময়ে কত দিনরাত্রি ঠাকুমার অনাহারে অনিদ্রায় কেটেছে; যেন আমার দুই হাত ধরে' যমে-মানুষে টানাটানি চলেছিল—এক হাত ধরে' মৃত্যু, অন্য হাত ধরে' ঠাকুরমা। শেষ পর্যন্ত ঠাকুরমাই জয়ী হলেন, আমি ক্রমে আরোগ্যলাভ করতে লাগলাম।

আমার পীড়ার সময়ে ঠাকুরমা রোগশয্যায় বসে করযোড়ে জগতের যাবতীয় দেবদেবীর নিকট আমার প্রাণভিক্ষা চাইতেন। বালেশ্বরে দুই পীর ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ঠাকুরমা সেই দুজনের শরণাপন্ন হলেন। তাঁদের কাছে তিনি মানত করলেন, "আমার ব্রজ যদি সেরে ওঠে—তাহলে আমি তাকে তোমাদের ফকীর বা গোলাম করে দেব"। আমার নাম প্রথমে রাখা হয়েছিল-ব্রজমোহন। ঠাকুরমা আমার নাম রাখলেন—ফকীর। পীরদুজনের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি আমার এই মুসলমানী নাম রেখেছিলেন।

অসুখ সারল—আমি বেঁচে উঠলাম। কিন্তু ঠাকুরমা সর্বস্ব ত্যাগ করে পীরদের হাতে আমাকে আর দিতে পারলেন না। কেবল প্রতিবছর মহরমের সময়ে আট দিনের জন্য তিনি আমাকে ফকীর সাজিয়ে দিতেন। সেই কদিন আমি ফকীরের পোষাক পরে থাকতাম—হাঁটু পর্যন্ত ঝুল পাজামা,—গায়ে নানা রংএর কাপড় দিয়ে তৈরী একটি চাপকান মাথায় ফকীরী টুপি, কাঁধে রং-বেরংএর এক ঝুলি ও হাতে গালা-লিপ্ত একটি লাল রংএর লাঠি। সেই পোষাক পরে' মুখে খড়ি মেখে সকালে-বিকালে আমি গ্রামের ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে বেড়াতাম; সন্ধ্যাবেলা সারাদিনের ভিক্ষার চাল বিক্রী করে যে পয়সা পাওয়া যেত শিনীর জন্য তা পীরদুজনকে পাঠিয়ে দেওয়া হত।

বিদ্যারম্ভ (১৮৫২)

চাটশালীতে[৬] আমার যখন প্রথম পড়াশুনা আরম্ভ হয়, তখন আমার বয়স নয় বছর। সেকালে সহর-সংলগ্ন প্রত্যেক বড় গ্রামে একটি ও ছোট দু-তিনটি গ্রামের জন্য একটি করে চাটশালী থাকত। স্বচ্ছল গৃহস্থবাড়ীতেও স্বতন্ত্রভাবে এক-একজন অবধান[৭] নিযুক্ত থাকতেন। গ্রামের বাউরি, কওরা

প্রভৃতি অস্পৃশ্য শ্রেণীর ছেলেরাও উচ্চবর্ণের ছাত্রদের থেকে কিছু দূরে বসে চাটশালীতে লেখাপড়া করত।

তখনকার দিনে কটক জেলা—বিশেষতঃ কটক জেলার ঝংকড় পরগণা থেকে কর্মপ্রার্থী অবধানগণ বালেশ্বর জেলায় আসতেন। চৈত্রমাসটাই ছিল বিশেষ করে অবধান আমদানির সময়। বেশভূষা থেকেই অবধান-কর্মপ্রার্থীদের চেনা যেত। পরণে হাঁটুপর্যন্ত ঝুল একখানি আটপৌরে ধুতি ; মাথায় জড়ানো একটা ময়লা গামছা, কাঁধে একটি বোঁচকা, যার একপাশে আধসের চাল ফোটাবার মত একটি পিতলের পাত্র ও একটি ছোট হালকা ঘটি, অন্যপাশে দু-তিনখানি পুঁথির এক বিড়া ও একখানি আট কি নয় হাতি কাপড়—এই ছিল কর্মপ্রার্থী অবধানের চিহ্ন। ফাল্গুনের মাঝামাঝি থেকে চৈত্রের শেষ-পর্যন্ত কর্মপ্রার্থী অবধানদের এই বেশে কর্মের সন্ধানে গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত।

অবধানদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন 'করণ' জাতীয়[৮] অল্প সংখ্যক হতেন 'মাটিবংশ ওঝা'। বালেশ্বরবাসী অবধানেরা জাতিতে 'জ্যোতিষ'[৯]। এঁদের মধ্যে ওঝাবংশীয়গণ অঙ্কবিদ্যায় খুব পাকা বলে দেশে খ্যাত ছিলেন। লেখকের বিশ্বাস তাঁরা লীলাবতীসূত্র ভাল জানতেন। আমি ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি ওঝারা গাছের পাতা বা উড়ন্ত পাখীর পালক পর্যন্ত গুণতে পারেন।

অবধানগণ যে কেবল বালেশ্বর জেলাতেই পাঠশালা খুলে ছাত্র পড়াতেন তা নয়। বালেশ্বরের পার্শ্ববর্তী গড়জাত অঞ্চল[১০] এবং মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাঁতন, পটাশপুর, মহিষাদল, কাঁথি, হরিপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও তাঁদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল।

মেদিনীপুর জেলার আয়তন প্রায় পাঁচ হাজার দুশ (বর্গ) মাইল। তার মধ্যে এর দক্ষিণভাগ—প্রায় এগারশ (বর্গ) মাইল সম্পূর্ণ ওড়িয়াভাষী। এই অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দের ঘরের বা বাইরের কথাবার্ত্তা, ঘরোয়া পত্রলিখন, হিসাবপত্র-সংরক্ষণ, মহাজনী সেরেস্তার কাজ, দলিল দস্তাবেজ রচনা প্রভৃতি সম্পূর্ণ ওড়িয়ার মাধ্যমেই চলত। এর পূর্বে মেদিনীপুর জেলার আদালতের ভাষাও আংশিক ভাবে ওড়িয়া ছিল। বালেশ্বর সদর কাছারি থেকে আমলারা সেখানে নিযুক্ত হয়ে যেতেন। বর্তমানে এই সব ব্যবস্থা অনেকাংশে উঠে গিয়েছে।

এখনও পূর্বোক্ত গ্রামগুলির প্রধান প্রধান গৃহস্থদের বাড়ীতে প্রতি সন্ধ্যায় জগন্নাথ দাস রচিত ভাগবত,[১১] সারলা দাসের মহাভারত[১২] ওড়িয়া রামায়ণ[১৩]

প্রভৃতি পঠিত হয়ে থাকে। পটাশপুর জমিদার বাড়ীর জনৈকা মহিলা এক সময়ে সংস্কৃত ভাগবতের (ওড়িয়া) পদ্যানুবাদ করেছিলেন। বর্তমানেও কোথাও কোথাও সেই ভাগবত পড়া হয়। বালেশ্বর ও কটক জেলা থেকে আগত শত শত পাঠক ব্রাহ্মণ এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে পুঁথিপাঠ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। স্থানীয় অনেক জমিদার ও ব্রাহ্মণ পরিবারে এই শ্রেণীর পুঁথিপাঠক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছেন। সম্প্রতি অবশ্য এই অঞ্চলের ইংরেজি-পড়ুয়া বাবুরা ওড়িয়া বলতে বড়ই অসুবিধা বোধ করে থাকেন। তবে কুললক্ষ্মীদের দরুণ অন্তঃপুর থেকে জাতীয় ভাষাকে নির্বাসিত করতে তাঁরা সহজে কৃতকার্য হতে পারছেন না।

মেদিনাপুরের দক্ষিণাঞ্চল থেকে চাটশালীগুলি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াটা সত্যই এক দারুণ শোচনীয় ও রহস্যময় ব্যাপার। ১৮৬৫-৭০ খ্রীস্টাব্দে এই অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য এক বাঙালী ভদ্রলোক সাব্-ইনস্পেক্টার পদে নিযুক্ত হয়ে আসেন। তিনি বাঙলা স্কুল খুলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা নিজ সন্তানদের বাঙলা পড়াতে রাজী হলেন না। সাব্-ইন্স্পেক্টার বাবু অনেক চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারলেন না। দক্ষিণাঞ্চলে স্কুল বসাবার কাজেই তিনি নিযুক্ত হয়ে এসেছিলেন ; স্কুল না খুলতে পারলে তাঁর চাকরী রক্ষা করা সম্ভব হয় না। উপরওয়ালাদের নিজ অকৃতকার্যতার কথা জানিয়ে এমন সুখের চাকরী কে বিসর্জন দেয় ?

কাজ আটকালে বুদ্ধি যোগায়। ভদ্রলোকের মাথা থেকে শীঘ্রই এক ফন্দি বেরুলো। এক-একটা থানায় বসে তিনি-সেই থানা এলাকায় যত চাটশালীর শিক্ষক আছেন, এক নির্দিষ্ট দিনে থানার দারোগাকে দিয়ে একসঙ্গে তাদের ডেকে পাঠালেন। ইংরেজিতে লেখা সরকারী ছাপ দেওয়া একখানি জাল পরোয়ানা সমবেত অবধানদের সামনে ধরে বল্লেন, "এই দেখ, মেদিনীপুর জেলার কালেক্টার সাহেবের হুকুম। এই থানা এলাকায় যত চাটশালী আছে সব উঠিয়ে দেওয়া হবে এবং এখানে যত অবধান আছেন আদেশজারীর তারিখ থেকে সাতদিনের মধ্যে তাঁদের দেশে ফিরে যেতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের পর দিন যে অবধানকে মেদিনীপুর এলাকায় দেখা যাবে, তাকে ওয়ারেণ্টে গ্রেফ্তার করে সদর কাছারিতে চালান দেওয়া হবে—সেখানে তার জরিমানা ও জেল দু'রকম দণ্ড হবে"। সাব্-ইনস্পেক্টার পুঙ্গব থানায় থানায় ঘুরে অবধানদের এই হুকুম শোনাতে লাগালেন। অবধানেরা ক্ষুদ্র প্রাণী—তাদের পুঁটিমাছের প্রাণ। জেলার কালেক্টার সাহেবের হুকুম—আবার থানা থেকে জারী হয়েচে !

যে যত শীঘ্র পারল চাটশালী ফেলে দেশের দিকে ছুটল।

সাব-ইন্‌স্পেক্‌টার বাবু যে এর পর সহজেই বাঙলা স্কুল স্থাপন করতে পেরেছিলেন—তা বলা বাহুল্যমাত্র। তাঁর অগ্রজ বালেশ্বর জেলা স্কুলের হেড-মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। তিনি আমার কাছে ভাইএর বুদ্ধিমত্তা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিতে গিয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করেছিলেন।

মেদিনীপুরের দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের পাঠ্য ভাষা বাঙলা হলেও গার্হস্থ্য ভাষা ওড়িয়া। মাতৃভাষার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করা কি এতই সহজ? বাঙলা হরফে ছাপা জগন্নাথ দাসের ওড়িয়া ভাগবত এবং অন্য কতগুলি ওড়িয়া পুস্তক বর্তমানে ঐ অঞ্চলে ঘরে ঘরে পঠিত হয়ে থাকে।

চাটশালীতে কোন বে-আইনী কাজ হবার উপায় ছিল না। সব কিছু-নিয়মে বাঁধা। কার্যবিধি লংঘন করলে শাস্তি ছিল অনিবার্য। অবধানের আদেশ ছাড়া কোন পড়ুয়া স্বাধীনভাবে ওঠাবসা পর্যন্ত করতে পারত না। এক জায়গায় একভাবে বসে বসে পা ধরে গেলে সেখানেই বসে হাতযোড় করে প্রার্থনা করতে হত, "অবধানমশায়-এক,"—অর্থাৎ, প্রস্রাব করতে যাব; "অবধান মশায় দুই,"—অর্থাৎ, পাইখানা যাব, "অবধানমশায়-পাঁচ"—অর্থাৎ, জল খেতে যাব। চাটশালীর দণ্ড বিধিতে নিম্নলিখিত কয়েকরকম শাস্তির বিধান ছিল :

১। বেত্রাঘাত।

২। 'এক-গোড়িয়া'-অর্থাৎ-এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা।

৩। 'নাক-বাল'-অর্থাৎ-এক হাতে নাক ও অন্য হাতে মাথার চুল ধরে দাঁড়িয়ে থাকা।

৪। 'আঠু-গোপাল'-অর্থাৎ-হাঁটু গেড়ে, বাঁ হাত মাথায় রেখে ডান হাতে একটুকরা খড়ি রেখে সেই হাতটি বাড়িয়ে বসে থাকা।[১৪]

৫। 'মড়ুয়া শাংকুলি'—তালপাতার পিছনের শক্ত শিরা থেকে প্রায় দেড় হাত লম্বা একটি দড়ি তৈরী হত। সেই দড়ি অপরাধী ছাত্রের গলায় দিয়ে দুই পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের সঙ্গে ফাঁস লাগিয়ে দেওয়া হত।

প্রতিদিন চাটশালী ছুটির সময়ে পড়ুয়াদের হাতে 'শূন্য-চাটি' দেওয়া হত। কোন পড়ুয়া কখন চাটশালীতে এসেছে তা অবধান স্বয়ং আর সর্দার পড়ুয়া, অর্থাৎ যে ছাত্র কিনা পড়াশুনায় সবচেয়ে এগিয়ে আছে, মনে করে রাখত। চাটশালী ভাঙ্গার সময়ে পড়ুয়ারা দুই হাত যুক্ত করে মেলে অবধানের দিকে বাড়িয়ে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ত; যে ছেলে সকলের আগে চাটশালীতে

এসেছে অবধান মশায় তার হাতের পাতায় বেতের ডগাটি ছুঁইয়ে দিতেন,—এটা হল শূন্য। এর পর দুই, তিন, চার—এমনি করে বেতের বাড়ি পড়ত; অর্থাৎ এই ব্যাপারে যে দ্বিতীয় তার হাতে দু' ঘা, যে তৃতীয় তার তিন ঘা, যে চতুর্থ তার চার ঘা—এইভাবে বেত্রবর্ষণ হত। বেত্রাঘাতের জোর আবার সর্বত্র সমান নয় তার মধ্যে কড়ামিঠে থাকত। 'শূন্য চাটি' দেবার সময়ে অবধান ছাত্রদের মুখের দিকে তাকাতেন। যেখানে পড়ুয়ার কিছু দেবার মত জবাবদিহি থাকত সেখানে বেতের আঁটুনি কিছু নরম হত; অন্যদের হাতে পড়ন্ত বেতের সপাসপ্ আওয়াজ শোনা যেত।

যদি কোন পড়ুয়ার ঘুম ভাঙ্‌তে বেলা হয়ে যেত এবং বিছানা ছেড়ে সে দেখতে পেত মাঝের উঠোনে চালের উপর রোদ এসে পড়েছে, তাহলে 'শূন্য-চাটি'র ভয়ে সেদিন সে আর চাটশালীতে না গিয়ে নিরাপদ স্থানে অর্থাৎ রান্নাঘরে ঢুকে (ভাতের) হাঁড়ির মুখটা ধরে[১৫] বসে থাকত। কিন্তু হলে হবে কি, সেখানেও তার নিস্তার ছিল না। স্বজাতীয় গোটাকয়েক ছেলে উলঙ্গ হয়ে রান্নাঘরে ঢুকে অপরাধীকে গ্রেফতার করে চ্যাং-দোলা করে নিয়ে চাটশালীতে হাজির করত। সেখানে তাকে নিয়ে ফেলামাত্র বিচারক অবধান মশায় তার পিঠে বেশ ঘা-কতক লাগিয়ে দিতেন।

আমি এই রকম এক চাটশালীতে পড়তে আরম্ভ করলাম। সেখানে সকালে অঙ্ক প্রভৃতি লিখিত বিষয় ও বিকালে পুঁথি-পড়া হত। ছুটি হলে অন্যান্য পড়ুয়ারা বাড়ী চলে যেত, কিন্তু আমাকে চাটশালীতে বসে অবধানের সেবা ও তাঁর রান্নায় সাহায্য করতে হত। এইঅবধানের নাম বৈষ্ণব মহান্তি—নিবাস কটক জেলা।

আমার জ্যাঠামশায় পুরুষোত্তম সেনাপতি আমার প্রতি বড় নিষ্ঠুর ছিলেন। মাসের শেষে অবধান যখন মাইনা চাইতে যেতেন তখন তিনি তাঁকে বলতেন, "তুমি তো ফকীরকে কিছু পড়াও না—মাইনে চাচ্ছ কি"? অবধান মশায় জবাব দিতেন, "আমি তো দিনরাত তাকে পাশে বসিয়ে রাখি—এক মুহূর্ত এমন কি খেলতে বেড়াতেও ছাড়ি না"। জ্যাঠামশায় বলতেন, "কই, ওর পিঠেতো কোন দাগ নেই"। অবধান জ্যাঠার মনোভাব ভাল করেই বুঝলেন,—চাটশালীতে আমি বসেছিলেম, বিনা কারণে বেতটা নিয়ে দশ-বার ঘা আমার পিঠে কসিয়ে দিলেন। মারের শব্দ ও আমার চিৎকার শুনে জ্যাঠামশায় ও জেঠীমা ভারি খুশী। কিন্তু ঠাকুরমা দৌড়ে এসে বললেন; "অবধানমশায়, তোমার কি নিজের ছেলেমেয়ে নেই? অকারণে ছেলেটাকে

ঠ্যাঙ্গাচ্ছ" ? প্রত্যেক বার অবধানকে বেতন দেবার সময়ে এই রকম অভিনয় চলত।

কিছুদিন পরে বৈষ্ণব মহান্তি স্বগ্রামে ফিরে গেলেন। আমাদের গ্রামে নওা গোঁসাই এর মঠে একটি চাটশালী ছিল। আমি সেখানে ভর্তি হলাম। এখানে প্রতিপদ, অষ্টমী, চতুর্দশী ও অমাবস্যা তিথিগুলিতে—আমরা কয়েকজন বড় বড় পড়ুয়া মিলে গ্রামের মেয়েদের কাছে গান গাইতাম। তাঁরাও আমাদের পড়ুয়া-ভিক্ষাস্বরূপ চাল দিতেন। এই চালে অবধানের অন্ন-সংস্থান হয়ে যেত। কখনও কখনও চাল বেশী হলে অবধানমশায় তা বিক্রী করে পয়সা জমাতেন। পড়ুয়া-ভিক্ষা ছাড়াও আরও ঢের চাল তিনি পেতেন। কোন ছাত্র কোন একটা নূতন পড়া আরম্ভ করলে সেই উপলক্ষে চাটশালীতে একটা সিধা আনত। এতে থাকত—একসের চাল, একটি সুপারি, কিছু গুড় ও মুড়কী এবং কয়েকটি ফুল।

সে-সময়ে বালেশ্বরে একটি অবৈতনিক পার্সী স্কুল ছিল। চাটশালীর পড়া শেষ করে আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেখানে নাম লিখিয়ে পড়তে আরম্ভ করলাম। এই স্কুলে তিনজন মুসলমান শিক্ষক ও এক ওড়িয়া পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। বাপ, ভাই প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনকে কিভাবে চিঠিপত্র লিখতে হয়, আদালতে দরখাস্ত কিভাবে মুসাবিদা করতে হয়—পণ্ডিতমশাই ছাত্রদের এই পর্যন্তই শেখাতেন।

তখন বাইবেল ছাড়া ওড়িয়া ভাষায় আর কোন ছাপা পুস্তক ছিল না। কটক মিশন প্রেস ছাড়া ওড়িশাতে দ্বিতীয় কোন ছাপাখানাও ছিল না। বালেশ্বরে পাদ্রীসাহেবদের একটি স্কুল ছিল—সেখানে বাইবেল ছাড়া অন্য কোন বই পড়ানো হত না। কিন্তু পাদ্রীদের স্কুলে ছাপা বই পড়লে জাত যাবে এই ভয়ে কোন হিন্দু ছেলে সে স্কুলে পড়ত না।

টীকা (ক্রমশ)

১। খণ্ডায়েত : ওড়িশার স্বাধীন গজপতি রাজাদের অধীনস্থ আদৌ যুদ্ধ ব্যবসায়ী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়। ওড়িয়াতে 'খণ্ডা' শব্দের অর্থ খড়্গ বা তরবারি।

২। চৌপাড়ী : খণ্ডায়েত দলপতিগণের চতুর্দিক খোলা উপরে ছাদযুক্ত দলীয় বৈঠকস্থান বা আখড়া। মূলতঃ এখানে কুস্তি, তলোয়ার খেলা, তীরচালনা ও গুলতি ছোঁড়া এই চাররকম ক্ষাত্রবিদ্যার অনুশীলন হত বলে একে চৌপাড়ী বলা হত।

৩। পাইক : ওড়িশার খোর্দা ও অন্যান্য পার্বত্য ও আরণ্য অঞ্চল নিবাসী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়। এরা মুখ্যতঃ পদাতিক সৈন্যের কাজ করত এবং তার দরুণ প্রভুর প্রসাদে নিষ্কর জমি ভোগ করত। ইংরেজ শাসনে নূতন ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে এরা ভূসম্পত্তি হারায়—এবং প্রধানতঃ এই কারণে ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে ওড়িশাতে পাইক-বিদ্রোহ হয়। বিদ্রোহ সফল হয়নি।

৪। বাটী : স্থানীয় জমির মাপ। এক 'বাটী' তে প্রায় কুড়ি একার জমি বোঝায়।

৫। পাইকালী : পাইক বা পদাতিক সৈন্যগণের ভোগ্য।

৬। চাটশালী : গ্রাম্য পাঠশালা। সংক্ষেপে চল্‌তি ভাষায় 'চাহালী'।

৭। অবধান : পাঠশালার শিক্ষক-গুরুমশায়।

৮। করণ : ওড়িশার 'করণ' জাতি বংলার 'কায়স্থ' গণের সমপর্যায়ভুক্ত।

৯। জ্যোতিষ : জ্যোতিষ-ব্যবসায়ী নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

১০। গড়জাত অঞ্চল : শাসনতন্ত্রের দিক থেকে ওড়িশাকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা চলে। প্রধানতঃ পুরী, কটক ও বালেশ্বর জেলাগুলি নিয়ে গঠিত পূর্বসমুদ্র কূলস্থ সমতল অঞ্চল সাধারণভাবে 'মোগলবন্দী' নামে পরিচিত। এর পশ্চিমে অবস্থিত সুবিস্তীর্ণ পার্বত্য ও আরণ্য ভূভাগকে 'গড়জাত' বলা হয়। মুসলমান, মারাঠা ও ইংরেজ আমলে 'মোগলবন্দী' অঞ্চল যথাক্রমে উক্ত কেন্দ্রীয় সরকারগুলির খাস শাসনাধীনে থাকলেও গড়জাত-মহলের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় করদ সামন্ত রাজার অধীনে ছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর এই সব দেশীয় রাজার শাসনাধিকার লুপ্ত হয়েছে ও তাঁদের রাজ্যগুলি ভারত-সরকারের অধীনে এসেছে।

১১। জগন্নাথ দাস রচিত ভাগবত : চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ওড়িশার নিজস্ব বৈষ্ণবমতের (গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত থেকে স্বতন্ত্র) সুবিখ্যাত প্রবক্তা জগন্নাথ দাস কৃত ভাগবত পুরাণের ওড়িয়া অনুবাদ (ষোড়শ শতাব্দী)। আজও ওড়িশার প্রতি ঘরে ঘরে এই গ্রন্থ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত পঠিত হয়ে থাকে। একে উৎকলের জাতীয় ধর্মগ্রন্থ বলা যেতে পারে। জগন্নাথ জাতিতে ব্রাহ্মণ ও বৃত্তিতে পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরের পুরাণ-পাঠক ছিলেন। পুরীতে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় ও তিনি চৈতন্যদেবের স্নেহাশীর্বাদ লাভ করেন।

১২। সারলাদাসের মহাভারত : পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত ওড়িয়া মহাভারত। রচয়িতা সারলাদাসের প্রকৃত নাম সিদ্ধেশ্বর পরিড়া। তিনি

জাতিতে কৃষিজীবী ছিলেন। কটক জেলার অন্তর্গত ঝংকড় অঞ্চলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সারলা চণ্ডীর কৃপা লাভ করে তিনি তাঁর মহাভারত রচনা করেন বলে প্রকাশ। এই কারণে তিনি সারলাদাস নাম গ্রহণ করেন। সারলাদাসের কাব্য সংস্কৃত মহাভারতের অবিকল অনুবাদ নয়। এর কাহিনীর বহু অংশ তাঁর স্বকীয় উদ্ভাবন। এই গ্রন্থে ওড়িশার সমসাময়িক সমাজজীবনের বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

১৩। ওড়িয়া রামায়ণ: বলরাম দাস কর্তৃক ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত ওড়িয়া রামায়ণ। গ্রন্থকার জাতিতে করণ ছিলেন। তাঁর গ্রন্থেও কল্পনার এমন লীলা আছে যে তাকে সংস্কৃত রামায়ণের অনুবাদ না বলে অনেকাংশে মৌলিক রচনা বলা যায়। তিনি জগন্নাথদেবের পরম ভক্ত ছিলেন এবং এই ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন 'জগমোহন রামায়ণ'। জগন্নাথ দাসের ভাগবত বা সারলাদাসের মহাভারতের মত বলরাম দাসের রামায়ণও ওড়িশার জনমানসে স্থায়ী আসন অধিকার করেছে।

১৪। আঠ্ গোপাল: তুলনীয় বাঙ্লা পাঠশালার প্রচলিত শান্তি 'নাড়ুগোপাল'। 'আঠ্' বলতে 'হাঁটু' বোঝায়।

১৫। রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়ি ছুঁয়ে বসে থাকলে সকড়ির ভয়ে কেউ ছুঁতে পারবে না—পলাতকদের মনে এই আশা থাকত।

আলেখ্য-র মতো নিরপেক্ষ ও নির্ভীক সাহিত্য পত্রের প্রয়োজন এখন সব চেয়ে বেশী। কিন্তু আর্থিক সমস্যা ক্রমেই বিষম থেকে বিষমতর হয়ে ওঠায় **আলেখ্য**-র পক্ষে টিঁকে থাকাই কঠিন হয়ে উঠেছে। দেশ ও জাতির কথা যাঁরা চিন্তা করেন তাঁরা আলেখ্য-র পাশে এসে দাঁড়াবেন এই আমাদের আহ্বান।— প্রকাশক, **আলেখ্য**

সংবাদপত্রের কতখানি স্বাধীনতা বাঞ্ছনীয়

রয় জেঙ্কিন্‌স্*

রাজনীতিকদের ক্লান্তিহীন এবং মাঝে মাঝে সঙ্গত বিরোধিতা সত্ত্বেও—একথা ভুললে চলবে না, সমষ্টিগতভাবে রাজনীতিকদের অস্তিত্বই ক্ষমতা প্রয়োগের জন্যে—সংবাদপত্র এবং অন্যান্য প্রচারমাধ্যমগুলি, অল্পকয়টি দেশে হ'লেও, তাদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের উচ্চ অধিকার অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে অর্জ্জন করেছে ও রক্ষা করে' চলেছে। এটা যে খুব সহজসাধ্য হয়েছে একথা আমি মোটেই বলি না। বরং আমার বিশ্বাস স্বাভাবিক প্রবণতা এর বিপরীত দিকেই। যে সমাজে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিদ্যমান—এখন থেকে 'সংবাদপত্র' বলতে আমি বেতার ও টেলিভিশনও অন্তর্ভুক্ত করছি—তাকে একটি আগাছামুক্ত বাগানের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এরকম বাগান বাঞ্ছনীয় হলে'ও মোটেই স্বাভাবিক নয়, এবং কেবল নিরবচ্ছিন্ন যত্ন ও প্রয়াস ছাড়া এ আয়ত্তগম্যও নয়, রক্ষা করাও সম্ভবপর নয়।

কিন্তু কতোটা বাঞ্ছনীয়? ওয়ালটার লিপম্যান এ সম্বন্ধে একটু বাড়িয়ে বলেছেন বলেই মনে করি। তিনি বলেছেন: "সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে একটা বিশেষ অধিকার (privilege) মনে করলে চলবে না। উন্নত সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে তার সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী প্রয়োজনের (organic necessity)। [এখানে 'উন্নত' সমাজ ছাড়া তিনি উৎকৃষ্ট নয়, প্রাগ্রসর ও জটিল সমাজের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন।]···সমালোচনা ও বিশ্বাসযোগ্য, বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিবেদন ছাড়া কোনো সরকারের পক্ষেই শাসনকার্য্য চালানো সম্ভব নয়।" আমার মনে হয় কথাটা ঠিক নয়—যদিও যিনি বলেছেন তিনি একজন সর্বমান্য

---

* Rt. Hon. Roy Jenkins M. P. বর্তমান ব্রিটিশ সরকারের 'হোম সেক্রেটারী' (বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী)। গত মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি লণ্ডন গিল্ডহলে "গ্রানাডা" বক্তৃতা দিয়েছিলেন যার বিষয় ছিল "সরকার, বেতার-সম্প্রচার ও সংবাদপত্র" (Government, Broadcasting and the Press")। ২৯, ৩, ৭৫ তারিখের The Listener পত্রিকায় বক্তৃতাটি "How Free Should The Press Be" এই শিরোনামে মুদ্রিত হয়। এখানে তার বাংলা অনুবাদ প্রদত্ত হলো। অনুবাদক: দ্বিজাম্পতি চৌধুরী।

জ্ঞানী ব্যক্তি। তবে আমার নিজের আংশিক অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর বক্তব্যটা আমি বুঝতে পারি। 'আংশিক' বললাম এই জন্যে যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিত্ব ও অর্থমন্ত্রিত্ব এ-দুয়ের মধ্যে স্বভাবগত যে-গভীর পার্থক্য বিদ্যমান ব্যাপারটা তারই সঙ্গে জড়িত।

অর্থমন্ত্রকে বসে' আমি, অন্য যে কোনো মন্ত্রীর মতোই, কাগজে সরকারী নীতির সমালোচনা পড়ে' নিশ্চয়ই প্রভাবিত হতাম, কিন্তু সংবাদপত্র পড়ে' আমার মন যে কখনো কোনো সমস্যার প্রতি (সমাধানের প্রতীপে) আকৃষ্ট হয়েছে একথা মনে হয় না। লেনদেনের ভারসাম্য বা মুদ্রার সুলভতা-দুর্লভতার প্রশ্নে বা সরকারী ব্যয়াঙ্কের দিকে আরো মনোযোগ দেওয়া যে দরকার এসব বোঝানোর জন্যে কোনো বাণিজ্যিক সম্পাদকের মন্তব্যের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যেহেতু স্বরাষ্ট্র দপ্তরে সাধারণ নীতি পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে অনেক ব্যক্তিগত সমস্যার 'কেস'ও জড়িত থাকে, তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনেক সময় বহু 'কেসে'র খবর সংগ্রহ করতে হয় খবরের কাগজ থেকে ; এবং সেগুলি সম্বন্ধে—কী করা যায় তার ভাবনাও তাঁকে ভাবিত করে—এবং দপ্তরে গিয়ে তিনি সে-বিষয়ে পুরো রিপোর্ট চেয়ে পাঠান। অন্যথায় স্বাভাবিক কারণেই ঐ সব 'কেস' রাশি রাশি 'রুটিন' কাজের তলায় চাপা পড়ে থাকতো এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মন্ত্রীর মনোযোগ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারতো না। তবু মোটামুটি এও সত্য যে, দোষদ্রষ্টা সংবাদপত্র (a critical press) যতো বাঞ্ছিতই হোক, তার অভাবে যে শাসন কার্য্যই অচল হবে তাও ঠিক নয়।

দেখা গেছে স্বাধীন সংবাদপত্র ছাড়াই সরকারের শাসনকার্য্য বেশ ভালোই চলে এবং চলেওছে। বরং মাঝে মাঝে সমস্যাটা দাঁড়ায় সরকারী প্রভুত্ব ও কাজের সুসঙ্গতির সাথে সংবাদপত্রের সন্ধানী দৃষ্টির ও সমালোচনার—ক্ষমতাকে দুর্নীতিগ্রস্ত হতে না দেওয়ার জন্যে যা আবশ্যিক—সামঞ্জস্য বিধান কী ভাবে করা যায়। এটা বিশ্বাস করা শক্ত যে, ইতিহাসের হোমরা চোমরা স্বৈরশাসকরা কেউ তাঁদের শোবার ঘরের গোপনতার মধ্যেও কখনো এই বলে' বিলাপ করেছেন যে, যথেষ্ট খবরের কাগজী সমালোচনার অভাবে তাঁদের সরকারের কার্য্যক্ষমতা ব্যাহত হচ্ছে। ফেলিক্স ফ্রাঙ্কফুর্টার এবিষয়ে বরং সত্যের কাছাকাছি গেছেন : "সংবাদপত্রের স্বাধীনতা একটা লক্ষ্যমাত্র নয়, মুক্ত সমাজের লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য অত্যাবশ্যক উপায় স্বরূপ।" সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছাড়াই সরকারী শাসন চলতে পারে। আমাদের এই তথাকথিত সভ্য জগতের ইতিহাসেও একশোর মধ্যে পঁচানব্বইটা দেশই এর সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু এর

অভাবে যা আমাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয় তা' হলো এক অতিকৃত্রিম তবু অতিকাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রব্যবস্থা। এ দুয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ আমি তো দেখিনা। আমি কদাপি মহৎ বর্বর-এর পুজায় (the cult of the noble savage-এ) বিশ্বাস করি না।

প্রকৃত সত্য এই দুই উদ্ধৃতির মধ্যে যেখানেই অবস্থিত হোক, এটা লক্ষণীয় যে দুটিই দুজন আমেরিকানের। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র দেশ যেখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-রূপ নীতি সচেতন ভাবে অনুসৃত হয়ে থাকে। বাক্-স্বাধীনতা সম্বন্ধে ভল্‌তেয়ারের উক্তিই সবচেয়ে সারগর্ভ হলেও তাঁর পরবর্ত্তী ফরাসীদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ সঙ্কোচও যেমন ঘটেছে তেমনি ঘটেছে আপাতস্বাধীনতার আড়ালে ঘুষ ও অনুদানের টোপ ফেলে সরকার কর্ত্তৃক সংবাদপত্রের নীতি পরিচালনাও। ব্রিটেন শুধু ক্যাক্সটনেরই জন্ম দেয়নি, এদেশেই সবচেয়ে বেশী রকমারী পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তবু আমাদের এই ব্যক্তকেন্দ্রিক সংযতকৌতূহল, গোপনতাপ্রিয় সমাজে—চতুর্থবর্গের শাসক-শ্রেণীর (the Fourth Estate) গুণাবলি সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসের কোনো বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় না। সাংবাদিক অধিকার নিয়ে কোনো তত্ত্ব খাড়া করার দিকেও আমাদের ঝোঁক নেই।

যেহেতু আমাদের (লিখিত) সংবিধান নেই তাই সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নও নেই। কিন্তু যদি থাকতো তা হলেও আমার মনে হয় আমাদের প্রথম সংশোধনটা বাক্‌স্বাধীনতা সম্বন্ধী হতো না কিছুতেই। কিন্তু এও স্বীকার্য্য যে তত্ত্ব ও ব্যবহারিক প্রয়োগ উভয়েরই মূল্য আছে এবং এটাও স্বীকার না করে' উপায় নেই যে একমাত্র আমেরিকার তুলনাতেই হয়তো আমাদের দেশের সাংবাদিক স্বাধীনতার ঐতিহ্য ঈষৎ খাটো। এবং এও বলবো যে, এদেশের মতো একেক শহরে একেক কাগজের একচেটিয়া (বা দুইচেটিয়া) কারবারের সুযোগ এদেশে আমরা যে হতে দিই নি এতে আমাদের পদ্ধতিই উন্নততর। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নে নিজের পছন্দসই কাগজ বেছে নিয়ে পড়বার সুযোগ থাকাটা সাংবাদিকের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও জবরদস্ত সাংবিধানিক ঘোষণার চেয়ে কম মূল্যবান নয়। এই বেছে নেওয়ার সুযোগ যুক্তরাষ্ট্রে খুব কমই মেলে।

আমার মনে আছে, গতবার যখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলাম, এই ব্যাপারটা আমার গোচরে আনেন স্বর্গত জে. এডগার হুভার, যিনি আমার স্মৃতিতে একটি সংবাদ-সংস্থার অতি উদার ও খুৎখুতে স্বভাবের মুখ্যাধিকারিক রূপে

এখনো বিরাজ করছেন। ঈষৎ পরিহাসের সুরে তিনি আমায় বলেন,—মন্ত্রী মশাই ওয়াশিংটনে বসে' সারা দুনিয়ার একটা সামগ্রিক চেহারা দেখতে পাওয়া যে কী কঠিন তা আপনি বুঝতে পারবেন না। আমার বাসায় আমি শুধু 'পোষ্ট' (ওয়াশিংটন পোষ্ট) ও 'নিউইয়র্ক টাইম্‌স্' দুটোই পাই। কিছু বেলা হলে' তবে শহরের বাইরের কাগজের ষ্টল থেকে 'নিউইয়র্ক ডেলী নিউজ' পেতে পারি এবং বুঝতে পারি সত্যি সত্যি কি ঘটছে দুনিয়াটায়।—লণ্ডনে হলে' তিনি এই সামগ্রিক চেহারা বিছানায় শুয়েই, সকাল আটটার মধ্যেই পেতেন।

তাই আমেরিকার সাংবাদিক ও রেডিও-বক্তাদের আইনগত অধিকার সমপর্য্যায়ের ব্রিটিশ কর্মীদের চেয়ে ঢের জোরালো একথা ভেবে আমরা যেন আত্মহারা না হই। এইটেই এক্ষেত্রে সব কথা নয়। তাঁদের সংবিধানের প্রথম সংশোধন Freedom of Information Act-এর দ্বারা আরো মজবুত হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে যা দেখতে পাচ্ছি তা হলো আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে এমন কোনো শহর নেই যেখানে দুটির বেশী সংবাদপত্র পাওয়া যেতে পারে—এবং তা-ও অল্প'কটি শহরেই দুটো কাগজ মিলবে।

তবু একথা অবশ্যই জিজ্ঞাস্য, এদেশেও যদৃচ্ছ খবরের কাগজ পড়বার এই সুযোগের সঙ্গেই যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিকদের মতো আইনস্বীকৃত স্বাধীনতা ও নির্ভয় এখানেও কেন সুনিশ্চিত করা যাবেনা? আরও স্পষ্ট করে' বলা চলে, যদি আমেরিকা তার এই সাম্প্রতিক degringolade*-এর আগে পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে বিরাট এক দৈত্যের মতো বিচরণ করে' থাকে, এবং তাসত্ত্বেও Freedom of Information Act রূপ আইনও হজম করতে পেরে থাকে, তবে আমাদের দেশেই—আমাদের সাম্রাজ্যবাদ-উত্তর ক্ষুদ্র ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে—তাড়াহুড়ো করে পাস করা স্বাধীনতা-সঙ্কোচী Official Secrets Act—তার প্রয়োগ যদিও কদাচিৎ হয়ে থাকে—এর* এত কী প্রয়োজন ছিল? এর সোজা উত্তর হলো, প্রয়োজন নেই। এবং এর সবচেয়ে বিতর্কিত অংশ, ২নং ধারাটি বাতিল করারই যোগ্য—এবং তা হবেও—এবং এর স্থলে বিনা অনুমতিতে সংবাদ ফাঁস করে দেওয়ার বিরুদ্ধে সীমিত পরিসরের ও অপেক্ষাকৃত কম সাংঘাতিক রক্ষাকবচবিশিষ্ট অন্য কিছু আইন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ফৌজদারী আইনেরও এক্তিয়ার এক্ষেত্রে খুব নেই। চিরকেলে প্রশাসনিক শৃঙ্খলাবিধিই এখানে কার্যতঃ প্রায় সব বিপত্তিরই মোকাবিলা করতে পারবে। এথেকে বোঝা যাবে যে, আমি কিছুটা স্বাধীনতা সংকোচের পক্ষপাতী। সত্যই

* কথাটি ফরাসী—অর্থ, ডিগ্‌বাজি বা ধপ্‌ করে পড়া।

আমি তাই। এ-প্রয়োজন সর্ব্বত্র, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও স্বীকৃত—যদিও যুক্তরাষ্ট্রে সবকিছুর মতো এটাও আদালতের এক্তিয়ারে ফেলা হয়েছে, যাতে বিকাশশীল সমাজে জনসাধারণের পরিবর্তনশীল স্বার্থের প্রয়োজনে এবং সরকার ও জনগণের স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে আদালত আরও প্রবল ও স্পষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

এখন প্রশ্ন, কোন্ কোন্ নিয়ন্ত্রণ ন্যায়সঙ্গত বলা চলে। প্রথমতঃ একটা মানহানির আইন অবশ্যই থাকা উচিত যাতে বেসরকারী বা সরকারী যে কোনো ব্যক্তি মিথ্যা ও ক্ষতিকর অপবাদ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। ঠিক কিরকম সে আইনটা হবে তা তর্কসাপেক্ষ, তবে এক্ষেত্রে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকা যে কাম্য তাতে নিশ্চয়ই কারো দ্বিমত নেই। দ্বিতীয়তঃ, ভোগ্যপণ্যের ব্যবহারকারীরা যাতে প্রত্যক্ষতঃ মিথ্যা ও ভ্রান্তিজনক বিজ্ঞাপনের কবল থেকে রক্ষা পায় তারও প্রয়োজন আছে। তৃতীয়তঃ, যা সোজাসুজি হিংসা ও বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিতে উসকানি দেয় তারও প্রচার নিবারিত হওয়া উচিত। চতুর্থতঃ, অভিযুক্ত ব্যক্তির নিরপেক্ষ বিচারের অধিকারও সংরক্ষিত হওয়া আবশ্যিক—যদিও এখানেও মানহানির মতো কিছু নিয়ন্ত্রণ কাম্য হলেও বর্ত্তমান Law of Contempt বা আদালত অবমাননার আইন, যেরূপ আছে তা যে ঠিক তাও বলা চলে না। পঞ্চমতঃ, যদিও এটা আরও বিতর্কিত বিষয়—কেউ কেউ মনে করেন যে, সাহিত্য বা অন্য কোনো গুণবর্জিত স্থূল অশ্লীলতা-বিলাসী রচনা বা প্রকাশন নিষিদ্ধ করার আইনও থাকা উচিত। ষষ্ঠতঃ, বেতার সম্প্রচার জনসাধারণ-শাসিত একটি স্বনিয়ন্ত্রিত স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত। কারণ বেতার সম্প্রচার স্বভাবগত কারণেই অবাধ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে না, এবং এ কাজটি সরকার নিয়ন্ত্রিত না হয়ে, স্বাধীন ভাবেই হওয়া উচিত।

তারপর ওদিকে আবার বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভাবেই রয়েছে খাস সরকারী খবরের এলাকা। Official Secrets Act আইনের জায়গায় নতুনতর কিছু একটা হওয়া উচিত এটা স্বীকার্য হলেও এর অর্থ এ নয় যে গোপনীয় সরকারী তথ্য বলে' কিছুই নেই। এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে সম্পূর্ণতঃ, নিরবচ্ছিন্ন ও অবিলম্বিত সংবাদের প্রকাশ জনস্বার্থের বিরোধী হতে পারে, —এবং এটা শুধু এদেশে নয় যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্য সর্ব্বত্রই স্বীকৃত। যা বিতর্কের বিষয় তা হলো ঐ সব ক্ষেত্রের পরিধি ও প্রকৃতি, এবং সরকারী কর্মচারী বা অপর কেউ যদি এসব সংবাদ প্রকাশ করে' দেয় তা হলে তাদের প্রতি কিরূপ

শাস্তি বা দণ্ডবিধি প্রযুক্ত হতে পারে এই সব নিয়ে। আমার নিজের মত হলো, এ-সব ক্ষেত্রের পরিধি বেশ কমিয়ে আনা চলে এবং কমানো উচিত ও। এবং সংবাদ গোপনের যুক্তিযুক্ততা প্রমাণের ভার সরকারের উপরই পড়া উচিত। এবং এসব ক্ষেত্রে ফৌজদারী দণ্ডবিধির প্রয়োগ যদ্দুর সম্ভব না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অনেক তথ্যাদি বহু ক্ষেত্রে রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সরকারী বিভাগগুলিতে পড়ে থাকে, যা সাধারণের গোচরে এলে ক্ষতি তো নেইই—যথেষ্ট লাভই হবে।

তবে সেই সঙ্গে আমি এও বিশ্বাস করি না যে, শুধু মাত্র কয়েকটি সুস্পষ্ট রাষ্ট্রীয় গোপনযোগ্য তথ্যের মধ্যেই গোপনীয়তার প্রয়োজন সীমিত করতে হবে। সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারটা পুরোপুরি লোকচক্ষের প্রত্যক্ষে ঘটে এও কাম্য নয়। এখানে বিভিন্ন মানবিক অধিকারের ভারসাম্যের প্রশ্ন আছে। আমার মনে হয় যে, কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগে পর্যন্ত তা একান্তে পরিবর্তনের অধিকার সকলেরই মৌলিক অধিকার। এটা অস্বীকৃত হলে জনগণই সত্য কথা কম পাবে, খোলাখুলি আলোচনাও কম পাবে, একটা প্রাথমিক প্রায় নির্বোধ সিদ্ধান্তের প্রতি সুদৃঢ় নিষ্ঠা এসবই বেশী হবে, এবং ভালো সিদ্ধান্ত কমই নেওয়া হবে। যদি তাঁর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদক্ষেপগুলি বাইরে প্রকাশ হয়ে যায় তবে তা যে কোনো রাজনীতিকের পক্ষে দুর্ভাগ্যস্বরূপ যদিও সেক্ষেত্রে তেমন কিছু করণীয় তাঁর নেই। কিন্তু গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রয়োজনে চেষ্টা করার অধিকার তাঁর নিশ্চয়ই আছে। এবং এ শুধু রাজনীতিকদেরই খাস কোনো সমস্যা নয়, যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রাধিকারিক, ট্রেড ইউনিয়নী আলোচনাকারী,—এমনকি সংবাদপত্রের সম্পাদকদের পক্ষেও এ সমান সত্য।

আমি তাই Official Secrets Act-এর আগামুড়ো পরিবর্তনের পক্ষপাতী হলেও, কোনো secrets বা গোপনীয় কিছু নেই বা থাকবে না, এমন মতেরও স্বপক্ষে নই। এবং আমি আমেরিকান Freedom of Information Act-এর কোনো ব্রিটিশ সংস্করণেরও পক্ষপাতী নই। আমার কথা হলো, তত্ত্বগত-ভাবে কী বাঞ্ছনীয় তা নয়, কোনটা বেশী কার্যকর সেইটে বিচার্য। আমিও ঐ একই জিনিস চাই, অধিকতর তথ্য জানার সুযোগের অধিকার। তবে আমার মনে হয় Freedom of Information Act-এর প্রয়োগ অনেক বেশী ব্যয়-সাপেক্ষ ও জটিল এবং একটু বেশী আদালত-নির্ভর। আমেরিকান সাংবাদিকরা যে-পরিমাণে কিছু বেশী স্বাধীন—এবং কিছুটা তারা বেশী স্বাধীন তা অস্বীকার

করাও যাবে না—তার মূল তাদের রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থার রীতিপ্রকৃতির মধ্যে নিহিত, কোনো আইন বিশেষের মধ্যে নয়।

যদি আমরা কট্টর বাস্তব নজির হিসেবে উডওয়ার্ড ও ব্যর্ণষ্টাইনের All the President's Men বইখানার কথাই ধরি, এ বইখানা কী করে' লেখা সম্ভব হলো? (এ-বইখানার দৃষ্টান্ত দিলুম এই জন্যে যে সত্যের উদ্‌ঘাটনে নিয়োজিত আস্ফালনশীল ও নির্মম সাংবাদিকতার এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নমুনা।) আমার মনে হয় না যে, Freedom of Information Act এর খুব একটা ভূমিকা এক্ষেত্রে ছিল। আমাদের দেশে কি কখনো ঠিক ঐ রকমের সন্ধানী পদ্ধতি অনুসৃত হতে পারতো? আমার তো কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। আশা করবো, যে-ধরণের ঘটনাবলি এ বইয়ের জন্ম দিয়েছে তা এদেশে কখনো ঘটবে না, এবং নামটার সম্ভাবনা খুব বেশী বলেই আমার মনে হয়;—তবে একেবারে নিশ্চিত আত্মতৃপ্তিও কাজের কথা নয়। কিন্তু যে কারণে বইটি লেখা হয়েছে তার পেছনে আছে কংগ্রেস ও শাসন পরিষদের পরস্পরবিরোধিতা (adversional relationship of Executive and Congress); সরকারী কর্মচারী ও আইনজীবীদের ব্যবসা সূত্রে প্রাপ্ত গোপনীয়তথ্য সম্বন্ধে বিস্ময়কর অবিমৃষ্টকারিতা, এবং তাদের দেশের ফেডারাল কোর্ট ও সন্ধানী সাংবাদিকতার বিশিষ্ট ঐতিহ্য—কোনো আইন-টাইন নয়। তাদের ঐ ঐতিহ্যটা আমাদের চেয়ে ভিন্ন এবং ভিন্নই থাকবে চিরদিন। আমার মনে হয়, সংবাদ ও গোপন তথ্য সম্বন্ধে আমাদের সাংবাদিকদের অধিকার আরও সুপ্রশস্ত করা যেতে পারে এবং করা দরকারও,—তবে তার জন্যে নিতান্ত দাসসুলভ অনুকৃতিও বাঞ্ছনীয় নয়।

সরকারের নিজের খবর কতোটা ও কী ভাবে প্রচারিত হবে সেই প্রশ্নের চেয়ে অনেক ব্যাপকতর প্রশ্ন জড়িত আছে সংবাদপত্র বেতার ও টেলিভিশনের স্বাধীনতার নীতির সঙ্গে এবং সরকার কর্তৃক সেই স্বাধীনতা কতোটা পোষিত হবে তার সঙ্গে। এর সঙ্গে এই প্রত্যয় গভীরভাবে জড়িত, স্বাধীন অধিকারের যে-আদর্শের সঙ্গে আমরা পরিচিত তা সব ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও (ত্রুটি বিচ্যুতি যে আছে তা কেউ অস্বীকার করবে না) আমাদের গণতান্ত্রিক আদর্শের কেন্দ্রগত সত্য; এবং এর অভাবে আমাদের গণতন্ত্র শুকিয়ে মরে যাবে। এবং সেই সঙ্গে আমাদের মনে এ-বিশ্বাসও আছে যে, সারা দুনিয়ার দিকে চোখে মেলে তাকালে অন্য বহু বিষয়ে না হলেও এই একটি ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়ই নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতে পারি। আমাদের B. B. C. ও স্বাধীন কোম্পানীগুলি

এবং I. B. A., এরা—বহু দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও—সমবেতভাবে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টেলিভিশন কার্য্যক্রম প্রচার করে থাকে। এবং সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও, যদিও কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে আমেরিকার সংবাদপত্র বেশী শক্তিমত্তা ও দায়িত্বচেতনার পরিচয় দেয়, তবু আমাদের সংবাদপত্রেই বেশী স্বাদবৈচিত্র ও বেছে নেওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। এবং বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন সকলেই জানেন যে এ-অবস্থা আরো ভালো না হতে পারলেও আরো খারাপ অনায়াসেই হতে পারতো।

আর একটি কথা বলে' আমি উপসংহার করছি। আমার মনে হয় সংবাদ-পত্রের—এবং রেডিও-টেলিভিশনেরও মান নির্ভর করে দায়িত্বশীল সম্পাদকীয় স্বাধীনতার উপরে। সপ্তাহ দুয়েক আগে প্রেস কাউন্সিলের একটি নির্দেশে বলা হয়েছিল :

> সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মুখ্যতঃ নির্ভর করে, তাঁর কাগজে কী যাবে কী যাবে না, সম্পাদকের সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার অপ্রতিহত স্বাধীনতা থাকার উপরে। এই অধিকার ব্যবহারের কালে তিনি শুধু জনসাধারণের স্বার্থের কথাই চিন্তা করবেন, অন্য কোনো কিছু দ্বারাই প্রভাবিত হবেন না —তাদের চাপের কাছে তো নয়ই যাদের কোনো সম্পাদকীয় দায়িত্ব নেই অথচ বিশেষ স্বার্থে কাগজের উপর নিজস্ব "সেন্সরশিপ" চাপাতে চায়।
>
> এটা সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—সে-চাপ মালিকপক্ষের থেকেই আসুক, বিজ্ঞাপনদাতাদের থেকে, অথবা ইউনিয়ন থেকে। কোনো পক্ষের চাপই শ্রদ্ধেয় নয় এবং প্রত্যেক চাপই ভিতরে ভিতরে অনিষ্টকর হতে পারে। এদের সব কটিকেই প্রতিহত করা সম্পাদকের একটি সুকঠিন ও মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ-সাধনীয় কর্ত্তব্য। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার এইটাই সার সত্য। অনেক ত্রুটির নজির আছে, তবু ঐ প্রাণকেন্দ্রটিকে রক্ষা করতেই হবে।

CENTRAL LIBRARY

বোধন

হরপ্রসাদ মিত্র

রেল-লাইন ঝক্‌ঝক্ করছে পাহাড়ের নিচে ;
আমলকিবনে হাওয়ার নদী ;
আর, সুবর্ণরেখা আমাদের সেই যে যৌবন !

তারপর এই মানিকতলায়—
খানা-খোন্দলের মধ্য দিয়ে
মিনিবাস হাঁকাচ্ছেন নবযুবক ।
চুপ, চুপ,—দুর্দশার কথা বোলো না কেউ ।

সময় বদ্‌লাবেই তো ।
নিরোধ বিরোধ ইত্যাদি যাই ঘটুক্ না কেন,
পৃথিবীর লোকসংখ্যা বাড়বেই ।
টেলিফোনে কোনো কোনো পুরোনো সময়
ডাকেই যদি—,
আমলকিবনে হাওয়ার নদী
দূরে দূরেই সরে যায় ।

যা থাকে, তা এই থাকা শুধু ।
এবং কিছু কিছু স্মৃতি দুরারোগ্য ।
সেই সব বীজ থেকেই
বোধনের বাজনদার জন্মায় ।

সময়কে নিয়ে

গোপাল ভৌমিক

সময় নির্মম বড়
কাউকে পালন করে কোলে পিঠে করে
আবার কাউকে দেয় অকারণে দূরে ছুঁড়ে ফেলে
হাড়গোড় যা কিছু ভাঙুক
এবং তখন তাকে হতে হয় নেহাৎ শামুক
স্বেচ্ছানির্বাসন কামী।
তখন প্রতীক্ষা শুধু সব চেয়ে দামী।
অথচ প্রতীক্ষা করা বিনা প্রতিবাদে
প্রায় সকলের কাছে বড় সুকঠিন ;
তর্কের অতীতে গিয়ে বিশ্বাসের স্থিরভূমি
যে পেয়েছে সেই শুধু থাকে অচঞ্চল
আর সকলে করে আকুলি বিকুলি।
অথচ যেমন ছিল থাকে কালিঝুলি
পোশাক আশাক সহ দেহ মুখ মনে,
টের পায় সকলেই
যে ব্যথা লুকাতে চাই অতি সঙ্গোপনে।
সময় নির্মম তবু
কিছুতে হয় না কারু কোন প্রতিবাদে।

প্রবীণ বৃক্ষের মতো

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

স্থিতির চেয়ে গতি কাম্য ছিল, যৌবনে একদিন তাই
প্রচণ্ড বেগে আলোড়িত হয়ে
এগিয়ে যেতে চেয়েছিলাম।
নিজেরই দুর্বার বেগের মধ্যে অনুভব করেছিলাম
স্পন্দমান স্বপ্নের মুহূর্তকে ;

দেখেছিলাম,
অরণ্যের নির্জনতায়
ঊর্দ্ধশ্বাস হরিণের ধাবমান অগ্রগতি ;
কিংবা সারাক্ষণ নদীর পার ভেঙে
জলস্রোতের শব্দ

আজ প্রবীণতা আস্তে আস্তে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে স্থিতির দিকে,
জল হাওয়া রৌদ্রের ভেতর আমি তেমনই দাঁড়িয়ে আছি
অথচ ইচ্ছা করলেই আর
গতিকে হাতের শক্ত মুঠোয় ধরে রাখতে পারছি না ;
বৃক্ষের শিকড় যেমন মাটির দিকে ক্রমশই টানতে থাকে
তার অস্তিত্বকে,
আমাকে যেন সেই রকম টেনে রাখছে বয়স,
তার নানা শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে আশ্চর্য এক
স্থবিরতার ভেতরে ।

আমি এখন প্রবীণ বৃক্ষের মতোই শান্ত হতে চলেছি ॥

একটি প্রেমের কবিতা

আলোক সরকার

তারপর অনেকদিন। মনে পড়ে
সেই একদিন।
আর এই আজ

যার সাজপোশাক তামাটে রঙের
যার চলা আর দাঁড়ানো
একইরকম, যার মনে পড়ে

সেই একটা দিন আর মাঝখানে
বিরাট একটা চীৎকার, এ ঠেলা দিচ্ছে
ওকে, ফেনিয়ে উঠছে ঢেউ

এইরকম একটা আজ। তারপর
অনেকদিন। মনে পড়ে
সেই একটা দিন আর তারপর

ধূ ধূ করছে মাঠ কেবল একটা শালিক
লাফিয়ে লাফিয়ে এগোয়
মরা খড়ের উঁচু ওই চোরকাঁটার ঝোপ

আর সেই গরুর গাড়ী গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে
আওয়াজ হচ্ছে কাঁ।-কোঁ।
চিরদিনের সেই গরুর গাড়ি গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে।

জীবন থেকে অন্য আকাশ

নচিকেতা ভরদ্বাজ

বিয়াত্রিচে! তুমি যে দশম স্বর্গে এখন অপিতা
যে আকাশ অপার্থিব তোমার দুচোখে,
নন্দিত জীবনভাষ্যে উত্তরণে প্রসন্ন সবিতা,
তার তুমি কতটুকু পেয়েছিলে দুরূহ জীবনে ?
পরিবর্তমান এই রূপাশ্রিত উদ্দাম বস্তুর ভূলোকে ?
যে তুমি আবদ্ধ ছিলে প্রত্যহের দাসত্ব-শৃঙ্খলে,
স্বল্পতার অবরোধে,—বিষাদে বন্ধনে,
তার কোনো উৎসারিত আলো
ছিল কি যা হতে পারে পূর্ণ পদ্ম জীবনের জলে ?
হতে পারে নন্দনে সমাধি ? বিজড়িত তন্দ্রা-জাগরণে
ছায়ালগ্ন স্বপ্ন-শরীরিণী ক্রমে আঁধারে ফুরালো !
তবু যে দ্বিতীয় জন্মে তুমি স্থির প্রত্যয়ের আলো
জ্বালিয়ে গিয়েছ সেকি—তোমার না দাস্তের জীবন
জাত অন্ত সুগভীর সুদূর প্রজ্ঞার
নিহিত অন্তর ভাষ্যে অনির্বাণ দৃপ্ত রাজটিকা ?

প্রত্যহ জীবন জাত এই এক আশ্চর্য দহন
হীরা হয় কখন অঙ্গার ;
তার নাম প্রেম ; আর সেই প্রেমজীবন-পরিখা
পার হয়ে জ্বলে তবু নন্দনের দিকে
কী এক সৌরভে জয়ে দূর দীপ্যমান।
অথচ জীবন ছাখো প্রত্যহ সে কত ভ্রাম্যমান
কতো স্রোতের জলে কত ফুল-ফলের প্রতীকে
বস্তুর সঞ্চয় সব ভেসে চলে যায়
আলো, নারী, নারীর যৌবন, জয়—সমস্ত লুপ্ত তমসায়।
সেই ভাসমান স্রোতে স্বর্গ মর্ত্য পাতালে বিস্তৃত
যাহার আলোক-দৃষ্টি বৃষ্টি হয়ে ঝরিতেছে আজো
চারিদিকে, রূপলোকে অরূপে নন্দিত
চৈতন্যে প্লাবিত এই আমাদের স্মৃতির অঙ্গনে :
সেখানে এখনো তুমি শাশ্বতী বিরাজো
জীবনে মরণে।
তা না হলে ক্ষুধা মৃত্যু ভয় নিয়ে বাসনা কামনা-
জাত যে জীবন,—তার সহজিয়া বায়িকা যে নারী,
সে তো কবে পলাতকা—সময়ের আঁধারে সে দিয়ে গেছে পাড়ি।
যা আছে তা রক্ত-মাংস-স্নায়ুর অতীত এক আশ্চর্য রচনা
সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তবু নিবেদিত, অপরূপ আলোক-বন্দনা॥

একা

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

"অরতির্জনসংসদি"—'গীতা', ১৩।১০

সারা দিন, সারা রাত, থাকা চাই একা। নিজের আত্মাকে আজ
শুধু সাথী নিয়ে ; নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই শত্রু নিজের।
আত্মীয় স্বজন মিত্র প্রিয় পরিজন সব বসন্তের পাখি,
আপন ঋতুর বাইরে কোনো দিন ভুলেও আসবে না তারা।
থাকতে হবে তাদের থেকে দূরে মায়াময় কোনো অন্তরালে।
ঘৃণা হ'ক শ্রদ্ধাহীন জনতার ভীড়ে, যাদের এড়াতে চাই।

রয় যেন চারিদিকে ঘিরে বাধাহীন সীমা, আমিই সম্রাট্
যে রাজ্যের, যেদিকেই যেখানে তাকাই নিজের মহিমা শুধু
প্রত্যক্ষ-গোচর। কপালের রেখাগুলি মুকুটেতে ঢেকে রেখে
বসে রব আপনার সিংহাসন মাঝে অহংকার নিয়ে।
কাঁটার মুকুট যদি হয়, সে আমার একান্ত নিজস্ব ধন,
ভিক্ষালব্ধ কিছু নয় কিংবা ঐশ্বর্য দস্যুবৃত্তি-আহরিত।

নত হব কার আছে? নারী, নিসর্গ, ঈশ্বর, সেই অনিন্দিত
তিন জন চেখভের কথা মতো? তারাও কি অকৃত্রিম আছে?
নারী শুধু ছলনাই জানে, নিজেকে জানে না। মিথ্যা আবরণে
আগাগোড়া ঢাকা প্রসাধন-প্রলেপ এবং দাম্ভিক ভাষায়।
মনোরমা নয়, করুণার প্রতিমূর্তি নয়, শুধু অহমিকা।
তার সঙ্গ কাম্য নয়। আলেয়ার পিছে কত ছুটে মরা চলে?
নিসর্গেও শান্তি নেই। দংষ্ট্রাকরাল রূপ রক্তিম আনন,
ভয়ঙ্কর প্রলয়ের সূচনা কেবল ঝড় ঝঞ্ঝা দুর্বিপাকে।
ঈশ্বর অপ্রত্যক্ষ লীলাময়, নিবাস দুর্গম পথের শেষে,
সব চাওয়া-পাওয়ার অতীত, সব দেনাপাওয়ার পারে।
তাই দেখি শেষকালে একমাত্র অবশিষ্ট আমি ভাগশেষ—
ভাগ্যের কঠোর পরিহাসে এই আত্মলীন জীবনে আবেশ।

নামিল আঘাত

নির্ব্বোক

"তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড় নও!"
কত বড় উচ্চণ্ড স্পর্দ্ধায় উচ্চারণ করেছিলি
ওরে দুষ্ট দুর্বিনীত মূঢ়, এই কথাগুলি।
দেখ্ তোর কী দশা এখন।
সব বল করেছি হরণ তোর বিনিঃশেষে,
সব অস্ত্র, অঙ্গদ, কুণ্ডল,
সহজাত বলে' তোর গর্ব্ব ছিল এত।
তারপর পাকশাটে মেরেছি আছাড়,
শূন্য হাতড়িয়ে শেষে সপাট মাটিতে প'ড়ে ভ্যাবাগঙ্গারাম।

বুকেতে চড়েছি তোর, গলায় রেখেছি এই পা,
আর কোনো ধৃষ্ট উক্তি, মুখভঙ্গি করবি কোনো দিন ?
সম্মানী যে তার মান কি করে রাখতে হয়
এবার দিলাম তার পাঠ।
ফের যদি তড়পাবি আর কোনো দিন,
কিম্বা কিছু বেমওকা বলিস,
ঐ জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেবো কুকুরের ভোজে।
কে তোর রয়েছে কোন বাবা রক্ষাকর্ত্তা তোর ?—
সকলেই তোর দেশা দেখে
বিস্ফোচিত নীরব দর্শক ওই শতহস্ত দূরে।
অগণিত টাই, প্যাণ্ট, কোট আর ধুতি-পাঞ্জাবীতে মোড়া
তোর না অনেক বন্ধু আত্মীয় সমানধর্মা ছিল ?
ওই দেখ্ পিঁপড়ের সারের মতো পলাতক যুথ,
ভয়ে মুখ-মাথা নীচু সন্তর্পণে লাঙ্গুল সংগ্রহী,
ক্ষীণজীবী ক্ষীণপ্রাণ কাপুরুষ যতো।

আবার স্পর্দ্ধায় বেঁকে বলবি কখনো ওরে,
—'তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড় নও' ?

আমি সব চেয়ে বড়, নিখিলের নিয়ামক,
আমি কর্ত্তা পাতা প্রভু।
আমি দণ্ড নীতি ন্যায়।
বুঝলি এখন ?

মোহিতলাল স্মৃতিকথা

॥ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ॥

॥ ৩ ॥

মোহিতলালের মত বিমিশ্র উপাদানে গড়া মানুষ সাহিত্যক্ষেত্রে আমি খুব কমই দেখেছি।

একদিকে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যচেতনাসম্পন্ন রোমান্সবিলাসী কবি, আর একদিকে সুলভ ভাবাবেগবর্জিত ক্লাসিক আদর্শের প্রতি একান্ত ভাবে প্রত্যয়বান একনিষ্ঠ সাহিত্যকর্মী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে মোহিতলাল যখন সাহিত্যে ক্লাসিক আদর্শের স্বরূপ সম্পর্কে অনুসন্ধান-তৎপর, রোমান্টিক কবি-স্বপ্ন তখনও তাঁর মানস-জগৎ থেকে বিদায় নেয়নি। অথচ শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে নয়, গৃহগত পরিবেশে সাহিত্যিক আলাপচারীতে তিনি আমাকে সাহিত্যের ক্লাসিক আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হতে সব সময় উপদেশ দিতেন। আমি এম. এ. পড়বার সময় (১৯৩৫-৩৭) মোহিতলালের সমকালে লিখিত অন্তত দুটি কবিতার সঙ্গে পরিচিত হই—যেগুলির মধ্যে তাঁর সূক্ষ্ম সৌন্দর্যচেতনাময় রোমান্টিক মন আশ্চর্য অভিব্যক্তি লাভ করেছে : একটি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'রূপদর্পণ,' আর একটি 'বাসন্তিকা'য় প্রকাশিত 'আঁখির কাজল'। 'রূপদর্পণ' কবিতাটি আমার তরুণ মনকে সবলে আকর্ষণ করেছিল বলে তার কয়েকটি লাইন এখনও মনে আছে :

আমার নয়ন-পুতলিতে হের তোমার রূপের ছায়া।
দর্পন ফেলে দাও।
থির কটাক্ষে আঁখি মেলি সখি চাও,
সোনার মুকুরে কিবা কাজ তব ?
এ মন-মুকুর তলে,
হৃদয় দহনে মনের গহনে মমতার মোম গলে,
তাহারি আলোকে নেহারি ও মুখ ছায়া,
ভুলে যাবে তুমি নারী নশ্বর কায়া,
দর্পণ ফেলে দাও।

(মোহিতলাল)

CENTRAL LIBRARY

অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কবিতা। প্রতি স্তবকের শেষে refrain 'দর্পণ ফেলে দাও'—পাঠকের সৌন্দর্য চেতনাকে আলোড়িত ক'রে তার মনকে উপস্থিত করে সুন্দরী নারীর বিমূর্ত সৌন্দর্যের সম্মুখে। 'আঁখির কাজল' নামক নিখুঁত লিরিকে শুধুমাত্র নারীচক্ষুকে কেন্দ্র করে কবি যে অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্যজগৎ সৃষ্টি করেছেন এ যুগের কাব্যজগতে তার তুলনা দুর্লভ। কয়েকটি লাইন মনে পড়ছে :

আঁখির কাজল

ডাগর আঁখি তব এমনি কালো
কাজল কালো রেখা মুছিয়া ফেলো.
আকাশ হাসে যেথা অরুণ রাগে
তেমনি হাসে আঁখি কি অনুরাগে,
ধোঁয়ার কালো রেখা মুছিয়া ফেলো,
ডাগর আঁখি তব এমনি কালো ॥
(মোহিতলাল)

মোহিতলালের গৃহের সাহিত্যিক আড্ডায় একদিন সাহসে ভর করে মোহিতলালকে জিজ্ঞেস করলুম : 'আপনার লেখা দু'টি কবিতা সম্পর্কে একটু খবর জানতে চাই। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'রূপদর্পণ' এবং 'বাসন্তিকা'য় প্রকাশিত 'আঁখির কাজল' নিশ্চয়ই আপনার যৌবনের রচনা। কী বলেন ?'

রাশভারী মোহিতলাল আমার এই কৌতূহলকে অনাবশ্যক মনে না করে' স্মিত হাস্যে উত্তর দিলেন—'দুটি কবিতাই আমার সাম্প্রতিক কালের রচনা।'

অবাক না হয়ে তখন বুঝতে পারলুম মোহিতলাল টেনিসনের Lady of Shalott-এর কেন এত বিমুগ্ধ পাঠক ও অনুবাদক, দেবেন্দ্রনাথ সেনের – রোমান্টিক চেতনাময় কবিতার এত ভক্ত, এমনকি আমার কবি বন্ধু ভূপেন্দ্রকিশোর বর্মণের (তখন সে দর্শনের সাম্মানিক শ্রেণীর ছাত্র) 'কালো চুলের কাব্য'কে ভালো কবিতা বলে সার্টিফিকেট দেন। বস্তুতপক্ষে যে-সুস্থ কবি-কল্পনা বিগত যুগে আমাদের কবিদের সৌন্দর্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল সুকবি মোহিতলাল মজুমদার তার শেষ প্রতিনিধি।

মোহিলালের প্রকৃতি-প্রীতি ওয়ার্ডসওয়ার্থ কিংবা রবীন্দ্রনাথের মতই অকৃত্রিম। মোহিতলাল একাধিক প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন—সরকারী কানুনগো'র কাজ করবার সময় বিস্তৃত পদ্মার চরে তিনি প্রকৃতির যে ভীষণ মধুর রূপ দেখেছেন তা তার মনের ওপর স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে। তাঁর

(পরবর্তী অংশ ১২৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

শিবনাথ শাস্ত্রীর কিছু অপ্রকাশিত ডায়েরী প্রসঙ্গে

বারিদবরণ ঘোষ

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ খ-অংশ ॥

এই অংশে আমরা শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্যক্তিগত চিন্তা ধারণা, (ধর্মবিষয়ক এবং সমাজবিষয়ক, উভয়প্রকার) বিবিধ পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সংযোগ, সাহিত্য-পরিষৎ-এর সঙ্গে তাঁর সংযুক্তি, সৌন্দর্য সাধনা, সাহিত্যচর্চা এবং অন্যান্য বিচিত্র সংবাদ পরিবেশন করছি। 'আত্মচরিত-'এর পাঠকেরা জানেন, শিবনাথ-রচিত এই আত্মজীবনীর মতো সুখপাঠ্য গ্রন্থ আর নেই। এই অংশে আমরা সেই 'আত্মচরিতের' এক নতুন পরিশিষ্ট রচনা করলাম মাত্র।

॥ আত্মপ্রসঙ্গ ॥

শিবনাথের জীবন ছিল দেশ ও সমাজের কাজে উৎসর্গীকৃত। সেকারণে স্বার্থপরতা তাঁর জীবনকে এতটুকু কালিমালিপ্ত করতে পারে নি। যা ভেবেছেন, যা করেছেন সব কিছু ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র ক'রে। কারণ তাঁর লক্ষ্য ছিল ঈশ্বরে স্থির, উদ্দেশ্য ছিল মানব-সেবা। আপন জীবনে বহুবার তিনি ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অধিষ্ঠানকে অনুভব করতে পেরেছিলেন। বহিরঙ্গে তাই তিনি 'ব্রাহ্মসমাজের দাস', কিন্তু অন্তরঙ্গে উচ্চভাবের সাধক।

ইহজগতের কাজ আর মনোজগতের সাধনা—উভয়ের মধ্যে শিবনাথ মাঝে মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারতেন না। এজন্য মনে বহু সময়ে কষ্ট পেতেন, একটা অতৃপ্তি তাঁর পশ্চাদ্-ধাবন করত। ভাবতেন, ঈশ্বরসাধনায় ত্রুটি হয়ে যাচ্ছে। অপ্রকাশিত ডায়েরীর বহুস্থানে এই প্রকারের আত্মবিচারণা ও ঈশ্বরানুভূতির কথা চিত্রিত আছে। কিন্তু যে-ব্যাপারটি সবিশেষ লক্ষণীয়, তা হ'ল, যখনই কোনো-প্রসঙ্গে শিবনাথ মানসিক চাঞ্চল্য অনুভব করেছেন, পরমুহূর্তেই একান্ত ঈশ্বরনির্ভরতা তাঁকে চাঞ্চল্যের সীমাবদ্ধতা থেকে প্রশান্তির ও প্রাপ্তির অসীমে মুক্তি দিয়েছে। শিবনাথের এই অন্তরময়তার কয়েকটি প্রসঙ্গ আমি এবার তুলে ধরছি।

৩রা মার্চ ১৮৮৪ তারিখে শিবনাথ কলকাতা থেকে কোন্নগরে শিবচন্দ্র দেবের বাড়ীতে আসেন—একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখানে পারিবারিক

উপাসনা হওয়ার কথা পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট ছিল। 'তদনুসারে প্রাতঃকালে তাঁহার ভবনে উপাসনা হইল। গায়কের অভাবে গান হইল না বিশেষতঃ উপাসনাকালে কেহ কেহ চঞ্চলতা প্রকাশ করাতে উপাসনার বড় ব্যাঘাত বোধ হইল।' আরাধনাকালে এধরণের চাঞ্চল্য শাস্ত্রীমহাশয়ের মনকে পীড়িত করত। অথচ শিবনাথ লক্ষ্য করেছিলেন, ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পর অনেকে বিত্তবান হয়েছেন, কিন্তু যথার্থ সাধক একটিও মেলেনি। একারণে বাধ্য হয়ে যাঁরা সাধন-ভজন মাত্র নিয়ে থাকবেন তাঁদেরকে নিয়ে তিনি একটি ঘননিবিষ্ট মণ্ডলী (inner circle) ও সাধন আশ্রম (১৮৯২) স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে শিবনাথের মন ব্রাহ্মসমাজের ব্যাপারে কি প্রকারের বিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তার প্রমাণ আছে গিরিডিতে অবস্থানকালে লিখিত ৫ই এপ্রিল ১৮৮৪ তারিখের ডায়েরীতে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিরোধিতার কথাও এতে উল্লিখিত হয়েছে। "অদ্য অপরাহ্নে গিরিডি যাত্রা করিলাম। পথে গাড়িতে এক পার্শ্বে বসিয়া একাকী ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছি। চিন্তা করিতে করিতে প্রাণটা কেমন একপ্রকার বিষাদে পূর্ণ হইল। ব্রাহ্মসমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বড় দুর্বল। ইহার নানা শত্রু। পূর্বে ইহার প্রাচীন হিন্দুসমাজ এবং খ্রীষ্টীয় সমাজের সহিত বিবাদ ছিল, এক্ষণে আবার আর্য্যসমাজ ও 'Theosophical Societyর সহিত বিবাদ উপস্থিত। চতুর্দিকে এত যে শত্রু—কিন্তু ব্রাহ্মদিগের সে বিশ্বাস ও নিষ্ঠা কই? মফস্বলের ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা অর্ধেক হৃদয় ঈশ্বরকে দিয়াছেন। অনেকের ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ এত দুর্বল যে ব্রাহ্মসমাজ আজ ভারত হইতে উঠিয়া গেলে তাহাদের ক্ষতি বোধ হইবে না। এই শোচনীয় অবস্থা দূর করিবার উপায় কি ইহা ভাবিতে গিয়া নিজেদের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। অমনি নিজ জীবনের ত্রুটি ও দুর্বলতা সকল স্মরণ হইল। ভাবিলাম এখনও ত পূর্ণরূপে বিধাতার ভূমি প্রাপ্ত হই নাই, এবং এখনও কামক্রোধের বশবর্তী আছি। আমার দ্বারা কিরূপে ধর্মপ্রচার হইবে। এই চিন্তায় মগ্ন হইতে হইতে প্রাণ গভীর বিষাদে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিতে লাগিলাম ঈশ্বর কি আছেন? তিনি কি আমাদের সহায়? আমার মন বলিল ব্রহ্মাণ্ডকে ধর্ম নিয়মে যিনি বাঁধিয়াছেন তিনি কি ধর্মের সহায় নহেন? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে "তুমি আমার হও আমি তোমার হই" এই মন্ত্রটি হঠাৎ মনে পড়িল। মন্ত্রটী জপিতে জপিতে ষ্টেশন হইতে নামিলাম। প্রাণে যেন এক নূতন আলোক ও সান্ত্বনা পাইলাম। এই মন্ত্রটী কয়েকদিন সাধন করিতে হইবে।" ব্রাহ্মসমাজের এই নৈতিক অবনতি তাঁর

মনে তীব্র আঘাত হানতো। একদিন (২. ১০. ১৯০৩) আনন্দমোহন বসু বলেছিলেন, 'ব্রাহ্মসমাজ ত dead'। এর কারণ হিসেবে নিজেদের দোষী করে শিবনাথ বলেছিলেন—'Dead হইতেছে আমাদের পাপের ফলে।'

অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে সমাজ-সংস্কার, সমাজোন্নতি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা-সাধন প্রভৃতির সঙ্গে শিবনাথের গভীর সংযোগ থাকলেও, স্থির লক্ষ্য ছিল তাঁর আত্মোন্নয়নে, ঈশ্বরের কৃপালাভে। শিবনাথ সেজন্য নিজেই লিখেছেন—ডায়েরীর তারিখ ৮ইমে ১৮৮৪—'আত্মানুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি যে দেশের লোকে রাজনীতি সম্বন্ধে অধিকার সকল লাভ করে, ইহার সহিত আমার আত্মার গভীর যোগ থাকিলেও কেবল তাহা আমার জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না। এইরূপ কেবল সমাজসংস্কার করাই আমার জীবনের লক্ষ্য নহে।'

সুতরাং ইহজগতের খ্যাতির বিড়ম্বনা থেকে তিনি বার বার মুক্তি পেতে চেয়েছেন। প্রথম যেদিন শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজ ও সিন্দুরিয়াপটি ব্রাহ্মসমাজে আচার্যের কাজ করলেন, সেদিন সেটি 'প্রভূত আধ্যাত্মিক উন্নতির ও আচার্যের কার্য শিক্ষার উপায় স্বরূপ' হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে তিনি নেতৃত্বের সামনের সারিতে এলে এই আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ যে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল, একথা ভেবে শিবনাথ গভীর দুঃখ বোধ করতেন—'আমার প্রথম অধোগতি তখন আরম্ভ হইল যখন আমি ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরিচিত ও অনেকের শ্রদ্ধাভাজন হইলাম।' (৫. ৫. ১৮৮৪). সেকারণে আচার্যবাদ ত্যাগ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ তাঁকে অব্যাহতি দেয়নি। সংকল্প বার বার পরিত্যক্ত হয়েছে। ৯.১১. ১৯০১ তারিখে লিখেছেন—'এইরূপ সংকল্প করিতেছি যে প্রচারক ও আচার্যের পদ ত্যাগ করিব।' স্মর্তব্য, এই বছরেই প্রথমা পত্নী প্রসন্নময়ীর মৃত্যু হয় ও শিবনাথের শরীর ভাঙতে শুরু করে। ১লা অক্টোবর ১৯০৩, বৃহস্পতিবারেও আচার্যত্বত্যাগের একই সংকল্প দেখি—'Love of power অথবা প্রশংসাপ্রিয়তা' ঈশ্বর সাধনার 'গলা টিপিয়া' রেখেছে, তা থেকে মুক্তি চাই।

অতি শৈশবে যে কবি একান্ত ঈশ্বরনির্ভরতার পরিচয় দিয়েছিলেন, বার্ধক্যে তাঁর যেন ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক বিনিময় হয়েছিল। ঈশ্বরকে একই কালে তিনি মাতৃ ও পিতৃ-রূপে ভাবনা করেছেন। নিজেকে পুত্ররূপে কল্পনা করে শিবনাথ ব্রহ্মকে পিতারূপে পেতে চেয়েছিলেন—'ঈশ্বর পিতা, আমি পুত্র এ সম্বন্ধ কেহই লোপ করিতে পারে না' (২৯. ৪. ৮৪)। এই আত্মবিশ্বাস সুদীর্ঘকালের সাধনায় ক্রম-দার্ঢ্যতা পেয়েছে—'অদ্য (৪. ৫. ৮৪) ধর্মজীবনের প্রারম্ভ অবধি

অন্ত পর্যন্ত যত স্মরণ হয় সমুদয় ঘটনা ও অবস্থা স্মরণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম অশেষ প্রকার দুর্বলতার মধ্য হইতে ঈশ্বর ক্রমাগত তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার কৃপার স্পষ্ট নিদর্শন দেখিয়া প্রাণমন মুগ্ধ হইয়া গেল। প্রাণটী এই প্রাতঃকালের উপাসনাতে বড় ভাল হইয়া গেল।' একেই বলা হয়, ব্রহ্মসম্মিলন বা Communion। শিবনাথের আত্মকাহিনী তাই 'তাঁর করুণার সাক্ষ্য' (১২. ৯. ১৯০৩) মাত্র।

॥ পত্রিকা-প্রসঙ্গ ॥

ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে যাঁরা কৌতূহলী তাঁরা জানেন যে, ভারতহিতৈষিণী এবং রামমোহনের প্রামাণ্য জীবনীরচয়িত্রী মিস্ সোফিয়া ডবসন কলেটের সম্পাদনায় ব্রাহ্মসমাজের বর্ষপঞ্জী Brahmo Year Book-এর কয়েকটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু একথা অনেকেরই জানা নেই যে, শিবনাথ শাস্ত্রী একসময়, অল্পদিনের জন্য হলেও, এই সম্পাদনা ব্যাপারে যুক্ত হয়েছিলেন। তথ্য হিসাবে এ-প্রসঙ্গ মূল্যবান। অপ্রকাশিত ডায়েরীর ১৮.৫.১৮৮৩ তারিখে শিবনাথ লিখেছেন যে, এ সময়ে মিস্ কলেট ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ঠিক হয়েছিল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন কর্তৃপক্ষ এটি যথাসময়ে প্রকাশ করবেন। সেইমত শিবনাথ "Retrospect ও কেশবচন্দ্র সেনের Sketch" লিখবেন স্থির হয়েছিল। এ কারণে তিনি পরদিনই তথ্য-সংগ্রহের কারণে বিভিন্ন সমাজে চিঠিপত্র লেখেন—"অপরাহ্নে ব্রাহ্ম ইয়ার বুকের জন্য লাহোর বোম্বাই, গুজরাটে পত্র লিখিলাম।" একদিন বাদ দিয়ে একুশ তারিখে মিস্ কলেট যে সব চিঠি পাঠিয়েছিলেন, সেগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন—'অদ্য প্রাতে উঠিয়া Brahmo Year Book সংক্রান্ত Miss Collet এর পত্রাদি পাঠ করা গেল।'

অপর একটি পত্রিকা-সম্পাদনেও শিবনাথের গোপন সহায়তা ছিল। কৃষ্ণকুমার মিত্র ছিলেন 'সঞ্জীবনী'র বহুখ্যাত সম্পাদক। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি নয়জন স্বদেশীকে নির্বাসিত করেন। তখন 'সঞ্জীবনী'র প্রকাশ ব্যাপারে শিবনাথ খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, গগনচন্দ্র হোম প্রভৃতির সঙ্গে তিনি "কৃষ্ণকুমার বাবুকে যে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে সঞ্জীবনী কিরূপে চালান যাইবে সে বিষয়ে পরামর্শ" করেছেন (২০.১২.১৯০৮)। কৃষ্ণকুমার বাবুর কন্যা কুমুদিনী মিত্র ছিলেন কৃতবিদ্য। শিবনাথ তখন পূর্বপরামর্শ অনুযায়ী

পরোক্ষভাবে সম্পাদকের ভার গ্রহণ ক'রে কুমুদিনীকে এ ব্যাপারে সহায়তা করলেন—''সঞ্জীবনী আপীসে কৃষ্ণকুমার বাবুর পরিবারদিগকে দেখিতে গেলাম। সেখানে মুখে মুখে সঞ্জীবনীর জন্য কিছু বলিলাম, কুমুদিনী লিখিয়া লইলেন' (২১.১২.১৯০৮)। পরের দিনও 'কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়ীতে গিয়া সঞ্জীবনীর জন্য কিছু কিছু dictate করি, কুমুদিনী লেখেন।' এই পত্রিকাটির এই আংশিক সম্পাদকত্বে শিবনাথের সম্পাদক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে—যদিও 'তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা'র সঙ্গে আমৃত্যু সংযুক্ত ছিলেন।

এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে শিবনাথ পত্র-পত্রিকায় রচনা পাঠিয়ে নেহাৎ বাধ্য না হলে কোনো পারিশ্রমিক নিতেন না। তাঁর মতো প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতিমান্ লেখকের বিনা পারিশ্রমিকে একই সঙ্গে অনেকগুলি পত্রিকায় লেখা আমাদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে। আসলে, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর মতো সত্যনিষ্ঠ ও নির্লোভ ব্যক্তির সাক্ষাৎ খুবই দুর্লভ। সেকারণে বহু পত্রিকা তাঁকে রচনা পাঠাবার জন্য অনুরোধ পাঠাতো। তিনিও সাধ্যপক্ষে অনুরোধ রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। প্রখ্যাত 'East and West' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন Mr Malabari, তিনি তাঁর পত্রিকায় রচনার জন্য শিবনাথকে অনুরোধ করেছিলেন। ১৬.১২.১৯০১ তারিখের ডায়েরীতে শিবনাথ এ-বিষয়ে লিখেছেন, Mr. Malabari তাঁর 'East and West' ''পত্রিকার contributor হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।...আমি East & West এ লিখিব মনে করিতেছি।'' সেদিনই একটি প্রবন্ধের খসড়া মনে মনে করেন এবং পরদিন রচনারম্ভ করেন। ডায়েরীর এদিনের পৃষ্ঠাটি কীটদষ্ট হওয়ায় প্রবন্ধটির সঠিক নাম উদ্ধার করা গেল না। শিবনাথের অনুগত জনৈক মুনীন্দ্র শিবনাথের শ্রুতিলিখনটি লিপিবদ্ধ করেন।—''...East and West এর জন্য English .....in Bengal বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখিতেছি তাহার কতকটা dictate করিলাম মুনীন্দ্র লিখিলেন।' Hindusthan Review পত্রিকা তাঁকে রামমোহন-বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার জন্য অনুরোধ জানান। এই বিষয়ের উপর রচিত তাঁর দু'টি প্রবন্ধ এই পত্রে প্রকাশিত হয়। প্রথমটির প্রকাশকাল আমি জানতে পারিনি। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি শিবনাথ রচনা করেন ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের তিন ও চার তারিখে—' Hindusthan Review-এর জন্য রামমোহন রায় বিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধ লিখিতে বসি।'' ১৬ই নভেম্বরের ডায়েরী পাঠে জানতে পারি ঐদিন রচনাটি উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন শিবনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

তাঁর অনুরোধে শিবনাথ অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রাক্কালে প্রবাসীতে প্রকাশিত শিবনাথের প্রবন্ধাবলী তৎকালীন রাজনীতিকদের মধ্যে আলোড়ন জাগিয়েছিল। তাঁর সমাজপ্রসঙ্গ-মূলক বহু প্রবন্ধও এই পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩০৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে শিবনাথের সমাজচিন্তা বিষয়ক একটি প্রবন্ধের তিনটি অংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এর প্রথমাংশটির রচনারম্ভ হয় ২৩.১০.১৯০৩ তারিখে—'প্রবাসীর জন্য একটি আর্টিকেল লিখিতে বসিলাম।' এই আর্টিকেলটির নাম যে 'বিভিন্ন সামাজিক আদর্শের সংঘর্ষ' ৬.১১.১৯০৩ তারিখের ডায়েরী পাঠে তা' জানতে পারি—"'প্রবাসী''র জন্য বিভিন্ন সামাজিক আদর্শের সংঘর্ষ নামক একটি প্রবন্ধ লিখিতে বসিলাম।" বলা বাহুল্য এটি পূর্বোদ্ধৃত আর্টিকেলের অনুক্রমণ। প্রবাসীর পৌষ ১৩০৯ সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধটির 'দ্বিতীয় প্রস্তাব' প্রকাশিত হয়। এর রচনারম্ভ হয় ২২.১১.১৯০৩ তারিখে…"প্রবাসীর জন্য সামাজিক আদর্শের সংঘর্ষ বিষয়ে দ্বিতীয় প্রবন্ধ লিখিতে বসি।" ২৫ তারিখে এটি 'revise' করার পর ডাকে পাঠান এবং ৭ই ডিসেম্বর তারিখে 'তৃতীয় প্রস্তাবের অনেকটা রচনা করেন। ৯ তারিখে প্রবন্ধ রচনা সমাপ্ত হয়। রামানন্দ শিবনাথের বন্ধু হলেও সম্পাদক হিসেবে নির্মম ছিলেন। এই তৃতীয় প্রস্তাবটি তাঁর মনোমত হয়নি এবং সেজন্য ফেরৎ পাঠিয়ে দেন প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধনের জন্য। শাস্ত্রী মহাশয় নির্দেশমতো সংশোধন করে সেটি আবার পাঠিয়ে দেন বাইশ তারিখে—"…প্রবাসীর তৃতীয় প্রবন্ধ ফেরৎ আসিয়াছে, তাহাতে কিছু যোগ করিলাম।" উল্লেখ্য, এই প্রবন্ধগুলি পরে শিবনাথের 'প্রবন্ধাবলি' (১৯০৪) নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল।

কোন্ তারিখে কোন্ প্রবন্ধের রচনা আরম্ভ হয়েছে, তার তালিকা নির্ণয়ে সাহিত্যগত মূল্য নিরূপিত হয় না। কিন্তু তাতে লেখকের রচনার দ্রুততা ও চিন্তার বহমানতা সম্পর্কে একটি পরিচয় পাওয়া যায়। নানা কাজের মানুষ শিবনাথ দীর্ঘ প্রবন্ধত্রয় মাত্র দুমাসের মধ্যে রচনা শেষ করেন। এর মধ্যে তিনি রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থের নিয়মিত প্রুফ দেখেছেন, 'বিধবার ছেলে' নামক উপন্যাস রচনা করে চলেছেন, Hindusthan Review এর জন্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন, উপবীত ত্যাগ করার পর স্ত্রীপুত্র সঙ্গে নিয়ে প্রথম পিতৃভূমি মজিলপুরে গিয়ে দিন তিনেক থেকেছেন, 'প্রবন্ধাবলি' নামক পরিকল্পিত পুস্তকের প্রবন্ধগুলি সাজিয়েছেন ও পরে প্রুফ দেখেছেন, এবং গোখলে ও ভাণ্ডারকারের সঙ্গে রাজনীতি ও ধর্মবিষয়ক আলোচনা

করেছেন। এছাড়া অন্ততঃ গোটা বিশেক দেশী-বিদেশী বই পড়ে শেষ করেছেন। বিস্মিত হবার কথা বই কি!

একটা কথা মনে হতে পারে, তবে কি কলম হাতে নিয়ে শিবনাথের যা মনে আসতো তা-ই তিনি লিখে ফেলতেন? শিবনাথের মতো বহুদর্শী অভিজ্ঞ লেখক সম্পর্কে এরকম তরল চিন্তা অনুচিত হবে। দু'টি প্রমাণ আমি শিবনাথের ডায়েরী থেকে তুলে ধরছি। 'প্রবাসী'র কার্তিক ১৩১১ সংখ্যায় শিবনাথের চিন্তাসঞ্চরণ নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর বক্তব্যকে শিবনাথ ইংরেজি ক'রে 'Migration of Ideas' এই নাম দিয়েছেন। এই প্রবন্ধটি রচনার পূর্বে প্রস্তুতি হিসেবে শিবনাথ কয়েকটি গ্রন্থ মনোযোগের সঙ্গে পড়েন। ১০৮.১৯০৪ তারিখের ডায়েরীতে তিনি লিখেছেন,—"..."চিন্তাসঞ্চরণ" নামক প্রবাসীর প্রবন্ধের নিমিত্ত Tod's History of Rajasthan এবং Hunter's Rural Bengal পড়িতে আরম্ভ করি"। ডায়েরী পাঠে আরও জানতে পারি, এসব পড়াশুনো তিনি ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীতে (বর্তমানে ন্যাশনাল লাইব্রেরী) গিয়ে করতেন। প্রবাসীর ভাদ্র ১৩১১ সংখ্যায় প্রকাশিত 'মহাত্মা বেথুন ও এদেশে স্ত্রীশিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধটির জন্যও ঐ একইদিনে পড়াশুনো করেছেন। ঐদিন পুনরায় লিখেছেন, "Imperial Library তে গিয়া Bethune এর জীবন বিষয়ে Calcutta Review হইতে Notes লই।" ১২ই আগষ্ট এই প্রবন্ধটির রচনাকর্ম সমাপ্ত হয়। বেথুন কলেজের মেয়েদের অনুরোধে রচিত এই প্রবন্ধটি বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র ঐ দিনই বেথুন কলেজের মহিলাদের মিটিংএ পাঠ করে শোনান। এই প্রবন্ধে শিবনাথ সগর্বে ঘোষণা করেন—'আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি বঙ্গদেশের সামাজিক উন্নতি ইহার নারীগণের সাহায্যেই হইবে।'*

॥ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ॥

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে শিবনাথ ইংলণ্ড যান এবং সেখানের রয়্যাল সোসাইটি, ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি শিক্ষা-সংস্থার কাজ দেখে অত্যন্ত অভিভূত হন। এদেশে প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক্ সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল যেভাবে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় সে সময়ে প্রবৃত্ত হয়েছিল, শিবনাথ তাতে গভীর সন্তোষ প্রকাশ

---

* শিবনাথ সম্পাদিত পত্রিকা প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্যাবলী বর্তমান লেখকের 'সাহিত্য-সাধক শিবনাথ শাস্ত্রী' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

করতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ দীনেশচন্দ্র সেন এবং নগেন্দ্রনাথ বসুর কর্মোদ্যোগকেও তিনি স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। শিবনাথের সঙ্গেও সাহিত্য পরিষৎ-এর যথেষ্ট সংযোগ ছিল। ১৩১০ বঙ্গাব্দে তিনি সাহিত্য পরিষৎ-এর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিরক্ষার্থে ৮০৲ আশি টাকা সংগ্রহ করে পরিষৎকে দেন। যশোহর সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে তাঁকে মনোনীত করা হয়েছিল, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে এবং চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন নি।

ডায়েরীতেও সাহিত্য পরিষৎ সম্পর্কে ইতস্ততঃ কয়েকটি মন্তব্য রয়েছে। যেমন, ১৭, ১০, ১৯০৩ তারিখে তিনি "সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির এক মীটিংএ" যোগদান করেছিলেন। ২৩. ৭. ১৯০৪ শনিবারে অনুষ্ঠিত এক সভাতেও তিনি পরিষৎ-এ গিয়েছিলেন।—"শনিবার সাহিত্য পরিষদের সভাতে যাই।"

॥ সুরাপান নিবারণ প্রসঙ্গ ॥

এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মদ্যপান-কে সভ্যতার চিহ্নহিসাবে সগর্বে গ্রহণ করেছিল। এঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন যাঁরা উত্তরকালে জীবনের বিভিন্নক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। রাজনারায়ণ বসু, মধুসূদন দত্ত, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরা অপরিমিত মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন। তারপর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে ধীরে ধীরে এদেশে মদ্যপান বিরোধী আলোড়ন গড়ে ওঠে। এবং এই সুরাপায়ী-দের অন্যতম রাজনারায়ণ বসুই এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। রাজনারায়ণের পর প্যারীচরণ সরকার এ-ব্যাপারে এগিয়ে আসেন। শিবনাথ প্যারীচরণের এই সভার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। তাছাড়া কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ভারত-আশ্রমের সুরাপান নিবারণী শাখার মুখপত্র 'মদ না গরল?' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শিবনাথ। কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় খোলাভাটি (Outstill system) সম্পর্কে তিনি তীব্র মন্তব্য করতেন। এই মদ্যপান প্রথা তাঁকে কি গভীর বেদনা দিত তার কিছু কিছু প্রমাণ এই আলোচিতব্য ডায়েরীগুলিতে আছে। একদিন (১৫, ৪, ১৮৮৪) সখেদে লিখেছেন —'স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে সুরাপান অত্যন্ত প্রবল—এমন কি গত বৎসর এখানে ১১৭০০০ হাজার টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছে কিন্তু আবগারির আয় ১৯১০০০ হাজার টাকার অধিক হইবে।' ১৭, ৪, ১৮৮৪ তারিখের ডায়েরীতে

দেখছি তাঁর উদ্যোগেই সুরাপান নিবারণের উদ্দেশ্যে গিরিডিতে একটি 'Temperence সভা' স্থাপিত হয়েছিল। এমন কি শিবনাথ যখন ইংলণ্ডে ছিলেন, তখন সে দেশেও মদ্যপানের কুফল বিষয়ে যত্রতত্র বক্তৃতা করতেন। এদেশেও এমনতর বহু বক্তৃতা করেছেন। বৃদ্ধ বয়সে ১৫, ৯, ১৯০৩ তারিখেও তিনি অ্যালবার্ট হলে এ-বিষয়ে একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন।

॥ প্রকৃতি চেতনা ॥

উচ্চ ভাবের সাধকেরা প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব ক'রে থাকেন —তাঁদের রচনা থেকে এমন অনুভূত হয়। তাঁদের কাছে তাঁদের আরাধ্য ভগবান পরম আনন্দময়। কাজেই প্রকৃতিও আনন্দরূপ—সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। বিপিনচন্দ্র বলেছিলেন—শিবনাথ মুখ্যত একজন কবি। শিবনাথের কবিচিত্তের প্রকৃতিচেতনা ও সৌন্দর্যবোধের কিছু কিছু পরিচয় এই ডায়েরীতে আছে। এতদ্ব্যতীত এর পরে যে সাহিত্য প্রসঙ্গ আলোচনা করছি, তাতেও এই সৌন্দর্যচেতনার নানা পরিচয় মিলবে।

প্রকৃতির সান্নিধ্যে শিবনাথের কবিত্ব স্ফূর্তিলাভ করতো। তাঁর 'হিমাদ্রি কুসুম' কাব্য প্রকৃতির বুকে বসে লেখা। বহু কবিতার নামের নীচে বন্ধনী মধ্যে 'নির্জন উদ্যানে লিখিত' কথাটিও এই প্রকৃতি-সান্নিধ্যের কথাই প্রমাণ করে।

শিবনাথের কাব্যগ্রন্থগুলির নামকরণের দিকে লক্ষ্য করলেই (পুষ্পাঞ্জলি, পুষ্পমালা, হিমাদ্রিকুসুম) বেশ বোঝা যায় যে, ফুলের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। ২০,৬,১৯০৮ তারিখে তিনি যখন দার্জিলিঙে ছিলেন তখন সেখানকার বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে গিয়ে তাঁর মনে নিম্নরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল—"আজ প্রাতে Botanical Gardens এ বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফুলের ঘরে প্রবেশ করিয়া ফুলগুলি দেখিয়া চক্ষে জল আসিল, সেগুলিকে চুম্বন করিতে ইচ্ছা হইল, যেন জননীর অঞ্চলের কারুকার্যের ন্যায় মনে হইতে লাগিল।" কলকাতার ইডেন উদ্যানের শোভা দেখে তাঁর মন কাব্যরসে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, কবিতাও রচনা করেছিলেন সেদিনই (৩,১,১৯১০)—"দুই দিন হইতে প্রাতে (Eden Gardensএ ; প্রকৃতির সুন্দর শোভা দেখিয়া এক অপূর্ব ভাব মনে আসিয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি—

সারানিশি ছিলা পড়ি প্রকৃতিসুন্দরী
মান ভরে নীলাম্বরে আপনা আবরি ;
ঊষাগমে প্রেমকর প্রসারি তপন,
ঘোমটা খুলিয়া মুখ করে দরশন।
এই প্রেমলীলা দেখে যেন পক্ষীকুল,
কোলাহল করে উঠে আনন্দে আকুল।"

মাঘের মাঝামাঝি ৩১,১,১২১০-এ আরও কয়েকটি পংক্তি এর সঙ্গে সংযোজন করেন ইডেনে বেড়াতে বেড়াতে—

হিমজলে করি স্নান স্নিগ্ধ ধ্যানরূপ,
তরুলতা ধরিয়াছে শোভা অপরূপ ;
হিম-স্নাত দুর্বাদল প্রাণ মন হরে ;
ধরা যেন প্রেমানন্দে পুলকে শিহরে।

অনেক পরে এই বছরের আগষ্ট মাসের তেইশ তারিখে ইডেনে পুনরায় ভ্রমণকালে ইডেনের অপরূপ শোভা তাঁর মনোহরণ করে। পুরনো ভাব আবার তাঁর মনকে কাব্যরসসিক্ত করে তোলে। কবি লিখেছেন—"আজ প্রাতে Eden Garden এ বেড়াইতে বেড়াইতে বাগানের শোভা দেখিয়া মন মুগ্ধ হইয়া গেল ; শরীর কণ্টকিত হইতে লাগিল। অনেক দিনের পর সেই ভাবটা আজ আবার নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তিতে প্রকাশ করিলাম।

একি সুখ প্রকৃতি লো খুলেছে প্রভাতে
মন প্রাণ মগ্ন হলো অপূর্ব শোভাতে।
পুলকে পুরিছে তনু, নাচিছে হৃদয়,
অতলে এলাই যে, কোথা পাই লয়।"

শিবনাথের জীবন নিরবচ্ছিন্ন কবিতাচর্চার জীবন ছিল না। সামাজিক নানা দায়িত্বের চাপে কাব্যচর্চায় নানা সময়ে ব্যাঘাত এসেছে। রাজনারায়ণ বসু তো একবার দুঃখ করেই বলেছিলেন, 'হায়, কি পরিতাপ, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের যাঁতায় পড়িয়া শিবনাথের সাহিত্যিক জীবন খর্ব হইল। এত বড় কবিকে ব্রাহ্মসমাজ মারিয়া ফেলিল।' শিবনাথও একথা অনুভব করতেন। সেকারণে যে মুহূর্তে তিনি অবসর পেতেন, কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করতেন। এ-সম্পর্কে শিবনাথের সাক্ষ্য আমরা তাঁর ডায়েরী থেকে উদ্ধার করে এই

প্রসঙ্গ শেষ করছি—২৩.৯.১৯১১—"এক সময়ে আমি কবিতা পড়িতে ও লিখিতে ভালবাসিতাম, প্রকৃতিকে ও মানুষকে কবির চক্ষে দেখিতাম। কালক্রমে বিবাদ বিসম্বাদ, ছাড়াছাড়ি, ছুটাছুটি খাটুনি প্রভৃতির মধ্যে পড়িয়া আমার কবিত্ব আর স্ফূর্তি পাইবার সময় পাইল না। এখন সময় আসিয়াছে—যখন একান্তে ও প্রকৃতির বক্ষনিকেতনে বসিয়া আবার কবিত্বের স্ফূর্তির দিকে মন দিতে হইবে।" শিবনাথের বয়স তখন ৬৪। বস্তুতঃ তিনি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত—অর্থাৎ মৃত্যুর অন্ততঃ তিন বছর পূর্ব পর্যন্ত কাব্যচর্চা করে গেছেন—অপ্রকাশিত ডায়েরীতে তার উল্লেখ রয়েছে।

॥ সাহিত্য-প্রসঙ্গ ॥

ব্যক্তি-প্রসঙ্গে এমন বহুকথা উল্লিখিত হয়েছে, যেগুলি শিবনাথের সাহিত্য-জীবনের বহু অজ্ঞাত-তথ্যাবলী উদ্ঘাটিত করেছে। তাঁর এই ডায়েরীতে আমরা পেয়েছি তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,' প্রবন্ধাবলি, ধর্মজীবন, বিধবার ছেলে History of Brahmo Samaj, Men I Have Seen প্রভৃতি মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর রচনারম্ভ ও প্রস্তুতির কাল সম্পর্কে নানাবিধ তারিখ ও তথ্য। এছাড়া জানতে পেরেছি পরিকল্পিত কয়েকটি পুস্তক রচনার কথা। Men I Have Seen ধরণের একটি বাংলা বই 'মনের মানুষ' নাম দিয়ে তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, অসংকলিত কবিতাগুলি সংকলন করতে চেয়েছিলেন 'প্রসূন প্রক্ষেপ' নাম দিয়ে, অন্যান্য প্রবন্ধগুলি 'প্রবন্ধাবলি' গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করে' সংকলনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত, চৈতন্যভাগবত, অদ্বৈতপ্রকাশ প্রভৃতি বৈষ্ণবধর্মভিত্তিক গ্রন্থগুলি তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করত। সেকারণে তিনি 'নবভক্তিধর্ম' নামে একটি গ্রন্থরচনার ইচ্ছাও পোষণ করেছিলেন। আমৃত্যু তাঁর সংকল্প ছিল (১৫.১০.১৯০১)—"অতঃপর যাহা কিছু শক্তি অবশিষ্ট থাকিবে তাহা প্রধানতঃ সাহিত্য রচনাতে দিতে হইবে।" গ্রন্থরচনার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের সুষ্ঠু সেবা সম্ভব—এই ছিল এই সাহিত্যপ্রাণ ব্রাহ্মনেতার ধারণা। সেকারণে তাঁর রচিত বিশুদ্ধ সাহিত্যের পাশে ধর্মভিত্তিক সাহিত্য স্বমর্যাদায় স্থান পেয়েছে। আসলে তিনি চেয়েছিলেন (১২.৫.১৯০৯):—'Literary Work এর দ্বারা ধর্মভাব বিস্তার' করতে। ধর্ম বলতে তিনি আনুষ্ঠানিক কয়েকটি আচার-

সংস্কার-বিধি পালন বা উপাসনার ভাণকে বুঝতেন না। তাঁর জীবনের মর্মমূলে ছিল শুদ্ধ নৈতিকতা। নিজের রচনার সমালোচনা করতে গিয়ে অথবা অপরের গ্রন্থপাঠের পর সমালোচনা করতে গিয়ে এই নৈতিকতার মানদণ্ডেই বিচার করতেন। নিজ-রচনার একটি সমালোচনা ডায়েরী থেকে এই প্রসঙ্গে তুলে দিচ্ছি। লেখক নিজের লেখাকে কী দৃষ্টিতে দেখেন, তা জানার সুযোগ তো আমাদের সহজে আসে না. ১২.৭.১৯০৪ তারিখে শিবনাথ তাঁর প্রস্তুয়মান উপন্যাস 'বিধবার ছেলে' এবং প্রকাশিত উপন্যাস 'যুগান্তর' সম্পর্কে লিখেছেন—"বেড়াইয়া আসিয়া বিধবার ছেলে অনেকটা লিখিলাম। এই বইখানা তাড়াতাড়ি শেষ করা আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু আমার নায়ক একজন সংস্কার ভাবাপন্ন লোক। দেশে যেরূপ reaction এর স্রোত চলিয়াছে, তাহাতে এ ভাবাপন্ন নায়কের আকর্ষণ হইবে কিনা সন্দেহ। বিশ্বনাথ তর্কভূষণের মত একটা লোক ইহার মধ্যে থাকিলে ভাল হয়। এমন একটা মানুষ কোথা দিয়া আনি সেই চিন্তা মনে জাগিতেছে। আর একটা কথা আমার Female Characters গুলি সবই ভাল করিতে যাইতেছি. এটাও কি স্বাভাবিক? বাঁদর মেয়েও তো সমাজে আছে। কিন্তু কেন জানি না, মেয়ে মানুষকে বদ দেখিতে বা অঙ্কিত করিতে আমার ভাল লাগে না। যুগান্তরের মাতঙ্গিনী হতভাগিনীকে বদ করিতে গিয়াও সম্পূর্ণ বদ করিতে পারি নাই। তত wicked নহে যত silly—আমার বোধহয় সাধারণতঃ স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে wickedness তাহাদের মধ্যে বড় কম, তাহারা যে পাপে যায় তাহা silliness এর জন্য। মনে হইতেছে, দু-একটা বদ মেয়ে মানুষও দিতে হইবে।" আসলে শিবনাথ দেশের যুব-সম্প্রদায়কে টলস্টয়ের চিন্তাধারায় প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন। এ কারণে এই প্রকারের পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন।*

---

* [আরও দু'টি প্রসঙ্গ এই ডায়েরী থেকে উদ্ধারযোগ্য ছিল। কিন্তু পূর্বেই এ দু'টি অন্যত্র প্রকাশিত হওয়ায় এই অংশকে আর অপ্রকাশিত ভাবছি না। একটি প্রসঙ্গ, মৃত্যু-সম্পর্কে শিবনাথের চিন্তাধারা—এটি প্রকাশিত হয়েছে বর্ত্তমান লেখক কর্তৃক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত পাক্ষিক 'তত্ত্ব-কৌমুদী' পত্রিকার ৯২ ভাগ, ২২-২৪ সংখ্যায়। দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক —শিবনাথ শাস্ত্রী কি কি বই পড়তে ভালবাসতেন। গ্রন্থকীট শিবনাথের এই প্রসঙ্গটিও সবিস্তারে উক্ত পত্রিকার ৯২ ভাগ, ১৩-১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। কৌতূহলী পাঠকদের সে দুটি দেখার জন্যে অনুরোধ করছি।]

॥ বিচিত্র সংবাদ ॥

শিবনাথের এই ডায়েরী নানা চূর্ণ সংবাদে পরিপূর্ণ। এতে শিবনাথের ব্যক্তিগত জীবন, রুচি ও নৈতিকতার নানা বিচিত্র সংবাদ ইতস্তত: ছড়িয়ে আছে।

শরীরচর্চায় তাঁর আগ্রহ ছিল প্রভূত। তাঁর স্বাদেশিকতা ভীরু দেশ-প্রেমিকের দুর্বল লেখনী সঞ্চার মাত্র ছিল না। ৫৫ বছর বয়সেও তিনি ব্যায়াম করতেন, খালি হাতে নয়, ভারী dumb-bell নিয়ে—'প্রাতে ১০।১৫ মিনিট dumb-bell exercise করিলাম'—১.৮.১৯০৩। এমন আরও বহু বছর করেছেন। ২৯.৯.১৯০৩ তারিখে তিনি সরলা দেবীর বীরাষ্টমী উৎসবে লাঠি-খেলা দেখে চমৎকৃত হন।

বাল্যবিবাহ সম্পর্কে—বিশেষতঃ স্বামী-স্ত্রীর বয়সের ব্যবধানে আসমান-জমিন ফারাক থাকলে—তাঁর গভীর আপত্তি থাকত—"একজন ৫০ বৎসরের বুড়ো মদ্দ একটী ১৪ চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকার সহিত প্রেম করিতেছে স্মরণ করিলেও আমার হৃৎকম্প হয়। ইহাতে উভয়েরই শারীরিক ও মানসিক অধোগতি হইয়া থাকে। বালিকার মানসিক পবিত্রতা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।"—এমন মন্তব্যটি ৮.৪.১৮৮৪ তারিখের।

১৪.৪.১৮৮৩ তারিখে তিনি প্রথম জেল দেখেন এবং কয়েকজন কয়েদীকে নানাবিধ প্রশ্নাদি করেন। এই রকম একজন কয়েদী অনেক পরে তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, শিবনাথের প্রভাবে তাঁর জীবনে পরবর্তীকালে কি পরিমাণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল।

Indian Museum পরিদর্শন করেন ৩.১০.১৯০৩ তারিখে।

জাপানী রমণীদের তৎকালীন যৌনদুর্বলতা তাঁকে বিচলিত করেছিল। "সেখানে licensed prostitution and segregation of prostitutes আছে'—এই সংবাদ শুনে ১৬.১০.১৯০৩ শুক্রবার তাঁর নিজের বালিগঞ্জের বাড়ীতে বসে জাপান-প্রত্যাগত বন্ধুকল্প রমাকান্ত রায়ের সঙ্গে দীর্ঘ ও অন্তরঙ্গ আলোচনা করেছেন। মেয়েদের নৈতিক অবনতি তাঁকে বিচলিত করত। সে কারণে তিনি ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে অভিনয় করার পক্ষপাতী ছিলেন না। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার প্রথম যুগে তিনি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের হয়ে থিয়েটারের reporter এর কাজ করতেন। ১৬ই আগষ্ট ১৯০৯ তারিখে তিনি দার্জিলিঙে ছিলেন। এখানে আনন্দমোহন বসুর বাড়ীতে বিদেশী অভিনেত্রী Mrs. Christeen এসে কয়েকদিন ছিলেন। তাঁর সঙ্গে অভিনয়

সম্পর্কে শিবনাথের যে কথাবার্তা হয়েছিল সেগুলি আমরা শিবনাথের ভাষায় নীচে তুলে দিলাম—"Mrs. Christeen সেখানে (অর্থাৎ আনন্দমোহন বসুর বাড়ীতে) আছেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক কথা হইতে [হইতে] Native Theatres সম্বন্ধে কথা হইল, আমি actressদের সঙ্গে ভদ্রলোকের ছেলেদের মেশার তীব্র প্রতিবাদ করিলাম। তৎপরে মনে কি এক অদ্ভুত আবেগ আসিল —actressদিগের একটা home করিয়া stage regenerate [এর] যে একটা idea অনেক [দিন] হইতে মনে আছে, ব্রাহ্ম মেয়েদের মধ্যে তেমন মেয়ে না পাওয়াতে তাহা কার্যকর করিতে পারিতেছি না বলিয়া আসিতেছি, সে idea টা Mrs Christeen এর মত মেয়ে পাইলে হয়, এইরূপ মনে আসিল।"

পশুপ্রীতি শিবনাথের আবাল্যগুণ। 'মেজবৌ' উপন্যাসের টুনোশালিখ, আত্মচরিতের রবার্টকুকুর—যার জন্যে শিবনাথ সদ্যোপরিণীতা বধূকে গৌণ বলে ভেবেছিলেন—তারা তাঁর শিশুসঙ্গী ছিল। বৃদ্ধবয়সেও এই সম্পর্ক আরও বৃদ্ধির কথা লিখেছেন (৩.১০.১৯১১)—"ইতর প্রাণীদের প্রতি দয়ার ভাব··· জীবনের এই অবশেষ কালে বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।'—তখন শিবনাথের বয়স ৬৪ বছর।

শিবনাথ ইংলণ্ড গিয়েছিলেন ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। শুধু ইংলণ্ড নয়, আমেরিকা যাবারও ইচ্ছা তিনি বহুদিন ধরে মনে লালন করে এসেছিলেন—বন্ধুবর দুর্গামোহন দাস একথা জানিয়েছিলেন। বিদেশে যাওয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিবনাথ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল ডায়েরীতে লিখেছেন—"পুরাতন সংকল্প। সংকল্পটা এই জগদীশ্বর যদি অনুকূল না হন তবে ৩ বৎসর ইউরোপ ও আমেরিকাতে গিয়া থাকিয়া, সেখানকার ধর্মজীবন, রীতিনীতি ও রাজ্যশাসন ও সমাজসংস্কার প্রভৃতির প্রণালী মনোযোগপূর্বক পাঠ করিয়া আসিব। তাহা হইলে এখানে আসিয়া অনেক কাজ করিতে পারা যাইবে। কিন্তু সেখানে যাইতে হইলে, তাহার পূর্বে আমার সংস্কৃত জ্ঞানটা একবার ঝালাইয়া লওয়া আবশ্যক। এবং এখানকার দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, ধর্মসম্প্রদায় সকলের বিষয় কিছু কিছু জানা কর্তব্য। নিজের ঘরের কাছের কথা না জানিয়া দূরে জানিতে যাওয়া বাতুলের কার্য্য।···তৎপরে ১৮৮৬ সনের প্রারম্ভে ইংলণ্ড যাত্রা করা যাইতে পারে।" ১৮৮৪ সালের এই ইচ্ছা ১৮৮৮ সালে রূপায়িত হয়েছিল।

যুবশক্তির সামর্থ্য সম্পর্কে শিবনাথের গভীর আস্থা ছিল। এক সময় তাঁর আহ্বানে ঢাকা জগন্নাথ কলেজের বহু দেশপ্রেমিক ছাত্র প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে

নেমেছিলেন—এমনকি কয়েকজন P. R. S. পরীক্ষার্থীও এই দলে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক বক্তৃতা শুনে অতি বড় বিরোধীও বশ্যতা স্বীকার করতেন। শিবনাথ এই যুবকদের যথাযথভাবে শিক্ষণ দেওয়ার জন্য দেহচর্চার সঙ্গে মানসিক উন্নতির কথাও ভাবতেন—যেমন রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। পরিণত বয়সেও তিনি ভেবেছিলেন যে, সাহিত্য রচনা ছাড়াও যুবকদের উপযুক্ত শিক্ষণ দান করে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সেবা করতে পারবেন। সে কারণে ২০.১২.১৯০১ তারিখের ডায়েরীতে লিখেছেন,—"আমি ভাবিয়া দেখিতেছি আমি এখনও দুই প্রকারে ব্রাহ্ম সমাজের সেবা করিতে পারি, প্রথম গ্রন্থরচনার দ্বারা, দ্বিতীয় যদি কতকগুলি Young men trained হইতে চায় তাহাদিগকে train করার বিষয়ে সাহায্য করা।"

ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্দলীয় কলহ একসময় চরমে উঠেছিল। আজ পর্যন্ত এই মনোমালিন্য সম্পূর্ণ দূর হয়নি। শিবনাথ একটি বিশিষ্ট সমাজের নেতা হয়েও এই কারণে গভীর মনোবেদনা অনুভব করতেন। সে কারণে পঞ্চান্ন বছর বয়সেও তিনি বিভিন্ন সমাজের মধ্যে একটা সমঝোতা আনার যে চেষ্টা করেছিলেন, তার প্রমাণও এই অন্তরঙ্গ দিনলিপিতে উপস্থিত। Koilwar থেকে তাঁর ৫৬তম জন্মদিনে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এইভাবে নির্ধারণ করেছেন—"...to act as a peace-maker between conflicting groups."

সবশেষে 'গুরুবন্দনা' শ্লোকরচনার দীর্ঘ ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করে' এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি ঘটাব। জীবনের উপান্তে এসে শিবনাথ সারাজীবনে কোন্ কোন্ ব্যক্তির মহৎ-সংস্পর্শে এসে জীবনকে নানাভাবে সফল করে তুলতে পেরেছেন সেকথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেন। তাঁর মনে হয়েছিল—এই সব মহৎ প্রাণ ব্যক্তিকে প্রতিদিন স্মরণ করলে তাঁদের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করা যাবে। সে কারণে তিনি তাঁদের নামমালা একটি দীর্ঘ বন্দনা শ্লোকে নিবদ্ধ করেছিলেন। শিবনাথ ছিলেন বিশ্বপ্রেমিক। সেজন্য এই তালিকা কেবল মাত্র বঙ্গদেশীয় অথবা ভারতবর্ষীয় মহৎগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বিদেশের বহু মহৎ ব্যক্তিও এতে স্থান পেয়েছেন। এঁদের কয়েকজনের নাম ও গুণাবলী এখানে উল্লেখ করছি—শিবনাথের ভাষায়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবার শিবনাথ হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যান। এখানে উপাসনার পূর্বে এক নির্জন উদ্যানে এই গুরুবন্দনার সূচনা হয়।

প্রথম চার পঙ্‌ক্তিতে দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু, শিবচন্দ্র দেব, দুর্গামোহন দাস এবং আনন্দমোহন বসুর নাম উল্লিখিত হয়েছে। আমরা পঙ্‌ক্তি চতুষ্টয় উদ্ধার করছি—

দেবেন্দ্র কেশবশ্চৈব বৃদ্ধো রামতনুস্তথা।
রাজনারায়ণঃ সাধুঃ শিবচন্দ্রস্তথৈবচ ॥
নবীনো বিনয়াধার দুর্গামোহন এবচ।
আনন্দমোহনো বন্ধু রষ্টোতে গুরুবে মম ॥

এঁরা ব্যতীত পিতামহ রামজয় ন্যায়ালঙ্কার, পিতা 'সত্যবাক্' হরানন্দ, জননী 'সুব্রতা ধর্মধারিণী' গোলোকমণি দেবী, 'দৃঢ়ব্রতঃ' মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, 'বিধবাবন্ধুঃ' 'কৃপানিধিঃ' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'শক্তিসিদ্ধো মাতৃভাব সমন্বিত' রামকৃষ্ণ পরমহংসের নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। বিদেশীগণের মধ্যে আছেন—'বিশ্বাসী বিনয়ী ভক্তো জর্জশ্চ মূলরাত্মজঃ', 'সত্যসন্ধিৎসুঃ' নিউম্যান, 'তত্ত্বদর্শী' জেমস্ মার্টিনো, 'প্রেমিকানন্দ' ফ্রান্সিস কব, 'সাধ্বী' সোফিয়া ডবসন কলেট'—ইহারা সকলে আমার গুরু, ইহাদের স্মরণ করিয়া আমি ধর্মসাধনে মহাশক্তি লাভ করি।' এটির দীর্ঘতম রূপ প্রদত্ত হয়েছিল ১.৩.১৯১৪ তারিখে।

আমরাও এই সব পূজ্য ব্যক্তিদের নাম স্মরণ ক'রে ডায়েরীর প্রসঙ্গ আপাততঃ শেষ করছি। কোথাও কোথাও ডায়েরীর মূল বক্তব্য রেখেছি, কোথাও বা প্রয়োজনীয় অংশমাত্র উদ্ধার করেছি। আরও বহু প্রসঙ্গ অনালোচিত থেকে গেল। তবে এইসব প্রসঙ্গগুলি দিয়ে আমরা শিবনাথের অন্তরঙ্গ জীবনের একটা লিপিচিত্র আঁকার চেষ্টা করেছি। এই প্রয়াস সার্থক হত যদি এই সঙ্গে সমগ্র অংশ প্রকাশ করতাম। এখানে শুধু ভূমিকাটুকু রচনা করা হলো।

CENTRAL LIBRARY

মৈনাক

আঁধারের ওপারে

॥ ১৫ ॥

যাকে বলে মেঘ না চাইতেই জল! জি. পি. ও-এর সামনে ছয় নম্বরের বাসটি দাঁড়াতেই জলস্রোতের মত অফিসযাত্রীরা নামতে লাগল। সামনের দরজা দিয়ে নামতেই তমালের সঙ্গে প্রায় মুখোমুখী হয়ে গেল। পিছনের দরজা দিয়ে নেমে ও এগোচ্ছিল। ও-ই প্রথমে কথা বলল, এই যে—দেখা হয়ে ভাল হল। কয়েক দিন ধরেই ভাবছিলাম একবার দেখা হওয়া দরকার।

ডালহাউসি স্কোয়ারে অফিসের সময়ের সেই ভীড়ের মধ্যে সীমার কানের মধ্যে যেন সেতারের তার ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। পুলকে থর থর দেহে অর্ধ সম্মোহিতের মত তমালের সঙ্গে অফিসের দিকে এগোতে লাগল সীমা।

এগোতে এগোতে তমাল বলল, কথা আছে তোমার সঙ্গে। কালকের সওদাগরী দপ্তর আর চটকলের শ্রমিক ধর্মঘটের ব্যাপার নিয়ে বিকেলে পার্টি অফিসে একটা মিটিং আছে। তারপর ধর সোয়া পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কোথায় দেখা করার সুবিধা হবে?

সীমা কি জবাব দেবে? ওর কোন অঙ্গ যেন আর ওর বশে নেই।

এক মুহূর্ত সীমার দিকে চেয়ে তমালই আবার যোগ করল, ঠিক আছে··· তুমি তোমার পছন্দসই জায়গা খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবনেই অপেক্ষা কোরো। আমারও কাছে হবে ওটা।

সীমা কোন মতে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

কিন্তু অফিসের সিঁড়ির মুখে পা দিতে না দিতেই সীমার পুলকাবেশ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। সিঁড়ির মুখে লিফটের দরজার সামনে মায়া দাঁড়িয়ে আছে। হিম শীতল দৃষ্টিতে ওদের দুই জনের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিম্ন অথচ সীমার শ্রুতিগোচর কণ্ঠে মায়া বলল, এক কান কাটারা রাস্তার এক পাশ দিয়ে যায়। কিন্তু দুকান কাটারা কোথা দিয়ে যায় বলত?

প্রশ্নটা মায়ার সঙ্গিনী কে হলেও উপলক্ষ্য যে কে তা বুঝতে সীমার দেরী হল না। ওর সর্বাবয়ব অপমান ও আঘাতের বেদনায় রি রি করে উঠল।

কোন মতে একটু ঘাড় তুলে চেয়ে দেখল লিফটের জন্য অপেক্ষা না করে তমাল সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে। তবে মায়ার কথা কি কানে যায় নি ওর? নিশ্চয় গেছে। লিফটের জন্য দণ্ডায়মান নর-নারীদের মধ্যে মায়ারা দুই জন আর ও ছাড়া আর কেউ ওদের অফিসের নয় এই রক্ষা। তবু অপমানে ওর চোখ ফেটে যেন জল বেরিয়ে আসতে চাইল।

ভাগ্যে লিফটটা তক্ষুনি এসে পড়ল এবং সীমার পালা আসার আগেই ভরে গেল। একই লিফটে এর পর মায়ার সঙ্গে ঘেসাঘেসি করে যেতে হলে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে হত ওকে। ভগবান বাঁচিয়েছেন।

স্বাভাবিক ভাবে কাজকর্মেও মন দিতে পারল না ও। মায়ার কথাগুলো সব সময় ঘুরে ফিরে ওকে বৃশ্চিকের মত দংশন করতে লাগল।

টিফিনের সময়ের কিছু আগে প্রায় দমকা হাওয়ার মতই বন্দনা ঢুকল ওর কেবিনে। আগে একটু আনুষ্ঠানিক অনুমতি নিত। এখন সে সবের ধার ধারে না। ফোনের রিসিভারটি তুলে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট নম্বর ডায়েল করল এবং তারপর নির্দিষ্ট একজন মানুষকে চাইল। আর মানুষটির কণ্ঠস্বর শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ওর স্বরেও বিলক্ষণ পার্থক্য সৃষ্টি হল।

না-না-কোন কথা শুনব না আমি। তোমাকে আসতেই হবে। যে কোন উপায়ে ম্যানেজ কর। মিনতির পর মুহূর্তেই কৈফিয়ৎ তলব করার ভঙ্গীতে বন্দনা বলতে লাগল, তোমাদের বড়বাবু আর অফিসার কেমন লোক গো? দেশকে ভালবাসে না—দেশসেবকদের শ্রদ্ধা ভক্তি করে না?

সীমা উৎকর্ণ না হয়ে পারল না। বন্দনার মুখে হঠাৎ দেশপ্রেমের কথা!

হ্যাঁ-হ্যাঁ-মহারাজ মানে ত্রৈলক্য মহারাজের মত এত বড় নেতা মারা গেলেন হঠাৎ দিল্লীতে আজ তবুও অফিস ছুটি হবে না? আমাদের অফিস তো এক বেলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ··

ও! এক বেলা ছুটির জন্য হঠাৎ দেশ সেবক ভক্ত হয়ে উঠল বন্দনা। অথচ যেটুকু শুনেছে বা পড়েছে তাতে সীমা জানে যে এই ত্রৈলক্য মহারাজ শুধু স্বাধীনতা যজ্ঞেরই অগ্রণী হোতা নন, পূর্ব পাকিস্তানে গণতন্ত্র ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করার মহাযজ্ঞেরও দধিচী স্বরূপ। কিন্তু বন্দনার মত একালের পশ্চিম বঙ্গের বহু বাঙালীদের কাছে তাঁর মূল্য কেবল এক বেলা ছুটির জন্য। তবে কেবল বন্দনাকে দোষ দিয়ে কি হবে? এমনি লঘু স্বভাব আরও লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত নর-নারীরও। সীমা আপন মনেই একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল। হঠাৎ গোখলের সেই বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে গেল সীমার—বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি।

বন্দনা এদিকে সমান ভাবে কলকল করে চলেছে, হ্যাঁ কোন মতে ম্যানেজ করে চলে এস তারপর সব কথা হবে। না—শুধু পুজোর ট্রিপ নিয়েই নয়। একটা বাসার খবর আছে। তুমি তো এত দিনেও জোগাড় করতে পারলে না। আমি একটা ছোট কিন্তু সুন্দর ফ্ল্যাটের খোঁজ পেয়েছি। তবে সেলামী লাগবে। কোথায় পাবে? বা রে, আমি কি করে বলব? পেতেই হবে কোন মতে। বল তো আমার পুঁজিপাটাও দিতে পারি। আর ভাল লাগে না গো সত্যি এমনি করে একা একা থাকতে। তোমার ভাল লাগে গো—বল? শেষের দিকে বন্দনার কণ্ঠ আবেগে অনুরাগে গাঢ় হয়ে উঠল।

আড় চোখে হঠাৎ সীমার দিকে চাইতেই বন্দনার কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে গেল। ওর স্বাভাবিক দুষ্টুমীর ভঙ্গীতে বলল, না—আর নয়। সীমা মুখপুড়িটা ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে। শেষকালে তোমাকেই না গিলে খায়। এস ঠিক সময়ে। আচ্ছা বাই-বাই। তারপর অধরোষ্ঠ কুঞ্চিত করে সেই অসভ্য শব্দটা। ফোনে ওর নাম উল্লেখ করাতেই সীমার মুখমণ্ডল লজ্জারুণ হয়ে উঠেছিল। শেষের ঐ মুদ্রায় একেবারে ঘাড় হেঁট করল।

বন্দনার লজ্জা-সরমের বালাই নেই। বেশ হাসি মুখেই এসে সীমাকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল। তারপর বলল, আহা—নূতন বউটি যেন! লজ্জা দেখে মরে যাই গো। তারপর হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, আর কয় দিন যাক। তারপর কৃতজ্ঞতায় পায়ের ধূলো নিবি।

ধেৎ···বয়ে গেছে আমার। সীমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

এই তো লজ্জাবতীর গলায় স্বর ফুটেছে। বন্দনা ফিক্ ফিক্ করে হাসতে হাসতে বলল, পরশুরামের সেই গল্পটার কথা মনে নেই—ধেৎ মানেই হ্যাঁ।

মর্ মুখপুড়ী। বন্দনাকে ঈষৎ ঠেলে দিয়ে কৃত্রিম বিরক্তিভরে সীমা বলল।

ভেড়ি গুড। আমার ট্রেনিং কাজ দিচ্ছে দেখছি। মুখপুড়ীটা যখন বলতে পেরেছিস শিগ্ গিরই এবার আমার মত ওগো, হ্যাগো বলতে পারবি। তবে সাবধান। বলতে বলতে বন্দনার কৌতুকে চপল চোখ দুটি যেন নৃত্য করে উঠল। সাবধান···সিঁথিতে সিঁদুর দেবার আগে যেন তার পরের সম্বোধন গুলো করতে না হয়। চতুর্দিকে যে লাল ত্রিভুজের ছড়াছড়ি তা দেখেও যেন সতর্ক হোস।

বন্দনা বেপরোয়া ভাবে হাসতে থাকে। আর লজ্জায় সীমার কণ্ঠ দিয়ে কোন কথাই ফোটে না।

পূর্ববৎ সহাস্য মুখে বন্দনা বলে, তা আমরা তো চললাম সিনেমা দেখতে

এলিটে। এ মার্কা একটা জবরদস্ত ইংরাজী প্রেমের ছবি এসেছে আসল এ মার্কা—এদেশী ভেজাল নয়। তা ছুটির পর তুই কি করবি? তমালবাবুকে কি এক্ষুনি পাবি? কালকের ধর্মঘটের ছুতো নিয়ে মায়া মুখপুড়ী বোধহয় এতক্ষণে তাঁর ঘাড়ে চাপার ব্যবস্থা করছে। তবে এ কয়দিনের আমার বিশেষ সংবাদ দাতাদের কাছ থেকে যে খবর পাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে বুনো মোষ এবার ক্ষেপেছে।

সীমা ভ্রুকুটি করে বন্দনার দিকে চাইল।

সীমার মনোভাব বুঝে বন্দনা বলতে লাগল, ও তুই তা আবার কোচবিহারী গবেট। ভেঙ্গে না বললে বুঝবিনা। বুনো মোষ মানে তোর হৃৎপিণ্ডেশ্বর··· মানে তমালবাবু। মায়ার ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাইকে আদৌ পরোয়া করছে না শুনছি। বলছে পার্টি আর ইউনিয়নের কর্মী আছ-আছ। কার সঙ্গে কথা বলব আর বলব না তা নিয়ে মাথা ঘামাতে এস না। একেবারে ঘাড় বাঁকিয়ে শিং উঁচিয়ে তেড়ে যাবার মত। এইবার একটু কায়দা করে গলা ধরে ঝুলে পড়। শিকে ছিঁড়ে যেতে পারে তোর ভাগ্যে।

এক বেলা ছুটি হয়ে গেলেও সীমা আর সবার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল না। বকেয়া কাজ সারার পরও এক রকম বিনা কাজেই নিজের চেয়ারে বসে সময় কাটাল অনেকক্ষণ। অবশেষে দারোয়ান করুণ মুখে "দিদিমণি" বলে সামনে দাঁড়াতে হুঁস হল। ওর জন্য বেচারী অফিস বন্ধ করতে পারছে না। ছি, ছি, কী অন্যায় হয়ে গেছে! সীমা তাড়াহুড়া করে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল।

এখনও ঘণ্টা দেড়েক সময় কাটাতে হবে। আপন মনে গুন্ গুন্ করে একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে খানিকক্ষণ পথে পথে ঘুরল সীমা। মেঘলা শ্রাবণের অপরাহ্ণ। রৌদ্রের পীড়া নেই। মায়ার ব্যঙ্গোক্তি শোনার পর মনে যে ক্ষোভ হয়েছিল তা আর নেই। বন্দনার সঙ্গে কথা বলে মনটা হাল্কা হয়েছে। এখন বরং আনন্দ বোধ হচ্ছে সীমার। বন্দনা কেবল দমকা হাওয়ার মত আসে না, আসে খুশীর হাওয়ায় পাল তুলে। ছোট্ট একটা রেস্ট্ রেণ্টে দুখানা টোস্ট আর এক কাপ চা নিয়ে আধ ঘণ্টা কাটাল। মনের আনন্দে রেস্ট্ রেণ্টের বাচ্চা ছেলেটাকে চার আনা বকশিষ দিয়ে দিল। তারপর খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবনে গিয়ে থেকে থেকে ঘড়ির দিকে তাকান।

কিছু না কিনলে কেমন যেন দেখায়। কি কিনবে কি কিনবে ভেবে হঠাৎ দুটো খদ্দরের রুমাল কিনে ফেলল—ছেলেদের রুমাল। তারপর আবার একটা সোফায় বসে অধীর ভাবে শুধু ঘড়ি দেখা।

এই যে—অনেকক্ষণ বসে আছ বোধহয়।

সীমার দেহের সব রক্ত বুঝি মুখমণ্ডলে এসে জড় হয়েছে। বুকের ভিতর প্রবল উচ্ছ্বাস। একা-একেবারে একা। তমালের সঙ্গে একা শুধু ও। এতক্ষণ অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করা ও তমালের আসার সম্বন্ধে যখন প্রায় হতাশ হয়ে বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে তখন তার বাঞ্ছিতকে সামনে দেখে ওর সমগ্র সত্তা যেন আনন্দে নৃত্য করে উঠল।

নাও চলো, এসপ্ল্যানেডে বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে যেতে যেতে কথা হবে।

পুলকিত অন্তরে হাতব্যাগটি তুলে নিয়ে সীমা তমালের অনুগামিণী হল।

গণেশ এভিনিউ পার হয়ে আবার চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এর ফুটপাথে উঠেই কিন্তু বাধা পেল ওরা। ছোট্ট একটি জন সমাবেশ। ফুটপাথের উপর ছোট একটি টেবিলের উপর এক তাড়া কাগজ নিয়ে কয়েক জন দাঁড়িয়ে আছেন। আর কয়েকজন কয়েক দলে বিভক্ত হয়ে পথচারীদের হাতে ধরা কাগজগুলিতে সই করার অনুরোধ জানাচ্ছেন।

ওদের দুজনের সামনেও এক ভদ্রলোক এলেন। এই সামনের বাড়ীতে একটি সওদাগরী অফিসের কর্তৃপক্ষ কম্পিউটার এনে জনা বার চোদ্দ কেরাণীকে ছাঁটাই করার পরিকল্পনা করেছেন। উৎপাদনের খরচ কমান ও কার্যদক্ষতা বাড়ানর নামে মানুষকে বেকার করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে গণ স্বাক্ষর সংগ্রহের এই অভিযান।

খুব বেশী বলতে হল না তমালকে। কাগজ হাতে অনুরোধকারী ভদ্রলোকদের তমাল সহৃদয় কণ্ঠে বলল, জানি-জানি, আপনাদের আন্দোলনের কথা জানি। আমাদের পার্টির পূর্ণ সমর্থন আছে এ আন্দোলনে। কলম খুলতে খুলতে তমাল বলল, দিন।

সীমা হঠাৎ এক অভাবনীয় কাণ্ড করে বসল। ফস্ করে তমালের হাতের কলমটি কেড়ে নিয়ে বলল, না—আগে আমি সই করব।

সীমার দুষ্টুমী মাখা হাসি দেখে তমালও ফিক্ করে হেসে বলল, তাই কর—তুমিই প্রথম হও এই নোবল মিশনে।

কাগজ হাতে ভদ্রলোকও কি ভাবলেন কে জানে? হাসি তাঁর মুখমণ্ডলেও সংক্রামিত হল। তিনি কাগজ সামনে ধরতে ধরতে সহাস্য বচনে বললেন, হ্যাঁ—আমারই ভুল হয়েছে। লেডিজ ফার্স্ট।

কয়েক পা এগোনর পর তমাল প্রশ্ন করল, এবার—বল এর মানে?

সীমা মৌনভাবে কয়েক পা চলল। ওর বদনে লজ্জা। নিজের আচরণের

অভাবনীয়তার জের এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি ও। তারপর কণ্ঠে অনাবশ্যক জোর দিয়ে বলল, মানুষকে বেকার করার যন্ত্রের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তাকে সমর্থন জানাবার অধিকার আমার বেশী।

কেন? তমালের চোখ মুখে অকৃত্রিম বিস্ময়। আমাদের পার্টিই বা এর সমর্থক কিসে কম? ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স আর সব দপ্তরে কমপিউটারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে আমাদের পার্টিই তো অগ্রণী।

হয়ত। কিন্তু আপনাদের দরদটা কেবল-কেবল-মানে নীতুরা যাকে "বাবু শ্রমিক" বা মধ্যবিত্ত কর্মচারী বলে তাদের জন্য। তাঁদের বাইরে যে বৃহত্তর শ্রমিক-সমাজ রয়েছে তার কথা আপনারা ভাবেন না।

নকশালীদের মত এরকম ক্যারেক্টার অ্যাসাসিনেশান তোমার কাছে আশা করি নি। অনেক কষ্টে উত্তেজনাকে সংযত করে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তমাল বলল।

কিছু মনে করবেন না। দরিদ্রতম শ্রমিকদের বাঁচাবার জন্য তাদের বেকার করার যন্ত্রের বিরোধী হলে আপনি এবং আপনাদের পার্টির আর সবাই খদ্দর পরতেন যাতে লক্ষ লক্ষ কাটুনী আর তাঁতীর জীবিকার সংস্থান হতে পারে। উত্তেজনায় সীমার স্বর থর থর করে কাঁপতে লাগল।

তমাল এবার হেসে উঠল। প্রাণখোলা উদার হাসি। অনেক কূট তর্ক. বহু ভুল বোঝাবুঝির সমাধান হয়ে যায় হাসিতে। অপরের মনের ভিতর প্রবেশ করার রাজপথ হল হাসি। হাসতে হাসতেই তমাল বলল, ও বুঝেছি-সেদিন যে খদ্দরকে ঠাট্টা করেছিলাম তার জবাব দিলে আজ। তা তোমার যুক্তিতে তথ্য আছে মানতে হবে। অবশ্য আমাদের মধ্যে কেউ কেউ…মানে পুরোনোদের মধ্যে কেউ কেউ খদ্দর পরেন। আমার কমিউনিজমের গুরু নরেনদাও পরতেন। তুমি যেমন ধরেছ দেখছি আমাকেও খদ্দর ব্যবহার করার কথা ভাবতে হবে। তবে এখনই হঠাৎ পরলে অন্য কমরেডরা ভাববে কংগ্রেসী হয়ে গেছি রাতারাতি। হা-হা-হা। তমাল টেনে টেনে হাসতে থাকে।

হাসি সীমার মুখমণ্ডলেও সংক্রামিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সাহসও আসে মনে। চলতে চলতে সীমা ব্যাগ খোলে। তারপর রুমালের ছোট্ট প্যাকেটটি বার করে কম্পিত হস্তে তমালের দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বলে, তাহলে এই রুমাল দুটি দিয়েই শুরু করুন। আপনার জন্যই আজ…। কত চেষ্টাতেও সীমা কণ্ঠস্বরকে স্বাভাবিক করতে পারে না। প্রসারিত হাতের মতই স্বর কাঁপতে থাকে। কথাটা শেষও করতে পারে না।

বারে! তুমি কেন আমার জন্য মিছিমিছি…এমনিতেই তোমার কাছে

অপরাধী হয়ে আছি। মুখে বলে বটে তমাল। তবে রুমালের প্যাকেটটাও সীমার কম্পিত হাত থেকে গ্রহণ করে এবং হাসি মুখে বলে, ধন্যবাদ। তারপর মোড়কটি খুলে রুমাল দুটি দেখে পকেটে রাখতে রাখতে বলে, সুন্দর জিনিস। আবার ধন্যবাদ।

সীমার দেহে-মনে যেন সেতার ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে।

কিন্তু···আমাকে এত করে খদ্দরের কথা বলছ অথচ তুমি তো খদ্দর পর না। তমাল পূর্বের মত হাসি মুখে বলে।

ঠিকই বলেছে তো তমাল, সীমার মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা হয় এই ভেবে যে ছোট পিসির যুক্তি নিয়ে তর্কের খাতিরেই যেন এত দিন তর্ক করেছে। নিজের জীবনে সেই অনুসারে আচরণ করে নি। বেশ কিছুক্ষণ মনে মনে বাদ প্রতিবাদ করে নিজের ত্রুটী বোঝার পর অবশেষে সত্যি কথা স্বীকার করতে মনস্থ করে ও। মাঝে মাঝে পরি, বেশ বিড়ম্বিত কণ্ঠে সীমা জবাব দেয়। অপাঙ্গে তমালের দিকে চেয়ে দেখে সে মুখে বিদ্রূপ বা শ্লেষ নেই। আছে নির্মল কৌতুকের হাসি। তারপর তাড়াতাড়ি যোগ করে, এবার থেকে নিয়মিত পরব—কথা দিলাম।

আরে-আরে···আমি কি সেই কথা বলেছি। তমাল হাঁ হাঁ করে ওঠে। আমাকে কথা দেবার কি আছে? আমি কি কংগ্রেসীদের মত খদ্দরের অভিভাবক নাকি?

শান্ত মৃদু কণ্ঠে সীমা বলে, হলেনই বা অভিভাবক। এতো কোন দলের এক চেটিয়া ব্যাপার নয়।

বিব্রত ভাবে তমাল বলে, মহা মুস্কিল তো তোমাকে নিয়ে। বড্ড সিরিয়াস তুমি···

ওরা এসপ্ল্যানেডে পৌঁছে গেছে। এদিক ওদিক চেয়ে তমাল বলে, কোথাও বসতে পারলে হত। কিন্তু এখানে যা ভীড়।

সীমা আস্তে আস্তে বলে, ট্রামের গুমটি ছাড়িয়ে রাজভবনের দিকে গেলে হয়ত ভাল বসার জায়গা পাওয়া যেত।

কিন্তু সেখানেও আজ ফাঁকা জায়গা নেই। হয় কাদা আর যেটুকু শুকনো সেখানে ভোজপুরী গানের দল, নল লাগান পিতলের কলসী ঘিরে চা পিপাসুর দল, অথবা জড়িবুটিওয়ালা। আজ বৃষ্টি নেই বলে ওদের কাজ কারবার জম-জমাট।

পশ্চিম দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ কি ভেবে নিয়ে তমাল বলল, তোমার তো

কাল অফিসের তাড়া নেই—সওদাগরী দপ্তরে ধর্মঘট কাল। আমাকে অবশ্য আসতে হবে মার্কেণ্টাইল ওয়াকার্স ফেডারেশনের হয়ে দপ্তরে দপ্তরে ঘুরে দেখতে হবে যাতে ধর্মঘট সফল হয়। কোথাও কোথাও পিকেটিংও দরকার হবে। তা ছাড়া বিকেলে পাটকল মজুরদের শোভাযাত্রা আছে। তা যাক সে কথা—তোমার যখন তাড়া নেই সেদিনকার মত ইডেন-গার্ডেনে অথবা আর একটু এগিয়ে বাবু ঘাটের পাশে গঙ্গার ধারে বসা যায়···অবশ্য তোমার যদি অসুবিধা না থাকে—মানে ওখানে নিরিবিলি আর বসারও বেশ ব্যবস্থা।

সীমার ভিতর আনন্দ-লহরী টলমল করছে। ওর সমগ্র সত্তা যেন সেই আনন্দধারায় অবগাহন করছে। কিন্তু পাছে এই প্রবল আনন্দে ও ফেটে পড়ে তাই নিজেকে সংযত করে সংক্ষেপে ও বলল, চলুন···গঙ্গার ঘাটেই।

সত্য সত্যই সুন্দর বসার জায়গা। এই ধোঁয়া, ধুলো, আবর্জনা আর কলকোলাহলে সর্বদা কল্লোলিনী কলকাতার মধ্যে লুকানো অবস্থায় যে এই রকম দুই চারটি সৌন্দর্য-নিকেতন আছে, তা যেন বিশ্বাসই হয় না। আকাশে শুক্লা সপ্তমীর পাণ্ডুর চন্দ্রমা—মাঝে মাঝে জলদজাল এসে তাকেও ঢেকে দিচ্ছে। আলো আঁধারী মেশা একটা রহস্য-কুহেলী ছেয়ে আছে যেন সমগ্র বিশ্ব জুড়ে। সামনে গঙ্গার জলে ধাবমান নৌকা অথবা এখানে ওখানে নোঙর করা জাহাজগুলিও যেন বাস্তব জগতের নয়। দূরের ওপারের উচ্চচূড় বাড়ী-ঘর অথবা কলকারখানার চিমনির ধূসর পটভূমিকার প্রেক্ষাপটে সামনের নৌকার পাল আর জাহাজের মাস্তুল যেন কোন ছায়া ছবি অথবা কল্পলোকের অবভাস। মাঝে মাঝে কোন ষ্টীমারের গম্ভীর বাঁশি বেজে উঠলেও তা যেন মেঘলোকের কোন্ ঈশানের বিষাণ বলে মনে হয়।

এখানে সব বচনের সমাপ্তি। অনির্বচনীয় এই পরিবেশ শুধু মৌন বিস্ময়ে মুগ্ধ চিত্তে উপভোগ করার মত।

সীমার মনের আনন্দের পাত্র শুধু পূর্ণ নয়, পরিপূর্ণ হয়ে উপচে পড়ছে। কখন যে ও আত্মবিস্মৃত ভাবে গুন্ গুন্ করে একটি গানের সুর ভাঁজা আরম্ভ করেছিল ওর মনে নেই। খেয়াল হল তমালের কথায়।

অত আস্তে কেন, আর একটু জোরেই গাও না। বেশ লাগছে। ওর কণ্ঠে অকৃত্রিম আন্তরিকতা।

সীমাকে দ্বিতীয় বার অনুরোধ করতে হল না। ওর দেহ-মনে যে আনন্দের প্লাবন বয়ে যাচ্ছিল তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অভিভূতের মত ও গান ধরল :

জগৎ জুড়ে উদার সুরে
আনন্দগান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে
বাজিবে হিয়ামাঝে।
বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয়সভা জুড়িয়া তারা
বসিবে নানা সাজে।

সীমার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের গতি যেন স্তব্ধ। গানের অর্থ পূর্ণ মাত্রায় উপলব্ধি না করলেও ভাষা ও সুরে আত্মনিবেদনের যে আর্তি ছিল, তা ওর কণ্ঠে বাঙ্ময় হয়ে উঠে শ্রাবণের এই ভারি আকাশ, তারও উর্দ্ধে ম্লান চাঁদ, তার জ্যোতির্বলয় ছাড়িয়ে আরও দূরের দুটি চারটি নক্ষত্র এবং তারও দূরের কোন্ সুদূরলোকের দিকে যেন মানসযাত্রা করেছিল। নিজেকে উজাড় করে দিয়ে এমন আত্মবিস্মৃত ভাবে বহু দিন ও গান গায় নি।

প্রথম চরণ বার দুয়েক ঘুরে ফিরে গাওয়ার পর অবশেষে এক সময়ে গান শেষ হল। গান থামিয়ে অভিভূত হৃদয়ে সীমা বসে রইল। ও নিজেও যেন বাস্তব পৃথিবীর নয়, মহৎ চিত্রকরের যে অপরূপ চিত্রকলার নিদর্শন নয়নের সামনে আদিগন্ত প্রসারিত, চিত্রার্পিত সীমাও যেন তারই অঙ্গ।

ওর আচ্ছন্ন ভাব কাটল তমালের কথায়। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে তমাল বলল, কী যে তোমাদের মিষ্টিক মেটাফিজিক্স! কোন সংঘর্ষ সংগ্রাম চোখে পড়ল না রবীন্দ্রনাথের—শুধু আনন্দগান বাজে! এই জন্যই তো···। বাকীটা ওর ক্ষুব্ধ কণ্ঠ ব্যক্ত করল।

তমালের মনোভাব সীমা বুঝতে পারল। কিন্তু এমন মনোরম মুহূর্তে কোন কূট তর্কে জড়িয়ে পরতে ইচ্ছা হল না ওর। তাই মৃদু হেসে হাল্কা কণ্ঠে বলল, যে যেমন দেখে। এটা দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার।

দৃষ্টিভঙ্গী—হুঁঃ। তমাল আদৌ প্রভাবিত হয়না সীমার কথায়। অবজেক্টিভ রিয়েলিটি এড়ানর এসব এসকেপিস্ট মনোভাব।

সীমা খুক্ খুক্ করে হেসে ওঠে। কোন জবাব দেয় না।

বিরক্তির জের টেনে তমাল বলে, ঠাট্টা করে এড়াতে চেওনা। এই···এই তোমার কথাই ধর না—মানে যেকথা বলব ভেবে আজ দেখা করার কথা বলেছিলাম। বলতে বলতে কয়েক লহমা চুপ করে থেকে তমাল কি ভাবে

CENTRAL LIBRARY

কথাটা বলবে মনে মনে বোধহয় তারই মহলা দিয়ে নেয়। তারপর বলে, সেদিন মাদ্রাজী হোটেলে দেখা হবার পর মায়া কি হৈ চৈ বাধিয়েছে তা নিশ্চয় জান। আজই লিফটের মুখে কেমন ঠেস দিয়ে কথা বলছিল তার নমুনাও তো একটু শুনেছি। মানে আমি দুঃখিত যে আমার জন্য তোমাকে এমন কথা শুনতে হচ্ছে। আই অ্যাম রিয়েলি সরি ফর দিস স্ক্যানড্যাল মঙ্গারিং অফ কমরেড মায়া। তবে হ্যাঁ—আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছি যে এসব কাদাছোঁড়াছুঁড়ি···মানে ক্যারেক্টার অ্যাসাসিনেশান আমার ভাল লাগে না···অর্থাৎ আমি বরদাস্ত করব না। চাপ দিয়ে ভয় দেখিয়ে আমাকে কেউ নোয়াতে পারবে না। বলতে বলতে সম্ভবতঃ উত্তেজনাতে ওর কণ্ঠ রুদ্ধ হল।

কয়েক মিনিট নীরব থেকে দু বার গলা ঝেড়ে নেবার পর তমাল আবার বলতে লাগল যাই হোক আমি এই ভাবে তোমার অসম্মানের কারণ হয়েছি বলে সত্য সত্যই দুঃখিত। তবে···

ওকে বাধা দিয়ে মৃদু কণ্ঠে সীমা বলল, আপনার কী দোষ···আমিই বরং ভাবছিলাম যে আমার জন্য আপনাকে বিব্রত অপমানিত হতে হচ্ছে বলে আপনার কাছে ক্ষমা চাইব। তবে—তবে এতে আমি আহত হইনি।

আহত হও নি—মাই গড! তমাল অকৃত্রিম বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল, বলছ কি? আমি ভাবছিলাম বলব যে তোমার জগৎ জুড়ে আনন্দ গান বাজার গানের সঙ্গে এই আঘাত...মানে এই জাতীয় নানা রকমের আঘাত...দ্বন্দ্ব ·· সংঘাতের সঙ্গতি কোথায়?

পূর্ব্ববৎ মৃদু কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে সীমা বলল, একেবারে আহত হইনি বলাটা অবশ্য ঠিক হল না। সেটা বলতে পারেন রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর মত মহাপুরুষেরা। সাময়িক ভাবে আহত হয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু তারপর জগতের এই আনন্দ-গানে সেই আঘাতের বেদনা মুছে গেছে। এখন আর সত্যি সত্যিই কোন ক্ষোভ নেই।

স্ট্রেঞ্জ! বিমূঢ়ের মত কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে তমাল বলল, কিন্তু... কিন্তু কি ভাবে এটা সম্ভব হয় বলতে পার? আমি তো আঘাত পেলে ভুলতে পারি না। আমার তো মনে হয় আঘাত পেলে প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত ছটফট্ করা সব মানুষেরই স্বভাব কিন্তু তুমি যা বলছ তা তো স্ট্রেঞ্জ—অ্যাবসলিউটলি স্ট্রেঞ্জ! যথার্থ জিজ্ঞাসুর মত একান্ত আন্তরিকতা মাখা কণ্ঠে তমাল উচ্চারণ করল।

সীমা কয়েক লহমা চুপ করে রইল। তারপর অনেকটা স্বগতোক্তির মত

CENTRAL LIBRARY

বলতে লাগল, ঠিক গুছিয়ে বলতে পারব না হয়ত···মানে গানের শেষের দিকটা হয়ত তেমন খেয়াল করেন নি···রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—রয়েছ তুমি, একথা কবে। জীবন মাঝে সহজ হবে। মানে এই তুমি···তাঁর ওপর ভরসা রাখতে পারলে মনের অনেক অধীরতা শান্ত হয়। মনে হয় তাঁর এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমরা কত ক্ষুদ্র, তুচ্ছ...আমাদের আনন্দ, দুঃখ তাও কত অকিঞ্চিৎকর। খুব সহজ অবশ্য নয় ব্যাপারটা···তবে চেষ্টায় ধীরে ধীরে···

অল হামবাগ...আবার সেই ভগবানের কথা, তিনি যদি স্রষ্টা হন তবে তাঁর সৃষ্টি ত্রুটিপূর্ণ, আর যদি সর্বশক্তিমান হন তবে এই পৃথিবীর সব অপূর্ণতার দায়ত্ব তাঁর। এ যুগে বিজ্ঞান তাঁর মিথকে একসপ্লোড করে ভগবানকে বাস্তুচ্যুত করায় তিনি এখন আশ্রয় নিয়েছেন সাবজেক্টিভ মনের মেটাফিজিক্সে। প্রায় বিদীর্ণ হবার মতই তমাল ঘোষণা করে।

শীতল কিন্তু ইস্পাতকাঠিন্যে ভরা স্বরে সীমা বলল, সৌর জগৎ বা শত শত সৌর জগতের সমবায়ে গঠিত এই ব্রহ্মাণ্ডের কথা থাক—এই ছোট্ট গ্রহ পৃথিবী সম্বন্ধে বিজ্ঞান কতটুকু জেনেছে ? পৃথিবীর তুলনায় একেবারে ক্ষুদ্র পরমাণুর সব রহস্যই কি বিজ্ঞান এখনও আয়ত্ত করতে পেরেছে ; মানব-সভ্যতার সেই উষালগ্ন থেকে আরম্ভ করে বহুবার তো ঈশ্বরের শ্মশানযাত্রার ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু তবু কি ঈশ্বরকে মুছে ফেলা সম্ভব হল মানুষের মন থেকে—জগৎ-কারণ থেকে ?

তমাল কোন কথা বলল না।

একটুক্ষণ থেমে সীমা বলতে লাগল, এ যুগের এক মহাবিখ্যাত বিজ্ঞানীর লেখায় পড়েছি—বিজ্ঞান ও ধর্মে বিরোধ নেই। বিজ্ঞান দেয় চলার গতি কিন্তু ধর্ম করে সেই গতির দিক নির্দেশ। এদের পরস্পরের বিরোধী ভাবার কারণ নেই। আর তা ছাড়া ধর্মকে, ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে কোন তত্ত্ব অন্ততঃ আমাদের দেশ এই ভারতবর্ষে চলবে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

এগুলো তোমাদের ভারতীয় শভিনিজম। তমাল এতক্ষণে মুখ খোলে। তারপর বলে, আচ্ছা—ঐ তো একজন অন্ধ ভিখারী আসছে এদিকে। কি পেয়েছে বলতো তোমার সেই ঈশ্বরের কাছ থেকে ও ? ও কেন ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থাকবে···আর সব সর্বহারাদের মত ও কেন···

তমালকে বিদ্রূপ করার জন্যই যেন ছোট ছেলেটির কাঁধ ধরে কম্পিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে আসতে ভিখারীটি উচ্চারণ করতে লাগল—ইয়া আল্লা, কর সভী কা ভলা ! ইয়া আল্লা···

সীমা ওর ব্যাগ খুলে একটি মুদ্রা ভিখারীটির হাতে দিতেই সেলামের ভঙ্গীতে হাত তুলে ও বলল, খোদা মেহেরবান। মালিক বানায়ে রখ্‌খে।

ছোট ছেলেটি তমালের সামনে দাঁড়াল। অন্ধ ভিখারীটি ওর দিকে হাত বাড়িয়ে আছে।

কি যেন হল তমালের। অনাবশ্যক রূঢ় কণ্ঠে তাকে বলল, যাও-যাও। চলা যাও হিঁয়াসে।

ইয়া আল্লা কর সভী কা ভলা। যো দিয়া উসকা ভি ভলা। যো ন দিয়া উসকা ভি ভলা। ইয়া আল্লা···

ভিখারীটি দূরে চলে যেতে তমালের থমথমে মুখের দিকে অপাঙ্গে চেয়ে সীমা বলল, ভগবানের উপর রাগ ওর উপর দেখিয়ে কি লাভ? এটা ভারতের সংস্কৃতি—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—যে ধর্মের বিশ্বাসীই হোক না কেন। যে দিয়েছে তার মঙ্গল হোক···যে না দিয়েছে তারও।

গশ্‌! তিক্ত কণ্ঠে তমাল বলল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে এক রাশ ধূম উদ্গীরণ করে যোগ করল, ভিক্ষা দেওয়া একটা সোশাল অফেন্স। আইডলারের সংখ্যা বাড়ে এতে···

ছোট শিশুকে প্রবোধ দেবার ভঙ্গীতে হাসি মুখে সীমা বলল. তা রাষ্ট্র বা সমাজ যত দিন এদের দায়িত্ব না নিচ্ছে ততদিন যার যতটুকু সাধ্য এদের না দেখলে চলবে কেন? বিশেষ করে অন্ধ খোঁড়া—এরা বাঁচবে কি করে?

ছোট ছেলের মতই অবুঝ ভাবে তমাল তবু বলল, যত্ত সব প্যারাসাইট···

হঠাৎ বৃষ্টি নামল ঝির ঝির করে।

তর্ক থামিয়ে দুই জনেই এদিকে ওদিকে চাইতে লাগল একটা আশ্রয়ের জন্য। সীমার লেডিজ ছাতার নীচে দুই জনই ভিজছিল। একটু দূরে বাবুঘাটের ছাদটি নজরে পড়াতে দুই জনেই দ্রুত পায়ে সেই দিকে চলল।

বাব্বাঃ, বলে ছাতা মুড়ে ছাদের নীচে দাঁড়াতেই দুই জনের নজরে পড়ল। বাণীদি। সাজগোজ সেই রকম অত্যাধুনিক—যেমন সর্বদা দেখা যায়। কিন্তু বাণীদিকে দেখে ওরা লজ্জিত হবে কি, তাঁর মুখেই কেমন একটা অপ্রতিভ ফ্যাকাশে ভাব। ওদের দেখে এক ফালি হাসলেও সে হাসিতে আনন্দের চেয়ে কান্নাই যেন বেশী।

আশ্চর্য, বাণীদি এখানে এবং একা একা!

বাসে ছেলেদের জোড়া সিটে পাশাপাশি ঘেসাঘেসি করে সেই কথাই বোধহয় ভাবছিল দুই জনে। দীর্ঘ পথ হলেও তাই কথাবার্তা হল না বিশেষ।

বাণীদির ব্যাপারটা মনে একটা খটকা সৃষ্টি করলেও এই মৌন যাত্রাও সীমার মনে আনন্দের কারণ হচ্ছিল। এই এত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য—বাসে ঝাঁকুনীর জন্য থেকে থেকে দুই জনের গায়ে গায়ে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাচ্ছে! কী মধুর. কী মধুর এই বিশ্ব।

কিন্তু আজকের পশ্চিমবঙ্গে মাধুর্য কোথায়? শুধু সংগ্রাম আর সংঘাত। তালতলায় পুলিশ ও নকশালপন্থীদের সংঘর্ষে একজন নিহত। ব্যাণ্ডেলে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ধর্মঘট। দুর্গাপুরেও ধর্মঘট চলছে। স্বাধীনতা দিবসে নানা জায়গায় জাতীয় পতাকার উপর হামলা। কোথাও কোথাও জনতার প্রতিরোধ। চাঁৎপুর মদনমোহনতলায় সি. পি. এম—নকশাল সশস্ত্র সংঘর্ষ। কুমারটুলিতেও একই ব্যাপার। পুলিশের হেফাজতে যুবকের মৃত্যু। প্রতিবাদে উত্তর কলকাতায় সংঘর্ষ, গুলি, বাসে আগুন। এর মধ্যে জোর খবর—বহু সঙ্গী-সাথী সহ কানু সান্যাল গ্রেপ্তার। সবার কাছে যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র থাকা সত্ত্বেও "বন্দুকের নলই শক্তির উৎস" নীতিতে বিশ্বাসী বন্দুক হাতে কানু সান্যাল গ্রেপ্তার এড়াতে পারলেন না!

নকশাল বাড়ীর কথা থাক, কলকাতাও জ্বলছে। উত্তর ও মধ্য কলকাতায় হাঙ্গামা অব্যাহত। পুলিশের গুলিতে দুই জন এবং বিক্ষোভকারীদের বোমায় আরও দুই জন নিহত। তিনটি বাস ও একটি ট্রাম গাড়ী পুড়ে ছাই। রাজ্যের করদাতাদের পাঁচ লক্ষ টাকা খেসারৎ দিতে হবে এক দিনে। একুশে আগস্ট আরও দুটি বাস ও দুটি ট্রামে আগুন। বাস, ট্রাম বন্ধ। বিদ্যাসাগর কলেজের হোস্টেল থেকে বোমা, গ্রেনেড ও বোমার বহু মশলা উদ্ধার। চুরাশি জন ছাত্র আটক। তিন দিন পরে পুলিশ কর্তৃক আর এক জায়গা থেকে চুয়াল্লিশ হাজার বোমা তৈরী করার মশলা উদ্ধার। শহরে গুলি, বোমা ও তিনটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা। এর মধ্যে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের একটানা তিন দিন ধর্মঘট। সি. পি. এম ও নকশাল সংঘর্ষে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বন্ধ। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের রাজভবনে অবস্থান ধর্মঘট। স্টেট বাস বন্ধ। বৃহত্তর কলকাতায় একশ চুয়াল্লিশ ধারা জারি।

মফস্বল বাংলাও অশান্ত। মালদহে শিক্ষকদের কর্মবিরতি। পরিণামে হাঙ্গামা, কারফু, পুলিশের গুলিতে একজন মহিলার মৃত্যু। কৃষ্ণনগরে পুলিশের সাব ইনসপেক্টরকে হত্যা করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহরের জনসাধারণের উপর পুলিশের তাণ্ডব। পুলিশের সেই প্রায় বিদ্রোহের অবস্থা দমন করতে সৈন্য বাহিনীকে তলব করতে হল। নাকতলায় সীমাদের পাড়ার কাছেই

পুলিশ পিকেটের উপর হামলার জন্য সারা এলাকার নিরীহ জনসাধারণের উপর পুলিশ আর সি. আর. পি-এর অত্যাচার। বাড়ী বাড়ী ঢুকে হামলা। প্রহৃত একজন ভদ্রলোক মৃত। নাকতলার হাঙ্গামার আঁচ সীমাদের নেতাজী নগরেও লাগল। বেশ কয়েক দিন যাঁরা পারল বাড়ীর বার হল না। যাঁদের উপায় নেই উদ্যত বন্দুক টহলদার সি. আর পি. অথবা সশস্ত্র পুলিশের ভ্যানের পাশ দিয়ে পা টিপে টিপে দুরু দুরু বক্ষে যাতায়াত করতে হল। পুলিশ যেন ক্ষেপে গেছে। তিন মাসে উনসত্তরটির পুলিশ ফাঁড়ির উপর হামলা।

এর মধ্যে তমালদের পার্টির উদ্যোগে শহীদ দিবস পালন করতে গিয়ে আবার হাঙ্গামা। বামপন্থীদের অন্য গোষ্ঠী—আট পার্টির জোট বলছে, বোমা মেরে শহীদ দিবস পালন করা যায় না। শহীদ দিবস পালনের পরিণাম হাতিবাগান, বাগবাজার, কসবা আরও নানা জায়গায় হাঙ্গামা। পুলিশের গুলিতের ছয় জনের মৃত্যু। যানবাহন বন্ধ করে দিয়েছে আন্দোলনকারীরা। নানা জায়গায় বন্ধ। দুর্গাপুরেও হাঙ্গামা।

এর মধ্যে বেশ কয়দিন সীমা অফিসে যেতে পারে নি এইসব গোলযোগের জন্য। আরও কয়েক দিন অফিসে পৌছান বা বাড়ী ফেরার সময়ের স্থিরতা ছিল না। সেপ্টেম্বরের পয়লা। মাইনে নেবার জন্য না গেলেই নয়। কিন্তু অফিসের কাজকর্মের আবহাওয়া আদৌ নেই—খুব ফাঁকা ফাঁকা। চারদিকের অবস্থা দেখে এ কয়দিন সীমার মনে শান্তি ছিল না। তমালের পার্টির এই শহীদ দিবস পালন করা নিয়ে সেও নিশ্চয় খুব মেতেছে। এই বোমা, গুলি আর হাঙ্গামার মধ্যে তমাল যেন ভাল থাকে—মনে মনে কতবার ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে সীমা। তাই খুব ইচ্ছা হচ্ছে একবার ওর সঙ্গে দেখা করে। বলে, যেন এইসব হাঙ্গামার মধ্যে না থাকে। কিন্তু তার দেখা পাওয়া যায় কি করে? অনেক দ্বিধার পর লজ্জার মাথা খেয়ে এক সময় বন্দনাকে মনের কথাটা বলেই ফেলল সীমা। বন্দনা বলল, তাকে কি পাব আজ—দেখি! আমাকেও আবার তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে—বাস-ট্রামের যা অবস্থা।

তবে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হল না। শুকনো মুখে ফিরে এসে বন্দনা জানাল, মাইনে নিয়েই তমালবাবু চলে গেছেন। মায়া সহ ওদের পার্টির আর যে কয়টি চাঁই আছে এ অফিসে সবাই। ওদের কর্মী সন্তরায় মারা গেছে-এই হাঙ্গামায়। তার মৃতদেহ নিয়ে মহম্মদ আলী পার্ক থেকে শোভাযাত্রা হবে সেই ব্যাপারে। এছাড়া ছাত্রধর্মঘটও চলছে ওদের। খবর শুনে সীমার

প্রতিক্রিয়ার লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে বন্দনা আবার বলল, ঘাবড়াসনা। দুই চার দিনে অবস্থা শান্ত হলে বাবুর টিকি দেখতে পাবি। এ কয়টা দিন একটু ধৈর্য ধরে থাক ভাই।

সীমার চোখ ফেটে প্রায় জল আসার উপক্রম হয়েছিল। পার্টি আর তার কাজ ছাড়া আর কোন কিছুর প্রতিই কোন কর্তব্য নেই যেন। এ কয়দিন যে কী উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটিয়েছে তার যেন কোন মূল্য নেই। একবার দেখা করে সীমার কুশল সংবাদও কি নিতে পারত না,—বিশেষ ওদের পাড়ায়ও যখন হাঙ্গামা চলছে বলে সবাই জানে? নিজের খবর দেওয়া না হয় দূরেই থাক।

কিন্তু কার উপর অভিমান?

বন্দনা চলে গেছে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে বলে। কাজকর্মের আবহাওয়া নেই দপ্তরে। হাঙ্গামার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে মিস্টার মালহোত্রাও অনুপস্থিত। ঘণ্টা দুই তিন কাগজপত্র নাড়া চাড়ার পর অবশেষে সীমা উঠল। বাড়ী ফেরার চেষ্টা করতে হয় এবার।

লিফটের জন্য দাঁড়িয়ে আছে, ধীর পদক্ষেপে হঠাৎ বাণীদি এলেন। সেই রকম বেশ-বাস, সেই রকম সাজ, শুধু মনে হল যেন কেমন ক্লান্ত বাণীদি।

গঙ্গার ঘাটে তমালের সঙ্গে একত্র সেদিন রাতে দেখা হবার পর থেকে আর সামানা-সামনি হয় নি বাণীদির। কিছু একটা না বললে ভাল দেখায় না বলে অপ্রতিভের মত একটু হেসে সীমা বলে, আপনিও ছিলেন এতক্ষণ!

ম্লান হাসির সঙ্গে বাণীদির মুখ ফস্কে যেন বেরিয়ে যায়। কোথায় আর যাব? তারপরই হঠাৎ যেন নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে পড়েন বাণীদি। নিজের সম্পর্কে ঐ খানেই থেমে গিয়ে যোগ করেন, তুমিও তো ছিলে দেখছি। কিন্তু একা কেন? শেষের দিকে বাণীদির পোষাকী মুখচ্ছবিটা যেন আবার ফিরে আসে।

সীমা হঠাৎ থতমত খেয়ে যায়। কি জবাব দেবে ঠিক করে উঠতে না পেরে বলে, আমি···মানে একলা···মানে। চোখমুখ লাল করে থেমে পড়ে সীমা। মনে মনে আবার পূর্বের সেই অসহায় অভিমানের ভাবটা মোচড় দিতে থাকে।

বাণীদি ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। একটু এগিয়ে এসে অন্তরঙ্গ ভাবে ওর পিঠে হাত রেখে এবার বলেন, বোকা মেয়ে কোথাকার! ওঁর পাণ্ডুর হাসির অন্তরালে স্নেহে চক্‌চকে দৃষ্টি চিনতে সীমার ভুল হয় না। ঐ একটু

স্নেহস্পর্শে ওর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে ওঠে।

বাণীদি আবার বলেন, তাড়া নেই তো বাড়ী ফেরার—চল কোথাও একটু চা খেতে খেতে গল্প করব।

সীমা যেন ধন্য হয়ে যায়। অভিমানের সময় এই সস্নেহ সম্ভাষণ এবং বিশেষ করে বাণীদির মত ওর কাছে কল্পলোকের মহিলার কাছ থেকে!

কলকাতায় ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও বাস্তবে তা হল—বাইরে বেরিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। এবং তারপর সীমার মত নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ের কাছে আর এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। পার্ক স্ট্রীটের এক অভিজাত রেস্টুরেণ্টে—যেসব জায়গায় ওদের অফিসের কেবল বাণীদির মত অভিজাত মহিলারা ঘুগলে আসেন বলে শুনেছে সীমা—সেখানে বসে খাওয়া।

সবিস্ময়ে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখছিল সীমা। এ যেন এক স্বপ্নলোক। আধুনিকতার নিদর্শন প্রায়ান্ধকার খাবার ঘরে সুবেশা নর-নারীদের মেলা, মৃদু সঙ্গীতের মধ্যে পেয়ালা পিরিচের টুং টাং শব্দ ভেসে আসছে। তার মধ্যে দামী উর্দি গায়ে দিয়ে বেয়ারা-ওয়েটারদের যাতায়াত।

তারপর—কি ঠিক করলে?

বাণীদির কণ্ঠস্বরে সীমার ঘোর কাটে যেন। ধড়মড় করে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখে যে পাণ্ডুর মুখমণ্ডলে যেন একটা মৃদু কৌতুক হাস্যের ছাপ পড়েছে।

হতভম্বের মত সীমা আমতা আমতা করে, মানে···ঠিক···মানে···

বাণীদির মুখের মৃদু কৌতুক-হাস্য একটু তীব্র হয়। সীমার অবস্থা উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে মুখ টিপে হেসে বলেন, মানে—তমালের সঙ্গে তোমার বিয়ের আর কি?

বন্দনার মারফত ওদের সম্পর্ক সম্বন্ধে বাণীদির সমর্থনের কথা জানলেও ঠিক এ জাতীয় সোজাসুজি প্রশ্নের জন্য সীমা প্রস্তুত ছিল না। এক রাশ লজ্জা এসে ওর চোখ মুখ রক্তবর্ণ করে দেয়। বেশ কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে নীরব থাকে সীমা।

বাণীদি ওর দিকে সকৌতুকে চেয়ে থাকেন। তারপর বলেন, নাঃ তুমি তো দেখছি লজ্জাতেই গেলে। কয়েক মুহূর্ত থেমে প্রশ্রয়ের ভঙ্গীতে বলেন, তোমাদের বয়সের একটি মেয়ে আর একটি ছেলেকে ভালবাসবে এতে লজ্জার কি আছে? বিশেষ করে দুজনেই যখন শিক্ষিত, উপার্জনশীল।

সীমা এবার ধীরে ধীরে মুখ তুলে চায়। বাণীদির মধ্যে নিজের না থাকা বড় দিদিকেই যেন দেখতে পায় সীমা। ওঁর স্লিভলেস জামা অথবা স্খলিত বক্ষাঞ্চল কিংবা ঠোঁট বা গালের রং তেমন বিরাগ সৃষ্টি করে না আর মনে।

তবে-তবে একটা কথা বলি তোমাকে। মানে গত কয়েক দিন ধরেই বলব বলব ভাবছি। তমালের একটু রাশ টানো। হি ইজ লিভিং ট্যু ডেঞ্জারাসলি—মানে বড্ড বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এই সব পার্টি নিয়ে মাতামাতি করছে। দিনকাল কেমন দেখছ তো! বাণীদির এই অন্তরঙ্গ শুভার্থীর রূপ সীমার একেবারে অজানা ছিল।

কিন্তু .....

কিন্তু কি? কথা শুনবে কি না—এই চিন্তা? বাণীদি যেন দিব্য দৃষ্টিতে সীমার মনের ভাবনা পড়ে নিলেন। তারপর যোগ করলেন, এটা নির্ভর করছে তোমার ভালবাসার টানের উপর। হ্যাঁ—ভালবাসার টানের উপরই। শেষের কথাগুলির উপর কেমন একটা অনাবশ্যক জোর দিয়ে বাণীদি শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। সীমা উপলক্ষ্য হলেও কথাগুলি যেন আর কারও উদ্দেশ্যে বলছেন।

ইতিমধ্যে খাবার দিয়ে গেছে। কয়েক মিনিট নীরবে আহার্যে মনঃ সংযোগ করে ওরা।

বাণীদিই আবার নীরবতা ভঙ্গ করেন। বলেন, কই আসল কথাটার জবাব দিলে না তো? বিয়ের ব্যাপারটা সারছ কবে? এসব ব্যাপারে দেরী করা উচিত নয়। বলতে বলতে আবার কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যান বাণীদি। একটু আগের মত শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে যোগ করেন, দেরী করলে আমার মত একাকীত্বের বোঝা.....

সীমা খাওয়া ভুলে বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বাণীদির কথা শুনছিল। তাঁর শেষের কথার জের টেনে কতকটা অভিভূতের মতই সীমা উচ্চারণ করল, একা.....আপনি...মানে...তবে যে ওরা সবাই বলে...

জানি কি বলে। বলে আমার একজন মনের মানুষ আছে যে কোন বিলাতী ফার্মের বড় অফিসার...প্লেনে নিত্য ইউরোপ আমেরিকা করে বেড়ায়। আমার জন্য বিলাতী কসমেটিক নিয়ে আসে। আর মাঝে মধ্যে এখানে থাকলে আমার সঙ্গে ট্রিঙ্কা কিংবা মূলা রুজে লাঞ্চ ডিনার খায়—তাই না? বাণীদির মুখে এক ফালি হাসি থাকলেও সে হাসি যেন কান্নারই সমগোত্র মনে হল সীমার। বলতে বলতে বাণীদির স্বর পাল্টে যায়। আত্মবিদ্রূপের স্থানে আসে দারুণ উত্তেজনা। কম্পিত উত্তেজিত কণ্ঠে বাণীদি বলেন, সেদিন গঙ্গার ধারে

তোমরা দুজনে দেখেছ আমি একা। যতই লুকিয়ে বেড়াতে চাই আরও দুই এক জনের চোখে পড়েছে যে আমি একা। আর কত দিন মিথ্যার এ খোলস বজায় রাখতে পারব জানিনা। তবু—তবু আমাকে চেষ্টা করে যেতে হবে—এমনি রং চং মেখে সাজ পোষাক দিয়ে বয়সটাকে লুকিয়ে রেখে আমার নিঃসঙ্গতার বোঝা বইতে হবে।

উত্তেজনায় হাঁফাতে হাঁফাতে বাণীদি বয়কে ডাক দিলেন এবং সে আসতেই হুকুম করলেন, হুইস্কি, সোডা—কুইক।

সীমার সামনে বোমা ফাটলেও বোধহয় এত বিস্মিত হত না। কিং-কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে প্রায় প্রস্তরমূর্তির মত বসে রইল সীমা।

খাদ্য সরবরাহে এসব রেস্ট রেণ্টে দেরী হলেও মদ্যের বেলায় এরা কিন্তু অত্যন্ত তৎপর। কাঁচের গ্লাসে তরল পদার্থ দুটো মিলিয়ে নিয়ে প্রায় এক চুমুকে প্রথম গ্লাস শেষ করার পর দ্বিতীয় গ্লাস হাতে নিয়ে বাণীদির আবার সীমার কথা খেয়াল হল। কয়েক মিনিট ওর দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আর্দ্র কণ্ঠে বাণাদি বললেন, খুব ঘাবড়ে গেছ—না? বাণীদির এ রূপ জানা ছিল না নিশ্চয়।

সীমা জবাব দেবে কি? ও যেন বাক্‌শক্তি রহিত।

আর এক চুমুক পেলাসের পানীয় পান করে প্রায় কান্না জড়িত কণ্ঠে বাণীদি বললেন খুব ঘেন্না হচ্ছে আমার উপর—না? মদ খাওয়াকে আমিও ঘেন্না করি। কিন্তু তবু নিজে মাঝে মাঝে খাই এই একাকীত্বের ভয় ভুলতে··· নিঃসঙ্গতার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে। কিন্তু কী প্যারাডক্স—একাকীত্ব কাটে না মদে। আরও বাড়ে···আরও বাড়ে। বাণীদির মুখে তখনও ফ্যাকাশে হাসি। কিন্তু এর থেকে চেঁচিয়ে কাঁদলে বোধহয় ভাল হত।

অনেক কষ্টে সীমা মুখ খোলে। বলে, কিন্তু সবার কাছেই যে শুনেছি আপনার···মানে তিনি সত্য সত্যই আছেন আর···

আর এক চুমুক তরল অগ্নি গলাধঃকরণ করে বাণীদি বলেন, না—নেই··· কেউ নেই। তবে···

ওটা আমার নিজের রটনা—সুকৌশল রটনা।

সীমার সামনে আবার যেন বোমার বিস্ফোরণ হয়। জড়িত স্বরে ও বলে, নিজেই নিজের নামে···

হ্যাঁ, নিজেই নিজের নামে রটনা করেছি আভাসে, ইঙ্গিতে। যাতে মানুষের কৌতুহল বাকীটুকু নিজের নিজের কল্পনা দিয়ে পূর্ণ করতে পারে। বিদ্রূপের

CENTRAL LIBRARY

ভঙ্গীতে বাণীদি বলেন।

প্রায় আর্তনাদের মত সীমা উচ্চারণ করে, কিন্তু কেন? নিজের নামে নিজে এই মিথ্যা রটনা···

ও তুমি বুঝবে না। যার মা বাবা নেই, দাদা বৌদির সঙ্গে বনেনা বলে বাড়ী ছেড়ে একটা ফ্ল্যাটে একা একা থাকে, কোন আত্মীয় বন্ধুই নেই যার এই বিরাট পৃথিবীতে এই কেউ না থাকার লজ্জা, হীনতা গোপন করতে কেন সে নিজের নামে মিথ্যা কাহিনী রটনা করে তা তুমি বুঝবে না। বিশেষ তোমার বয়সে।

কিন্তু আপনার রূপ গুণ সবই তো আছে। তবে কেন···

তবে কেন কারও গলায় মালা দিলাম না—এই তো? গেলাসের পানীয় শেষ করে আবার ঢালতে ঢালতে বাণীদি সঙ্কোচে বলেন, শোন নি—অতি বড় রূপসী না পায় বর—এ সেই বৃত্তান্ত। গ্লাসে আর এক চুমুক দিয়ে বাণীদি বললেন, শোন তাহলে। বেশ বিত্তবান মা বাপের এক মাত্র মেয়ে। দেখতে সুরূপা এজ্ঞান বাল্যাবধি ছিল। ভাল ভাবেই জুনিয়ার কেম্ব্রিজ আর সিনিয়ার কেম্ব্রিজের সিঁড়িগুলো পার হয়েছিলাম কলকাতার নামী মিশনারী স্কুল কলেজ থেকে। তারপর যথারীতি বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগল। কিন্তু বাবা মায়ের বড় বেশী বাছাবাছি। টাকা পয়সার এবং সমাজে প্রতিষ্ঠার অভাব নেই। তাই আত্মীয় বন্ধু মহলে এক মাত্র মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্য করে একটা কিছু দেখিয়ে দেবার ইচ্ছা। সুতরাং ঘর পছন্দ হয় তো বর পছন্দ হয় না, আর বর পছন্দ হলে ঘর তেমন নয়। বাবা যদি কোন তরুণ আই. এ. এস. পাত্র পছন্দ করেন তো মা নাক সিঁটকে বলেন—কত বছরে সেক্রেটারী হবে কে জানে? এখন বাণীর খরচ চালাবে কি করে? মা কভেনেন্টেড অফিসার পাত্র পেলে বাবা ঠোঁট উল্টে বলেন, মারোয়াড়ী ফার্মের আবার কভেনেন্টেড অফিসার। বলে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন।

বিদ্রূপের ভঙ্গীতে হেসে অর্ধবিস্ফারিত আরক্ত চক্ষু সীমার দিকে তুলে বাণীদি বলতে থাকেন, এদিকে পৃথিবী কারও জন্য বসে থাকে না। দেখতে দেখতে আমার বয়স ত্রিশ বছরের কাছাকাছি হল। রূপ যৌবনে ভাঁটা পড়া শুরু করল। আর ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ পর পর মা বাবা দুজনেই মারা গেলেন। শুধু রেখে গেলেন আমার জন্য কিছু ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স।

তারপর আপনি নিজের পছন্দ মত বিয়ে করলেন না কেন? সাগ্রহে সীমা বলে। হতাশ ভাবে বাণীদি বলেন, এই নিজের পছন্দই তো কাল করল। মা

বাবা কি যে নিজের সম্বন্ধে আহা মরি ধারণা মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন যে কাউকে আর পছন্দ হয় না। আর যদিও বা কখনও আমার পছন্দ হয়, তবে অপর পক্ষের কাছে আমি বাতিল। বয়স লুকিয়ে, উগ্র থেকে উগ্রতর প্রসাধন আর আধুনিকতম পোষাকেও তার মন জয় করা যায় না।

কেন ?

কারণ প্রকৃতির পরিহাস। আমার বয়স আর রূপ যৌবন তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না—এগিয়ে চলে। সে বয়সের সঙ্গে খাপ খায় এমন অবিবাহিত পাত্র আর জোটে কোথায় ? যে দুচার জন কাছে আসে, ঘনিষ্ঠতা করতে চায় তাদের লক্ষ্য আমি নই-আমার ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স। সেই জন্যই তো তোমাদের বলছি, তাড়াতাড়ি কর—বয়স থাকতে বিয়েটা সেরে নাও। নাহলে আমার মত সাড়া জীবন একাকীত্বের বোঝা বইতে হবে।

শেষের কথাগুলি সীমার যেন কানে যায় না। বলে. কেউ কি ভালবাসেনি আপনাকে সারা জীবন কারও সত্যিকার ভালবাসা পান নি ?

কয়েক মিনিট গুম্ হয়ে যায় বাণীদি। চুপ করে ধীরে ধীরে গেলাস থেকে সিপ করেন। তারপর বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেন, রবীন্দ্রনাথের "ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর" মনে আছে ? একদিন ক্ষ্যাপা হঠাৎ দেখল কখন তার কোমরের লোহার শিকল সোনায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। ফেলে আসা পথে ফিরে যাবার সময় ক্ষ্যাপা আর পরশ পাথর পেয়েছিল কি না জানিনা, কিন্তু আমার জীবনকে রূপান্তরিত করতে সক্ষম সেই পরশ পাথর আর ফিরবে না। হিমালয়ের বরফে তার চির সমাধি ঘটেছে।

সীমা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বাণীদির দিকে চেয়ে রইল।

বাণীদি ক্লান্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, বছর নয়েক পূর্বের কথা—বাবা মা মারা গেছেন দুই বছর হল। এমনি এক জন সত্য সত্যই হয়ত এসেছিল আমার জীবনে। কিছু বলত না···চাইত না। শুধু ভক্তের দৃষ্টি নিয়ে বসে থাকত আমার একটু সান্নিধ্য পাবার, কথা শোনার আশায়। তবে তার মন বুঝতে আমার ভুল হয়নি। জানোতো এ ব্যাপারে মেয়েদের একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করে। দাদার এক বন্ধু তিনি। তবে কলেজের লেকচারার বলে সে ভদ্রলোককে আমি পাত্তা দিই নি আদৌ। এমনি বসে থাকতে থাকতে এক দিন কথাটা পেড়েই ফেলল সে হঠাৎ আমাকে একলা পেয়ে।

কথা পেড়ে ফেললেন তিনি ? সাগ্রহে সীমা বলল।

সীমার মনোভাবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে বাণীদি বলে চললেন, আমি শুনে

হেসে বললাম—ওসব কথা ভুলে যান। আপনার মাইনেতে আমার কসমেটিকের খরচই কুলোবে না। বন্ধু বান্ধবীদের পার্টি দিতে হলে তো···

আপনি বললেন ও কথা? সীমা বেদনার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

আমি কি বললাম? আমার ভ্যানিটি···অহমিকা আমাকে দিয়ে বলাল এবং তার ফলও ভোগ করছি এখন পর্যন্ত। না—না, আরও কত দিন ভোগ করতে হবে কে জানে? বাণীদি যেন হাহাকার করে উঠলেন।

কিন্তু হিমালয়ে তাঁর কি হয়েছে বলছিলেন? সীমা আবার প্রশ্ন করে।

শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বাণীদি বলেন, হাঁ···ওয়ালং-এ চীনের সঙ্গে যুদ্ধে যে বাঙ্গালী অফিসার অল্প কয়েকজন মাত্র সৈন্য নিয়ে অসীম সাহসে অসম লড়াই করে বরফের মধ্যে চিরবিশ্রাম লাভ করেন, তিনিই ইনি। কাগজে খবরটা পড়ে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম যে আমার সেই রূঢ় প্রত্যাখ্যানের পর সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন উনি এবং তারপর বছর ঘোরার আগেই লাগল চীনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ। নেফার পাহাড়ে বরফের মধ্যে আমার পরশ পাথর চির দিনের জন্য হারিয়ে গেল। বাণীদি টেবিলের উপর মাথা রেখে এলিয়ে রইলেন কতক্ষণ।

আবার যখন ধীরে ধীরে মাথা তুললেন সীমা দেখল ওঁর মুখমণ্ডলের প্রসাধনের পুরু প্রলেপের উপর জলের দুটি রেখা। ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে বাণীদি চোখ মুখ মুছলেন। তারপর ব্যাগের আয়নায় নিজের চেহারা দেখে একটু ফ্যাকাশে হাসি হেসে তাড়াতাড়ি কিছু প্রসাধন সামগ্রী বার করে দ্রুত হস্তে প্রসাধনের ক্ষতিটা মেরামত করার কাজে লেগে গেলেন। মুখে বললেন, সারাটা জীবন এমনি মেক আপ দিতে দিতে কাটল আমার। একটু থেমে গাঢ় কণ্ঠে বলতে লাগলেন, ট্রাজিডিটা কি জান—বাবার এক বন্ধুর প্রভাবে বাড়ী ছাড়ার পর চাকরীটা নিয়েছিলাম। টাকার জন্য নয়, একটু মানুষ-জনের সান্নিধ্য পাবার জন্য···নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্য। কিন্তু আমি একাকী পাছে তা জেনে সহকর্মীরা আমাকে করুণা করে তার জন্য নিজের চারদিকে এমন জাল রচনা করলাম যে আরও নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম। অফিসের নারী পুরুষ—সব সহকর্মীদের কাছে আমি যেন দূর গগনের চাঁদ···আমায় দেখা চলে, তারিফ করা চলে কিন্তু আমার সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক ভাবে মেশা যায় না। এযে কী জ্বালা তুমি বুঝবে না। হোটেল, বার অথবা সিনেমা থিয়েটার বা কনসার্ট, পার্ক. ময়দান কিংবা গঙ্গার ঘাট যেখানেই যাও—একা শুধু একা। এ একাকিত্ব যেন পাষান ভারের মত চেপে দম বন্ধ করে দেয়। তাই মাঝে

মাঝে একে ভোলার জন্ত মদ খাই। কিন্তু নেশার ঘোর কাটলে আবার যে কে সেই···

বাণীদি শুনলেন না কিছুতেই। টলতে টলতে একটা ট্যাকসিতে উঠে জোর করে ওকেও পাশে নিলেন। বললেন, তোমাকে টালিগঞ্জে যেখানে বলবে নামিয়ে দিয়ে আমার বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে যাব।

এই অবস্থায় একা একা ট্যাক্সিতে···সীমা মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলেছিল।

জড়িত কণ্ঠে বাণীদি বলেছিলেন, কিছু হবে না..ও আমার অভ্যেস আছে। কেমন একটা বিচিত্র হাসির সঙ্গে বাণীদি যোগ করেছিলেন—সমুদ্রে পেতেছি শয্যা, শিশিরে কি ভয় ?

সারা পথ আর কোন কথা হয় নি। সীমার নির্দেশে ড্রাইভার নেতাজী নগরের মোড়ে ট্যাক্সি থামাতে বাণীদির যেন হুঁস হল। জড়িত কণ্ঠেই বললেন, যা বলছিলাম···বিয়েটা সেরে নাও বয়স থাকতে থাকতে। একা থেকো না আমার মত।

নামার আগে সীমার কি হল হঠাৎ বাণীদির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল আশীর্বাদ করুন।

পায়ের ধুলো নিতে দেখে ঐ অবস্থায় যতটা সম্ভব বাণীদি হাঁ হাঁ করে উঠলেন। আপত্তির সুরে বললেন, আমার আবার আশীর্বাদ···তার আবার দাম ! তবে—তবে ভগবান বলে যদি কেউ থাকেন তবে তোমার মত···মানে তোমাদের মত ব্রাইট ছেলে মেয়েদের যেন মিলিয়ে দেন। একা না থাকতে হয়···।

বাকীটা ট্যাক্সির গর্জনে আর শোনা গেল না। কয়েক মুহূর্ত অপসৃয়মান ট্যাক্সিটার দিকে তাকিয়ে থাকার পর সীমা আনন্দ বিষাদে ভরা এক বিচিত্র মানসিকতা নিয়ে বাড়ীর পথ ধরল। (ক্রমশঃ)

আমার আত্মজীবনীর চুম্বক

বারট্রাণ্ড রাসেল

১৯১৪-র পূর্বের পৃথিবীটা কি রকম ছিল তা স্মরণ করার পক্ষে যাদের বয়স খুবই কম তাঁরা সহজে আমার মত বয়সী একজনের কাছে শৈশব স্মৃতি ও বর্ত্তমান পৃথিবীটার মধ্যে যে বিষম তফাৎ তা ঠিক কল্পনা করতে পারবেন না। আমি কেবলই নিজেকে বাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করি—তবে খুব যে তাতে সফল হই তা-ও নয়—এই বর্ত্তমান দুনিয়ার সঙ্গে, যেখানে সাম্রাজ্যগুলো ভেঙ্গে পড়ছে এবং কম্যুনিজ্‌ম্, এ্যাটম বোমা, এশিয়ার আত্মঘোষণা, অভিজাত শ্রেণীর বিলোপ যেখানে প্রত্যক্ষ সত্য। যেখানে কাল পর্য্যন্ত বেঁচে থাকবে কিনা কেউ জানে না এবং যেখানে প্রাচীন রাষ্ট্রগুলি ভোরের কুয়াসার মতো বিলীয়মান. এই অপরিচিত নিরাপত্তাহীন জগতে তাদের পক্ষে জীবন ধারণ সহজসাধ্য নয়, যারা তাদের কৈশোরের সুদৃঢ় বিশ্বাসভূমিকে ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন নয়, শাশ্বত সত্য বলেই জেনেছে। আমার বাল্যকালে যে সব প্রতিষ্ঠান ও জীবনাদর্শ গ্র্যানিট পাথরের মতো অবিনশ্বর মনে হতো, তার প্রায় কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। যে-জগতে আমি বেড়ে উঠেছিলাম তা ছিল ঐতিহ্যদ্বারা ওতপ্রোত।

আমার পিতা মাতা আমার স্মরণকালের পুর্বেই গত হয়েছিলেন এবং আমি বড় হই আমার পিতামহ ও পিতামহীর কাছে। আমার পিতামহের জন্মকাল ফরাসী বিপ্লবের প্রথম দিকে এবং তিনি যখন পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন নেপোলিয়ন তখনও ফরাসী সম্রাট। ফক্সের অনুগামী-'হুইগ' হিসেবে ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের প্রতি ইংরেজদের বিরোধিতা তিনি মাত্রাতিরিক্ত বলেই মনে করতেন এবং নির্বাসিত নেপোলিয়নের সঙ্গে তিনি একবার গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। ইংলণ্ডকে যা গণতন্ত্রের পথে প্রবর্ত্তিত করে সেই, ১৮৩২ সালের রিফর্ম বিল, তাঁর দ্বারাই আনীত হয়েছিল। মেক্সিকোর যুদ্ধের সময়ে এবং ১৮৪৮-এর বিপ্লবের কালেও তিনিই প্রধানমন্ত্রী—ছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে সমস্ত রাসেল পরিবারের সঙ্গে তিনিও এক বিশেষ আভিজাতিক উদারনৈতিকতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যে-উদারনৈতিকতা ছিল ১৬৮৮-র বিপ্লবের চরিত্র লক্ষণ। ঐ বিপ্লবে তাঁরই এক পূর্বপুরুষ এক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। আমাকেও এক

CENTRAL LIBRARY

তাত্ত্বিক প্রজাতান্ত্রিকতায় (theoretical republicanism) তালিম দেওয়া হয় যার বক্তব্য ছিল,—রাজা প্রজাসাধারণেরই একজন কর্মচারী মাত্র এবং অযোগ্য প্রমাণিত হলে কর্মচ্যুতও হতে পারেন, এই সত্যটা যতদিন তিনি মনে রাখবেন ততদিন রাজাকে সহ্য করা যেতে পারে। আমার পিতামহ কাউকে খাতির করে কথা বলতেন না এবং রাণী ভিক্টোরিয়ার কাছেই তাঁর এই মতটির ব্যাখ্যা করতেন। বলা বাহুল্য রাণী ভিক্টোরিয়ার এতে পুরোপুরি সায় ছিল না। তবে রাণী তাঁকে রিচমণ্ড পার্কের বাড়ীটি দান করেন। এই বাড়ীতেই আমার প্রথম জীবন অতিবাহিত হয় এবং এখানেই আমি কিছু রাজনৈতিক মৌল বিশ্বাস ও প্রত্যাশা অন্তঃস্থ করি, যা মোটামুটি—প্রত্যাশা গুলো বিসর্জন দিতে বাধ্য হলেও—এখনো বজায় আছে।

সেই বিশ্বাসগুলি হলো: সমস্ত বিশ্বে সুশৃঙ্খল নিয়মশাসিত প্রগতি জয়যুক্ত হবে, যুদ্ধের হবে ক্রমিক বিলয়, এবং যেসব হতভাগ্য দেশগুলিতে পার্লামেণ্টারী শাসন এখনো কায়েম হয়নি সেখানেও তা বিস্তৃত হবে। রুশ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা স্মরণ করে' আমার পিতামহী হাসতেন। পিতামহী তাঁকে বলেছিলেন, 'হয়তো একদিন আপনাদের দেশেও পার্লামেণ্ট হবে'। তাতে তিনি জবাব দেন, 'ঈশ্বর না করুন, লেডি জন!' আজকের রুশ রাষ্ট্রদূতও ঐ একই উত্তর দিতে পারেন যদি কেবলমাত্র প্রথম শব্দটি বদলে নেন। তখনকার দিনের প্রত্যাশাগুলো এখন কিছুটা অবাস্তব ও হাস্যকর মনে হয়: যেমন, সর্বত্র গণতন্ত্রের বিস্তার হবে তবে জনগণ চিরদিন বিজ্ঞ অভিজাততর্গের উপদেশ মেনেই চলবে। সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটবে, তবে বৃটিশ শাসনের স্বেচ্ছাবিলোপের পর এশিয়া ও আফ্রিকার অধীন দেশগুলি সমসংখ্যক 'হুইগ-টোরী' সমন্বিত দুই পরিষদ বিশিষ্ট আইনসভার মহৎ গুণাবলি অনুধাবন করে', তাদের সেই উষ্ণমণ্ডলেও, গ্ল্যাডষ্টোন-ডিজরেইলীর দ্বৈরথের পুনরনুষ্ঠান ঘটাবে। যেকালে আমি আমার মুখ্য রাজনৈতিক সংস্কারগুলি সংগ্রহ করি তখন ছিল গ্ল্যাডষ্টোন-ডিজরেইলির দ্বৈরথের সুবর্ণ যুগ। ব্রিটিশ শক্তির অনিরাপত্তার ক্ষীণ সম্ভাবনার কথাও কেউ ভাবতে পারতো না তখন। ব্রিটানিয়া সপ্তসাগরের অধিশ্বরী এই হলো শেষ কথা। হাঁ, বিসমার্ক বলে' একজন ছিল অস্বীকার করা যেত না, তবে তাকে একটি দুর্বৃত্ত বলে ভাবতেই বলা হতো আমাকে; এবং এও যে, গ্যেটে ও শিলারের সুসভ্য প্রভাবের ফলে জার্মান জাতি এই অসভ্য চাষাটার দ্বারা নিশ্চয়ই চিরকাল বিভ্রান্ত হবে না। এও অবশ্য সত্য যে, অনতিদূর অতীতেও হিংস্রতার কুৎসিত প্রকাশ ঘটেছিল। ফরাসীরা তাদের

বিপ্লবের সময় মাত্রা ছাড়িয়ে শোচনীয় অনেক কিছু করে। তবে প্রতি-ক্রিয়াশীলরা এগুলো আবার অতিরঞ্জিত করেও' বলে, এবং এও ঘটতো না যদি সমগ্র ইয়োরোপ তখন ফ্রান্সের প্রগতিশীল মতবাদের বিরোধিতা না করতো। হাঁ, এও অস্বীকার করা যেত না যে, ক্রমওয়েল রাজার মাথা কেটে একটু বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল ; তবে মোটামুটিভাবে রাজাদের বিরুদ্ধে সব কিছু আচরণই প্রশংসনীয় বলা যায়, অবশ্য যদি তা যাজকশ্রেণীর দ্বারা—যেমন বেকেট—সংঘটিত না হয়ে থাকে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে রাজাকে সমর্থন করাই ছিল নীতি।

বাড়ীতে আবহাওয়াটা ছিল পিউরিট্যান ধর্মানুরক্তির ও কৃচ্ছ্রপরায়ণতার। প্রত্যহ সকাল আটটায় পারিবারিক উপাসনা হতো। বাড়ীতে আটজন চাকর বাকর থাকলেও খাওয়াটা ছিল স্পার্টান সুলভ সাদাসিধে। এবং তার মধ্যেও ভালো কিছু থাকলে বাচ্চাদের তা দেওয়া হতো না। যেমন, আপেলের চাটনি আর চালের পায়েস দুটোই যদি থাকতো কোনোদিন, আমাকে শুধু পায়েসই দেওয়া হতো। সারাবছর ঠাণ্ডা জলে স্নান এটাই ছিল নির্দেশ এবং আমাকে প্রত্যহ সাড়ে সাতটা থেকে আটটা পর্য্যন্ত অগ্নিকুণ্ড-না-জ্বালানো ঠাণ্ডা ঘরে পিয়ানো অভ্যেস করতে হতো। আমার পিতামহী সন্ধ্যাবেলার আগে কখনো ইজিচেয়ারে বসতেন না। মদ আর তামাক দুটোকেই এ বাড়ীতে সুনজরে দেখা হতো না, যদিও কঠোর সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী অতিথিদের জন্য কিছু সুরা পরিবেশন করা হতো। একমাত্র নৈতিক উৎকর্ষকেই মূল্য দেওয়া হতো, এবং বুদ্ধি স্বাস্থ্য সুখ ও সকল পার্থিব লাভের বিনিময়েই তা করা হতো।

আমি প্রথমে বুদ্ধির দোহাই দিয়ে এই আবহাওয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি। কৈশোরে আমি খুব একাচোরা, লাজুক ও আত্মম্ভরী ছিলাম। বাল্যের সব সুমিষ্ট বন্ধুত্ব ও সখ্যতার আনন্দ থেকে আমি বঞ্চিত ছিলাম তবে তার অভাব বোধ করতাম না। কিন্তু আমি ভালবাসতাম অঙ্ক, আর অঙ্ক সেবাড়ীতে ছিল সন্দেহের বস্তু—যেহেতু তার মধ্যে নৈতিকতার নাম গন্ধও পাওয়া যেত না। পারিবারিক ধর্মীয় ধারণাগুলোর সঙ্গেও আমার অমিল ঘটলো এবং বয়স বাড়ার সাথে আমি দর্শনশাস্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়লাম। কিন্তু দর্শনের উপরও তাঁরা ছিলেন নারাজ। যখনই বিষয়টা উত্থাপিত হতো, ব্যতিক্রমহীন ছন্দে একটি রসিকতার পুনরাবৃত্তি হতো : "What is mind ? No matter. What is matter ? Never mind". পঞ্চাশ কি ষাট বার এর পুনরাবৃত্তির পরে এতে কোনো মজা আমি আর পাইনি।

আঠারো বছর বয়সে যখন আমি কেম্ব্রিজে গেলাম তখন দেখে খুব অবাক

ও কিঞ্চিৎ বিমূঢ়ই বোধ করলাম যে, সকলেই আমার মতো ঢঙেই কথা বলে। আমি যা সত্যি বলে' ভাবি তা বললে কেউ আমায় পাগল ভেবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় না, কিম্বা ভয়ঙ্কর কিছু অপরাধ করে ফেলেছি এ বলে'ও ধিক্কার দেয়না। আমি এমন একটা অসুস্থ পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলাম যেখানে অস্বাস্থ্যকর অতিনৈতিকতার কল্যাণে বুদ্ধিবৃত্তির পঙ্গুত্বলাভই স্বাভাবিক। এখন আবার এমন এক জগতে এলাম যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিই সম্মানিত এবং পরিচ্ছন্ন চিন্তা শ্রদ্ধেয় বলে গণ্য করা হয়—ফলে আমি আনন্দে মেতে উঠলাম।

অনেকে বলেন যাদের শিক্ষা ঠিক প্রচলিত ধাঁচে হয় না তারা বাইরের জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে অসুবিধা বোধ করে। আমি কিন্তু কোনো অসুবিধা বোধ করিনি। কেম্ব্রিজের পরিবেশ আমার নিজের মাপের জামার মতোই জুৎসই ও আরামদায়ক মনে হলো। প্রথম ক'মাসের মধ্যেই আমি আমার আজীবন বন্ধুদের আবিষ্কার করি। আর কখনো আমায় কৈশোরের দিনগুলির একাকিত্বের অসহনীয় বেদনা অনুভব করতে হয়নি। কেম্ব্রিজে আমি প্রথম তিন বছর অঙ্ক নিয়ে পড়ি এবং চতুর্থ বছর পড়ি দর্শন নিয়ে। পরে যদিও তখনকার পঠিত দর্শন শাস্ত্র আমার কাছে খুব শ্রদ্ধেয় মনে হয়নি, তবু দর্শন পড়ে' আমি তখন নিবিড় আনন্দ পেয়েছি এবং অনেক দার্শনিক কূট প্রশ্নের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে যার উত্তর আমিই খুঁজে পাবো এমন আশা করেছি। বিশেষ করে' অঙ্কশাস্ত্রের মৌল ভিত্তি সংক্রান্ত প্রশ্ন আমায় বেশী আকর্ষণ করতো। এটা বিশ্বাস করতে ভালো লাগতো যে, এমন কিছু জ্ঞান আছে যা সুনিশ্চিত এবং সে-সুনিশ্চিত জ্ঞানে পৌঁছানোর সব চেয়ে ভালো রাস্তা হলো অঙ্ক। তবে এও বুঝতে পারছিলাম যে, আঙ্কিক প্রশ্নগুলির যে-ব্যাখ্যা আমার অধ্যাপকেরা দিয়েছিলেন তা ভুল। আমি আশা করতাম, উন্নততর ব্যাখ্যা খুব শীঘ্রই পাওয়া যাবে। পরবর্তী কালে পড়াশুনো ক'রে দেখলাম যে, আমার আশা আংশিক সফল হয়েছে। তবে, সেই সব যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণগুলিও—যৌবনের প্রত্যাশার তুলনায় যার পরিমাণ বলতে গেলে সামান্যই—খুঁজে বের করতে আমার প্রায় কুড়িবছর কেটে গিয়েছিল।

কেম্ব্রিজের ছাত্রাবস্থার অবসানে আমায় সিদ্ধান্ত নিতে হলো. আমি আমার বাকি জীবন দর্শন অথবা রাজনীতি কিসে নিয়োগ করবো। ষোড়শ শতাব্দী থেকে রাজনীতিই ছিল আমাদের বংশের চিরায়ত ব্যবসায়, এবং অন্য কিছুর অনুসরণ পিতৃপুরুষদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য হতো। রাজনীতি যদি বেছে বেছে নিই আমার যাত্রাপথ যে খুব সুমসৃণ হবে তা বোঝানোর জন্য

কিছুই করা হলো। জন মর্লি তখন আয়ার্লাণ্ডের সেক্রেটারী। তিনি আমায় সব কটি কাজ দিতে চাইলেন। লর্ড ডাফরিন তখন প্যারিসে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত। তিনি আমায় তাঁর এমব্যাসিতে একটি পদ দিলেন। যতো রকমে সম্ভব আমার উপরে পারিবারিক চাপ সৃষ্টি করা হলো। কিছুকাল আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে রইলাম কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দর্শনের হাতছানির মায়া অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠলো। জীবনে এই প্রথম একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিজ্ঞতা হলো, এবং দেখলাম যে তা বেশ বেদনাদায়ক। এর পরে অবশ্য আমায় এত বেশী দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে যে অনেকে ভাবেন আমি বুঝি দ্বন্দ্বই ভালোবাসি। কিন্তু বারে বারে আমার গভীর প্রত্যয়গুলির কারণেই অপরের সঙ্গে আমার মতানৈক্য ঘটেছে —এমন কি আমি না চাইলেও।

দর্শনকেই আমার জীবনসঙ্গিনী করায় অনেকদিন বেশ মসৃণভাবেই কাটলো। যে-পণ্ডিতী জগতে বাস করতুম সেখানে দর্শন চর্চা উৎকেন্দ্রিক নির্বুদ্ধিতা বলে গণ্য হতো না। ১৯১৪ পর্য্যন্ত তাই বেশ কেটে গেল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরু হলে আমার মনে হলো ব্যাপারটা দুই পক্ষের সংশ্লিষ্ট শক্তি-বর্গের প্রত্যেকেরই মূর্খতা ও অপরাধ। আমি আশা করেছিলাম ইংলণ্ড নিরপেক্ষ থাকবে, কিন্তু তা যখন হলো না তখন আমি প্রতিবাদ করে চললাম। ফলে বন্ধুদের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটলো এবং যা আমাকে সব চেয়ে বেশী পীড়া দিল, জাতীয় জীবনের স্রোত থেকেও আমি বিচ্ছিন্ন হলাম। অন্তরে অন্য শক্তি-উৎসের আশ্রয় খুঁজতে লাগলাম—জানতাম না যে তার সন্ধান পাবো। কিন্তু একটা কিছু, যদি আমি ধর্মবিশ্বাসী হতুম বলতে পারতুম অন্তরে ঈশ্বরের নির্দেশ, আমাকে নিজের পথে অটল রাখলে। তখনও কিংবা তার পরেও যুদ্ধ মাত্রকেই আমি অন্যায় মনে করিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে আমি অপরিহার্য্য জ্ঞান করেছি, কিন্তু যুদ্ধ সম্পর্কে আমার মনোভাবের পরিবর্ত্তন এর কারণ নয়—পরিস্থিতিটা ভিন্ন তাই। বাস্তবিক পক্ষে দ্বিতীয় যুদ্ধের অপরিহার্য্যতার মূলেই আছে প্রথম যুদ্ধের ফলশ্রুতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তার পরিণাম থেকে আমরা পেয়েছি রাশিয়ান কম্যুনিজম্, ইতালীয় ফ্যাসিজম্, এবং জার্মান নাৎসিজ্‌ম। এবং প্রথম যুদ্ধের ফলেই এসেছে এমন এক অস্থির বিশৃঙ্খল জগৎ যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও হয়তো শেষ কথা নয়; রাশিয়ান কম্যুনিজ্‌মের বিপুল ভয়াবহতা প্রতিহত করাও যেখানে আবশ্যিক; যেখানে জার্মানি ফ্রান্স ও অষ্ট্রো-হাঙ্গারীয় সাম্রাজ্য বলে' যা খ্যাত ছিল সেই সব দেশে সভ্যতার মানাঙ্ক অনেক নীচে নেমে গেছে; যে-জগতে এশিয়া ও আফ্রিকায়

মহা বিশৃঙ্খলা ঘটবার সম্ভাবনা খুবই প্রবল ; এবং যেখানে ভয়ঙ্কর হত্যালীলার বিভীষিকা মানুষের প্রতিটি মুহূর্ত আতঙ্কিত করে রেখেছে। এই সব অশুভের উদ্ভব ঘটেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে, ঠিক গ্রীক ট্র্যাজেডির অবশ্যম্ভাবিতা নিয়ে। অন্যদিকে একবার ভেবে দেখুন ঐ যুদ্ধে ব্রিটেন যদি নিরপেক্ষ থাকতো কী হতো। প্রথমত এর ফলে ঐ যুদ্ধ স্বল্পকাল স্থায়ী হতো। শেষ হতো জার্মানীর জয়লাভে। আমেরিকা জড়িয়ে পড়তো না। ব্রিটেন থাকতো সমৃদ্ধ ও সবল। জার্মানী নাৎসীবাদের কবলিত হতো না ; এবং রাশিয়াতেও, একটা বিপ্লব সেখানে ঘটলেও, কম্যুনিষ্ট বিপ্লব সংঘটিত হতো না, কারণ একটা স্বল্পকাল-স্থায়ী যুদ্ধের পরিণামে দেশটা ঐ চরম বিপর্যয়ে গিয়ে পৌছুতো না, যেমনটা হয়েছিল ১৯১৭-তে। কাইজারের জার্মানী, যদিও যুদ্ধকালীন প্রচারে তাকে ভয়ঙ্কর খারাপ বলে চিত্রিত করা হতো, আসলে ছিল একটু আস্ফালনপরায়ণ আর একটু উদ্ভট। আমি নিজে জার্মানীতে ছিলাম এবং দেখেছি সেদেশে প্রগতিপন্থীরা বেশ প্রবল এবং শেষ পর্য্যন্ত তারা সাফল্য অর্জন করতোই। তখনকার কাইজারের জার্মানীতে যে-স্বাধীনতা ছিল এখন তা কেবল ব্রিটেন ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ছাড়া অন্যত্র কোথাও আর নেই। আমাদের তখন বলা হয়েছিল, ঐ যুদ্ধ গণতন্ত্রের জন্য, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে লড়াই। কিন্তু এ যুদ্ধের ফলে সারা বিশ্বে স্বাধীনতার ঘটেছে মারাত্মক সঙ্কোচ এবং যুদ্ধবাদও ভীষণ বেড়ে গেছে। আর গণতন্ত্র ? তার ভবিষ্যৎ এখনো খুব অনিশ্চিত। আমার বিশ্বাস বর্ত্তমানে বিশ্বের অবস্থা যতোটা খারাপ হয়েছে কিছুতেই তা হতে পারতো না, যদি ঐ প্রথম যুদ্ধে ব্রিটেনের নিরপেক্ষতার ফলে জার্মানী জয়লাভ করতো। আমার বিচারে ঐ যুদ্ধে আমি যে-নীতি অনুসরণ করেছিলাম তা মোটেই ভুল নয়। এবং এজন্যও আমার কোনো অনুশোচনা নেই যে আমি ঐ যুদ্ধ চলাকালীন সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে, জার্মানদের যতো কুৎসীত করে দেখানো হচ্ছে তারা ততোটা খারাপ নয়। কারণ পরবর্ত্তী সব অশুভগুলোই এসেছে ভার্সাই সন্ধির কঠোরতা থেকে এবং ভার্সাই সন্ধি কিছুতেই অতো কঠোর করা হতোনা যদি না জনমানসে জার্মানদের বিরুদ্ধে জুগুপ্সা ও আতঙ্ক এত প্রবল না হতো।

তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। আমাদের মূর্খতা থেকেই নাৎসী জার্মানীর জন্ম হয়। এবং মানুষের জীবন যাতে নিতান্ত দুর্বিষহ না হয় তারই জন্যে নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই হয়ে পড়ে আবশ্যিক। যদি রাশিয়াও বিশ্ব-প্রভুত্বের জন্য লালায়িত হয়ে পড়ে তা হলে তাদের সঙ্গেও যুদ্ধ

আবশ্যিক হয়ে পড়বে। কিন্তু এই সব ভয়ঙ্কর পরিণতি আমাদের ১৯১৪-র ভুলের মাশুল। যদি সেই ভুল না করতাম তা হলে এই পরিণামগুলিও ঘটতো না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানেও আমার বিচ্ছিন্নতার অবসান হলো না, বরং গভীরতর বিচ্ছিন্নতার (কেবল ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ছাড়া) ভূমিকা স্বরূপ হলো। এর মূল কারণ ছিল, বিপ্লবী রুশ সরকারকে আমি-যে প্রশংসা করতে পারিনি, এই অপরাধ। প্রথম যখন রুশ বিপ্লব ঘটে তখন অবশ্য আর সবাইএর মতো—পেট্রোগ্রাডের ব্রিটিশ এমব্যাসিও তার মধ্যে ছিল—আমিও তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলাম। ১৯১৮-১৯ সালে এত দূর থেকে ঠিক কী যে ঘটছে তা জানা সম্ভব ছিল না, কাজেই বলশেভিকদের সম্বন্ধে আমার ধারণাও তখন অস্পষ্ট ছিল। কিন্তু ১৯২০-তে আমি রাশিয়ায় যাই এবং লেনিন ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলাপ হয়। এবং কী ঘটছিল ওখানে, তা নিজের চোখেও, যতোটা সম্ভব, দেখি। এর ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌছাই যে, সেখানে যা ঘটছিল এবং ঘটানো অভিপ্রেত বলে' সাব্যস্ত হয়েছিল, তা যে-কোনো 'লিবারাল' (উদারনৈতিক) দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির রুচি ও ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আমার কাছে ঐ শাসন ব্যবস্থা তখনই অত্যন্ত ঘৃণার্হ বলে মনে হয়েছিল এবং তা যে ঘৃণ্যতর হয়ে উঠবে তাও নিশ্চিত বুঝতে পারছিলাম। এই অশুভের মূল ছিল ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতি তাদের ঘোরতর অবজ্ঞা, এবং এবং ঐ অবজ্ঞার মূলে ছিল তাদের রাজনৈতিক ধর্মান্ধতা। তখনকার দিনের প্রগতিবাদীদের মত ছিল, বিপ্লবীরা যাই করুক না কেন, রুশ বিপ্লবকে সমর্থন করা তাঁদের কর্তব্য, কারণ, প্রতিক্রিয়াশীলরাই যখন ওর বিরোধিতা করছে তখন সমালোচনা করা অর্থই প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে অস্ত্র জোগানো। এ যুক্তির সারবত্তা আমিও উপলব্ধি করতাম, তাই কী আমার কর্তব্য এ নিয়ে মনে দ্বিধা ছিল। পরিশেষে আমি যা সত্য বলে জেনেছি ও বুঝেছি তার পক্ষেই মনস্থির করলাম। প্রকাশ্যে ঘোষণা করলাম যে, বলশেভিক শাসনকে আমি ঘৃণার্হ মনে করি। আজ পর্যন্ত ঐ মতের পরিবর্তনের কোনো কারণ আমি পাইনি। কিন্তু আমার এই অভিমত আমার ১৯১৪-র পরেকার বন্ধুদের একেবারেই মনঃপুত হলো না। আমি যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলাম বলে' অধিকাংশ লোক তো আমায় ঘৃণা করতোই, অল্পসংখ্যক যারা করতো না তারাও এখন আমায় ধিক্কার দিতে লাগলো বলশেভিকদের নিন্দা করছি বলে'।

১৯২০-র রাশিয়া ভ্রমণ আমার জীবনে একটা বড় সন্ধিকাল। যখন সেখানে ছিলাম আমি এমন একটা আতঙ্ক অনুভব করেছি যা ক্রমশঃ তীব্রতর হয়ে শেষে একেবারে অসহনীয় হয়ে ওঠে। মনে হয়েছে, সমস্ত দেশটা যেন একটা জেলখানা আর প্রহরীরা সব নিষ্ঠুর ধর্মান্ধ। যখন আমি দেখলাম যে, আমার বন্ধুরা এই সব লোকদেরকেই মুক্তিদাতা বলে' অভিনন্দিত করছে এবং তাদের ঐ শাসনব্যবস্থাকেই স্বর্গ বলে' উল্লেখ করছে, তখন আমি অত্যন্ত বিমূঢ় বোধ করলাম,—এরাই পাগল অথবা আমি? কিন্তু যুদ্ধের বছরগুলিতে নিজের বুদ্ধি বিচারকে অনুসরণ করে চলার অভ্যাস আমার দৃঢ় হয়ে গিয়েছিল। আমি বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে ইতিহাসের গতিবেগেই ঐ বৈপ্লবিক উদ্দীপনা সাম্রাজ্যবাদে রূপ নেবে—ফরাসী বিপ্লবের কালে যেমন নিয়েছিল। অবশেষে যখন আমি বলশেভিকদের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম তখন আমার পুরানো রাজনীতিক বন্ধুরা—এঁদের অনেকেই পরে আবার আমার মতাবলম্বীই হয়েছেন—আমি বুর্জোয়াদের তল্পিবাহক, এই বলে আমার নিন্দা করতে লাগলেন। ওদিকে আমার বক্তব্য প্রতিক্রিয়াশীলদের গোচরে না আসায়, তারা আমায় যথারীতি 'একটি কাপুরুষ বলশেভিক শূকর' বলে' তাদের কাগজে আমার শ্রাদ্ধ করেই চললো। কাজেই আমার দুদিক থেকেই প্যাঁজ ও পয়জার ভালো মতোই জুটলো।

কিন্তু এসবই আমার পক্ষে যতোটা বেদনাকর হতে পারতো তা হয় নি। এর কারণ ঐ সময়েই আমাকে চীনদেশে যেতে হয় এবং সেখানে, ইয়োরোপের ডামাডোল থেকে দূরে, একটি বছর আমার খুবই আনন্দে কাটে। ওর পর থেকে বিবাদ বিসম্বাদ যা হয়েছে তা আমার জীবনের বহিরঙ্গেই হয়েছে—যুদ্ধ ও বলশেভিকদের নিয়ে দ্বন্দ্বের মতো তা এমন তীব্র বেদনাদায়ক হতে পারে নি।

১৯২১-এ চীন থেকে ফিরে আমি কয়েক বছর সন্তান লালন ও শিক্ষা সমস্যা নিয়ে ব্যাপৃত থাকি। চলতি শিক্ষাপদ্ধতি আমার মনঃপূত ছিল না, আর প্রগতিশীল শিক্ষাপদ্ধতি নামে যা তখন চলতো তাও শুদ্ধ বিদ্যার্জনের মানদণ্ডে যথেষ্ট উন্নত মনে হয় নি। আমার বরাবরই মনে হয়েছে, আমাদের এই যন্ত্রবিদ্যাবাহন সভ্যতায় কারো পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ সম্ভবপর নয় যদি না সে তরুণ বয়সে প্রভূত পরিমাণ বিদ্যাচর্চ্চালব্ধ জ্ঞান আয়ত্ত করে। আমি সেসময় ঠিক পছন্দসই কোনো স্কুলই পেলাম না। তাই নিজেই একটা স্কুল শুরু করলাম। কিন্তু বিদ্যালয় চালানো হলো শাসন পরিচালন সংক্রান্ত ব্যাপার,

এবং লক্ষ্য করলাম যে ঐ ক্ষমতায় আমার দৈন্য আছে। স্কুলটা তাই চলল না। সৌভাগ্যক্রমে আমি তখনই আর একটি স্কুল পেয়ে গেলাম যেটি তখন বেশ ভালো হয়ে উঠেছিল। শিক্ষা বিষয়ে আমি দুটি বই লিখি এবং অনেক চিন্তা ভাবনাও করি। কিন্তু, যা সহজেই প্রতীয়মান হবে, আমি কথায় যতো দড় কাজে ততো নই। শৈশবে ষোলআনা স্বাধীনতার আমি পক্ষপাতী নই। আমার মনে হয় শিশুদের একটা বাঁধা রুটিন অনুসারে চালিত হওয়া দরকার। যদিও মাঝে মাঝে রুটিন থেকে ছুটির দিনও থাকা চাই। আমার ধারণা, বড় হয়ে সমাজজীবনে খাপ খাইয়ে চলার জন্যে শৈশবে এই শিক্ষা পাওয়া দরকার যে, সে-ই বিশ্বসংসারের কেন্দ্রবিন্দু নয় এবং কোনো ব্যাপারে তার ইচ্ছার মূল্যই সর্বাধিক নয়। আমার এও মনে হয় যে, অনেক প্রগতিশীল বিদ্যালয়ে কলকৌশলের জ্ঞান নেই এমন মৌলিকতার যে উৎসাহ দেওয়া হয় তাও ঠিক নয়। তবে প্রগতিশীল শিক্ষাপদ্ধতির অনেক কিছু আমি পছন্দও করি; বিশেষ, নির্ভয়ে কথাবলার স্বাধীনতা তথা জীবনের সত্যগুলি নিজেদের আবিষ্কারের স্বাধীনতা; এবং যে-নির্বোধ নৈতিকতা নিষ্ঠুর কাজের নিন্দা করে না কিন্তু একটি গালাগালির শব্দ সহ্য করতে পারে না তার অভাবও আমি প্রশংসা করি। কিন্তু আমি এও দেখেছি যে, যাঁরা শাসন শৃঙ্খলার প্রতি বিরূপ তারা প্রায়ই ভুলে যান যে, কিছু শাসন শৃঙ্খলা থাকাও দরকার। জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ত এটা বিশেষরূপে সত্য।

বয়স ও অভিজ্ঞতার ফলে আমার এসব ধারণা ঠিক ততোটা বদলায়নি যতোটা বদলানো উচিত ছিল। এবং এটা আমি উপলব্ধি করি যে, নীতি হিসাবে স্বাধীনতার সীমা-পরিচ্ছেদ আছে এবং শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে সবিশেষ আছে। মানুষ কোন্ পরিস্থিতিতে কি করবে না করবে তা মুখ্যতঃ তাদের অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। এবং নিয়মানুবর্তিতা ছাড়া ভালো অভ্যাস গঠন করাও সম্ভব নয়। আমরা অধিকাংশ লোক চুরি করিনা এবং না করেই জীবন অতিবাহ করি; এই আপাতস্বাভাবিক আত্মশাসনের মূলে কিন্তু আছে বহু শতাব্দীর পুলিশী অনুশাসনের অভ্যাস। শিশুদের যদি কোনো ভালো আচরণ শিক্ষা না দেওয়া হয় তা হলে তারা এ ওর খাবার জিনিষ কেড়ে খাবে, এবং যাদের বয়স (অর্থাৎ গায়ের জোর) বেশী তারাই ভালো খাবারগুলো খেয়ে নেবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও, বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক আচরণে মাৎস্য-ন্যায়ের নীতি চলতে দিয়ে মোটামুটি শান্তির পরিবেশ সৃষ্ট হবে, এ আশা করাও ভুল। কেবল আন্তর্জাতিক সৈন্যবল-সমর্থিত আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারাই তা

হওয়া সম্ভব। আর্থনীতিক ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্য নীতি (laissez faire) এখন কেউ আর সমর্থন করে না, কেবল কিছু স্বপ্নলোকবাসী ছাড়া যারা এখনো এর জন্য হাহুতাশ করে। পৃথিবীর জনসংখ্যা যতোই বিপুলতর হবে নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রয়োজনও ততোই বাড়বে। এটা দুঃখজনক সন্দেহ নেই, অডিসীর (Odissoy) জগৎ এর চেয়ে অনেক বেশী আকর্ষনীয় ছিল। এক দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে যাত্রা আর এক একটি পরমা সুন্দরী রমণীর স্বাগত অভ্যর্থনা লাভ করা। কিন্তু বর্তমানে দেশান্তরে বাসেচ্ছুদের কোটা (quota) বেঁধে দেওয়ায় এধরণের জীবনযাত্রা এখন ভারী কঠিন হয়েছে। ধরুন যদি দশ কোটি চীনেম্যান ক্যালিপ্সোর (Calypso) দ্বীপে অবতরণ করতো তা হলে নিশ্চয়ই তা জীবনযাত্রা পক্ষে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতো। মোটা নিয়ম হলো এই যে, যা একান্তভাবেই নিজের ব্যাপার তাতে স্বাধীনতা নিশ্চয়ই থাকা উচিত, তবে অপরের এলাকায় হস্তক্ষেপের স্বাধীনতা কারো নেই। কিন্তু যদিচ এই মোটা নিয়মটা দেখতে বেশ সহজ বাস্তবক্ষেত্রে এর প্রয়োগটা যথেষ্ট জটিল। কাজেই মানবিক স্বাধীনতার যথাযথ সীমা নির্দ্ধারণের সমস্যটা এখনো রয়েই গেছে।

যদিও আমি মানব-বিশ্ব ও বিশ্বের বৃহৎ ঘটনাবলি নিয়েই আজীবন ব্যাপৃত তবু আমি নিজেকে মুখ্যতঃ একজন আন্বীক্ষিক (abstract) দার্শনিক বলেই মনে করি। আমি অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের নির্ভুল প্রমাণ-নির্ভর পদ্ধতি সেইসব ক্ষেত্রে প্রয়োগের চেষ্টা করেছি যা এতদিন অনির্দ্দিষ্ট ভাবকল্পনার রাজ্য বলেই গণ্য হয়েছে। সুনির্দ্দিষ্টতা আমি পছন্দ করি। সুস্পষ্ট অবয়বরেখাও। ধোঁয়াটে অস্বচ্ছতা আমার অসহ্য। এ থেকে কেন জানি না অনেকে আমার সম্বন্ধে এই ধারণা পোষণ করেন যে, আমি লোকটি ভাবাবেগবর্জিত নিরুত্তাপ-হৃদয় মানুষ। হয়তো লোকে ভাবে যে, আবেগ অনুভব করা অর্থই আত্ম-প্রতারণায় সুখ পাওয়ার ক্ষমতা, এবং অন্য কোনো স্বর্গ আয়ত্তগম্য নয় বলে' নির্বোধের কল্পিত স্বর্গে বাসেচ্ছা। আমি এজাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষপাতী নই। আমি যতই কোনো কিছুতে আকৃষ্ট হই ততই সে বিষয়ে জানতেও আগ্রহী হই—তা সেই সত্য যতোই না কেন অপ্রীতিকর হোক। আমি যখন প্রথম দর্শন শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হই তখন ভেবেছিলাম ধর্মের জন্য আমার মনে যে এক অতৃপ্ত ও প্রতিহত পিপাসা বিদ্যমান তার কিছুটা এর দ্বারা নিবৃত্তি হবে। কিছুকাল আমি প্লেটোর সনাতন ভাব-জগতে (Plato's eternal world of ideas) কথঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ করেছিলামও কিন্তু শেষে মনে হলো এ একেবারে গাঁজাখুরি ব্যাপার। ধর্মবিশ্বাসের জন্য আমার চিত্তের তীব্র

আকুতির কোনো সংতৃপ্তিই দর্শন থেকে আমি পাই নি। এদিক দিয়ে দর্শন আমাকে হতাশই করেছে। কিন্তু তবু স্বচ্ছতা বিধায়ক (clarifier) হিসাবে আমার কাছে এর মূল্য খুবই বেশী। অল্পবয়সে যা আমার কাছে রুচি বা অনুমানের বিষয় বলে' গণ্য হতো এখন তা যথাযথ ও বিজ্ঞান-সম্মত বলে' সিদ্ধ। এতে আমি আনন্দিত। এবং এই পরিণামের অভিমুখে যেটুক কাজ আমি করতে পেরেছি তারই জন্য দর্শনের ক্ষেত্রে আমার ভূমিকা অসার্থক হয়নি বলেই আমি মনে করি।

কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে সূক্ষ্ম বিষয়ে মনঃসংযোগ ক্রমেই কঠিনতর হচ্ছে। দার্শনিকদের মনের উপরেও প্রাত্যহিক জগতের চাপ ক্রমেই বাড়ছে এবং গজদন্তমিনারগুলিও ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। মানবজাতির ভবিষ্যতের চিন্তা আমার সমগ্র মনকে তাই বেশী করে অধিকার করছে। আমি যে-সময়ে বড় হই সেটা ভিক্টোরীয় আশাবাদের ভরা জোয়ারের কাল। এবং যদিও সেদিনের খুশির মেজাজ আজ আর সম্ভব নয়, তবু সেদিন যা সহজ ছিল সেই আশাপ্রবণতার কিছু এখনো আমাতে অবশিষ্ট আছে। এখন অবশ্য তা আর সহজ নেই। এর জন্য প্রয়োজন এক বিশেষ মনোবল এবং এই বর্তমান মুহূর্ত পেরিয়ে দূর ভবিষ্যতে দৃষ্টি নিক্ষেপের ক্ষমতা। কিন্তু এ-বিশ্বাস আমার দৃঢ় যে, সামনে যতোই না কেন দুর্যোগের কালো দিন ঘনিয়ে আসুক মানুষ তা' উত্তীর্ণ হবেই, পরস্পরকে সহ্য করবার যে অভ্যাস আমরা প্রায় হারিয়ে ফেলেছি তাও আবার সে ফিরে পাবে, এবং নির্মম হানাহানির যুগ চিরস্থায়ী হবে না। প্রজ্ঞার বিবৃদ্ধি ব্যতিরেকে কলকৌশলের বিবৃদ্ধির ফলে মানুষের এখন নতুন পাঠ নেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। নীতির দাবি ও বুদ্ধির দাবি এখন জটিল অনুবিদ্ধ। অশুভ চিত্তবিক্ষোভের (evil passions) কারণে মানুষ তার সত্য দৃষ্টি হারিয়ে ফেলে, আবার মিথ্যা বিশ্বাস থেকে অশুভ চিত্তবিক্ষোভ জন্মে। বিশ্বকে যদি আলোকে ও কল্যাণে উত্তীর্ণ হতে হয় তা হলে স্বচ্ছ চিন্তা ও সহৃদয়তা দুয়েরই আবশ্যক। হয়তো চরম সর্বনাশের আগে এ-দুয়ের কোনোটাই তার শিক্ষা হবে না। তবে আমি আশা করি যে, অবস্থা এখনো ততটা খারাপ নয়। এর চেয়ে কম দুঃখ পেয়েই মানুষের শুভবুদ্ধির উদয় হবে। তবে আগে হোক পরে হোক, যে-কঠিন পথ দিয়েই সে শিক্ষালাভ করুক, নতুন পৃথিবীর নতুন প্রজ্ঞা সে আয়ত্ত করবে বলেই আমার বিশ্বাস। মানুষের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ভাগ তার ভবিষ্যতে, অতীতে নয়।

[বারট্রাণ্ড রাসেলের Portraits from Memory and Other Essays, (George Allen and Unwin, 1956) গ্রন্থ থেকে।]

অনুবাদক : তীর্থরেণু দাস

CENTRAL LIBRARY

পারস্য সাহিত্যের চিত্ররেখা

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

(৪)

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি, সাসানীয় রাজত্বের সমকালীন সাহিত্য হুজবারেশ থেকে মুক্ত ক'রে পাজেন্দ প্রণালীতেপড়লে যে ইরানী ভাষার পরিচয় মিলে তাই হচ্ছে পহ্‌লব্‌ী। এই পহ্‌লব্‌ীতে নিবদ্ধ সাহিত্য একান্তভাবে ধর্ম-নির্ভর। জরথুশ্‌ত্রীয় ধর্মের সমবেত প্রার্থনা, যজ্ঞ, যজ্ঞবেদী, নানাবিধ আচার এবং অনুষ্ঠানের দিশা দেখায় এই সাহিত্য। অবশ্য কিছু পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক রচনাও ছিল। সেলুকিদ সাম্রাজ্যে যে ভাষা নানাপ্রকার সামীপ্রভাবে কণ্টকাকীর্ণ হ'য়ে উঠেছিল, সেই ভাষা সাসানীয় যুগে বিদেশী প্রভাব থেকে মুক্ত হ'য়ে বিশুদ্ধ হ'য়ে উঠল। কিন্তু ভাষার এই শুদ্ধাচার চিরকালীন থেকে যেতে পারে না। কোন দেশে কোন ভাষার ভাগ্যেই তা ঘটে নি। ইরান আরব কর্তৃক বিজিত হ'ল ;—আরবী পার্সী মিশ্রণ তখন ভাষা ও সাহিত্যকে এক নবদিগন্তে টেনে নিয়ে গেল। আরব তখন নব প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মে উদ্দীপ্ত। আল্‌ ফখ্‌রীর প্রমাণ অনুসারে বলা চলে, আরবের ইরান-জয় ৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়েছিল। এই সময় শেষ ইরানী সম্রাট যজ্‌দি গির্দ (যজ্‌দ্‌-গ্রাহী বা আগ্নেশ্বর) ইরান থেকে পালিয়ে খোরাসানে যান।

আমরা যখন আধুনিক পার্সী বা ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য বলি তখন মুসলিম পারস্যের ভাষা ও সাহিত্যই বুঝি। তাতে লিপি আরবী। সুতরাং 'রুদ্‌গী'র মতো সহস্র বৎসরের পুরাতন কবিকেও আমরা আধুনিক পার্সী সাহিত্যের কবি বলব। এতে কিছুমাত্র ভুল হবে না, যেমন ভুল হয় না, শেক্‌সপীয়রকে আধুনিক ইংরেজী ভাষার লেখক বললে। ভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু তা অপরিচয়ের তিরস্করিণীতে আচ্ছন্ন হ'য়ে যায় নি। ফার্সী ভাষার হাজার বছরেও পরিবর্তন প্রায় হয়ই নি—এ কথায় উল্লেখ আমরা প্রাচীন পার্সী ও পহ্‌লব্‌ী ভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে একবার করে এসেছি। মূল ইরানী ভাষায় অবশ্যই উপভাষাগত পার্থক্য ছিল, কারণ সাম্রাজ্যটা ছিল বিস্তীর্ণ। ওই উপভাষাগুলির বিবর্তনে পশ্চিমে কুর্দিস্তানী, পূর্বে আধুনিক পুশতো, মাকরাণী ও বালোচী প্রভৃতি জন্মগ্রহণ ক'রেছে। তাছাড়া মূল ভূখণ্ডের ভাষাতেও সামান্য হলেও উপভাষাগত

বৈলক্ষণ্য কিছু কিছু চিরকালই ছিল। বিষয়টি স্পষ্ট করতে আমরা হমদানী বা হলুরী উপভাষায় রচিত একটি সঙ্গীত থেকে কিঞ্চিৎ অংশ উদ্ধৃত করছি।—এর কবি অন্তত হাজার বছর পূর্বে বর্তমান ছিলেন, নাম তাহির-ই-উরিয়ঁ।।

"চি খুশ বি মিহরবূনী অজ দূ সরবী
কি য়ক্ সর মিহরবূনী দরদ-ই-সরবী।
অগর মজহুঁ দিল-ই-শূরীদাই দাশ্ত
দিল-ই-লয়লা অজ্ উ শূরীদা-তর বী॥"

প্রেমনামক অনুভূতি যদি যুগপৎ দুটি মাথা থেকে আসে, তবে কী আনন্দ! একতরফা ভালবাসা শিরঃপীড়া। যদি বল, মজনুঁ প্রেমার্ত হৃদয় ধারণ ক'রেছে, তবে বলি, লয়লার হৃদয় অধিকতর প্রেমার্ত ছিল। এভাষা সম্পূর্ণরূপে ফার্সী, তবু লক্ষণীয় উপভাষিক বৈশিষ্ট্য—বুবুদ ক্রিয়ারূপ বী, মেহেরবাণী মিহরবুনী। আরও একটু অগ্রসর হচ্ছি—

"মগর শের উ পলঙ্গী আয় দিল আয় দিল
ব মূ দা'ইম বি-জঙ্গলী আয় দিল আয় দিল!
অগর দসতুম ফুতী, খূনত বি রিঝুম্
বি-বিহুম তা চি রন্গী, আয় দিল আয় দিল!

'ওরে হৃদয়! তুই নিশ্চয় সিংহ কি নেকড়ে, (একটা কিছু হিংস্র স্বভাবের নিশ্চয়ই) আমাদের সঙ্গে নিত্য চলেছিস লড়াই করে। তোকে ধরতে পারলে চূর্ণ করে ফেলতাম (ফত্-চূর্ণকরা) এবং তোর রক্ত ঝরিয়ে দিতাম; শেষে দেখতাম ওরে হৃদয়! তুই কোন রঙ্গে রঙ্গীন।' এখানেও সেই উপভাষাগত 'উ' প্রবণতা। ব-মা-বমূ। বিনম্ রিজম্ বিহুম্ রিঝুম।

আরব বিজয়ের ইতিহাসে আসা যাক। বাইজেনটিয়াম কৃষ্ণসাগরের প্রবেশের মুখে। এশিয়া ও য়ুরোপের সন্ধিস্থলে এ নগর প্রতিষ্ঠিত করেছিল গ্রীকরা। পরে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হোল রোমানদের। রোমসম্রাট Constantine একে পুনর্গঠিত ক'রে নাম দিলেন কনস্টান্টিনোপল। বর্ত্তমানে এটি 'ইস্তাম্বুল'। পশ্চিম এশিয়ার এই সন্ধিস্থলের জন্য একদা প্রচুর রক্তপাত হ'য়েছে। যুধ্যমান ছিল ইরানী আর তুরানী জাতি। এই দুটি জাতি দীর্ঘ দীর্ঘকাল অহিনকুল সংগ্রাম ক'রে মরেছে। সমগ্র পশ্চিম এশিয়া দলিত মথিত হ'য়েছে। কখনো তুর্কীর জয়, কখনও ইরানের জয়, কিন্তু বিজিত দেশগুলির ভাগ্য থেকেছে একই প্রকার—

তারা হয়েছে লুণ্ঠিত, হৃতসর্বস্ব এবং পরিণামে চরম দারিদ্র্যে অভিশপ্ত। আর বিজয়ী তুর্কী ও ইরান ? তাদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির মত এসেছে বিলাসিতা, অকর্মণ্যতা। শাসককুলে এসেছে স্বৈরাচারের সর্বনাশা অভিশাপ। এইবার ইতিহাসের পটপরিবর্তন হোল।

আরবের মরুরাজ্যে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একজন মানুষের জীবন যাত্রা শুরু হোল। দুঃখ, দুর্দশা, নির্যাতন, পীড়নের অভিজ্ঞতা নিয়ে নিয়ে তিনি খাঁটি কর্মী এবং পরিণামে বুদ্ধির উপরে যে বোধি, সেই বোধির বলে দিব্যদর্শী নেতায় পরিণত হ'লেন। ক্রমশ অবস্থা তাঁকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। তিনি অনুপ্রাণিত হ'য়ে যা দর্শন করেছিলেন, অকপটে তাই লোকসমক্ষে প্রচার করলেন। ফল হোল আশাতীত। খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত আরব এক ধর্মের বাণীতে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হোল। দুঃখ পেলে অনুভব ক'রো এক আল্লার কোমল স্পর্শেই তা দূরে যেতে পারে, সুখ পেলে উপলব্ধি করো-তিনিই সর্বসুখের দাতা, তিনিই করুণাময়, তিনিই সর্বশক্তিমান্—তিনিই সকলের উপরে—

"ও ই আমসাকিল্লাহো বে স্বরে, ফা লা কশিফা লাহু ইল্লাহু
ওই আম সাক বে খয়ের, ফাতুয়া আলাকুল্লে শয়ী কারা।"
আল্লা হু রহমান রহীম, আল্লা হু আকবর॥"

এই নব ধর্মের উদ্‌গাতা বললেন—সুদৃঢ় বিশ্বাস রেখে নির্ভীকভাবে কর্মকর ; কর্মফলদাতা স্বয়ং ঈশ্বর ! সাম্য ও সৌভ্রাত্রই জীবন। এর ফলে সপ্তম শতাব্দীর আদর্শভ্রষ্ট খ্রীষ্টধর্ম, ক্ষয়িষ্ণু অগ্নিউপাসক জরথুস্ত্রীয় ধর্ম, এবং আত্মকলহে-দুর্বল য়িহুদী ধর্ম কোন প্রতিরোধ করতে পারল না—হজরত মহম্মদের পরে যাঁরা প্রকৃত খলিফা—'খোলফায়ে রাশেদীন্'—সেই খলিফা চতুষ্টয়ের জীবন ছিল সর্বকালের সর্ব মানুষের আদর্শস্থল। আরবের মানুষরাও তৈরী হ'য়েছিল সেদিন বিলাস ও বাহুল্য বর্জিত জাতিরূপে—আচরণে সদানন্দ, আলাপে সুরসিক। কিন্তু সে জাতি অত্যন্ত আত্মসচেতন এবং বাধার সম্মুখে নিষ্ঠুর ও ক্ষমাহীন।

না, তখনও ইরানে প্রাচীন ধর্মগুলির মূলোচ্ছেদ হয়নি। প্রথমদিকে বিধর্মীর উপর জুলুমও ছিল না। বিধর্মীদের এক প্রকার ঢালাও কর দিতে হ'ত, তার নাম 'জিজীয়া'। এই করের তাৎপর্য বলছি। মুসলমান হ'লেই নিত্য এবং নৈমিত্তিকরূপে এই পাঁচটি কর্ম অবশ্য করণীয়—যার নাম 'ফর্‌জ'। নমাজ, রোজা, জাকাত, হজ এবং জিহাদ। প্রার্থনা, উপবাস, নিত্যদান, তীর্থদর্শন এবং প্রয়োজনে ধর্মযুদ্ধ। এই পাঁচটির কোন একটিও বিধর্মীর উপর কর্তব্যরূপে

আরোপিত হত না বলেই এই রাজনৈতিক কর। ইসলাম ধর্মে ধর্মনীতি রাজনীতি আলাদা নয় স্মরণ রাখা ভাল। জিজীয়া শব্দটি আর্মানী শব্দ, আরবীও নয়, পার্সীও নয়। আরমানী শব্দটা 'গজীৎ'—আর্মানী মসগীত্ হ'য়েছে আরবী মসজিদ্ আর গজীত্ হ'য়েছে জিজীয়া।

এই বিজয়ের মহা আড়ম্বরেও সাহিত্যের দিকে,—রাজ্য পরিচালনার দিকে, রাজস্বের বিধি বিধানের দিকে আরবের দেবার কিছুই ছিল না। ওরা এ সব বিষয়ে বিজিত ইরানের সাহায্য নিয়েছে। ভাষা সম্বন্ধে অবশ্য আরবের দম্ভ ছিল খুব। 'আরব' শব্দের একটি অর্থই হচ্ছে সেই জাতি যে ভাষার দিকে দরাজ—eloquent. তারা অন্যান্য ভাষাকে দরিদ্র মনে করত। আত্মসচেতন জাতিগুলির এই প্রকার ভাষার অহঙ্কার থাকে। গ্রীকরা অগ্রীকদের জানতো 'Barbaros' বা অস্পষ্টভাষী অসভ্য বলে। ভারতীয় আর্যরা তাদের দেব-ভাষার বড়াই নিয়ে একদা অন্য ভাষা ব্যবহার করার নিষেধ জারী ক'রেছিল—'ন ম্লেচ্ছতবৈ নাপ ভাষিতবৈ' ম্লেচ্ছ কথা বলো না, অপভাষা ব্যবহার ক'রো না। যাক এ কথা স্বীকার করি, আরবীভাষার শব্দভাণ্ডারে অজস্র শব্দ আছে। বড় বেশি আছে। তাই বুদ্ধিমান আওরঙ্গজেব একদা খেদ ক'রেছিলেন—'আমার শৈশব এবং বাল্য আরবীশব্দের ব্যূহে না কাটালে—কোন ক্ষতি হোত না'—"He learnt Arabic, wasting—as later he complained—the precious hours of his youth—in the dry, unprofitable and never ending task of learning words—Aurangzeb, Elizabeth D'oyley."

যে যুগের কথা বলছিলাম সে যুগে সাহিত্য ও চিন্তার রাজ্য থেকে ইরানকে দেবার কিছুই আরবের ছিল না। তারা ধর্ম দিয়েছিল একথা সত্য। আর এ কথাও সত্য নবযুগের পার্সীভাষা আরবীভাষার শব্দভাণ্ডারে বলিষ্ঠ হয়ে উঠলো। দুইয়ের মেশামেশি হয়ে গেল। এমন হওয়াই স্বাভাবিক। যে পার্সীভাষা ইতিপূর্বেকার বিদেশী সেলুকিদ শাসনে আরামাইক উপাদানে বিমিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল আবার তাতে সিরীয় ও কল্‌দীয় উপাদানেরও অভাব ছিল না—কারণ ও দুটি ভাষা আরামাইকে সর্বদা বিচ্ছুরিত হোত; সেই ইরান এখন ভাষায় আরবী পোশাক পরে ফেলল। এইবার আরবী রীতিতে, আরবী লিপিতে, আরবী মিশ্রিত পার্সীভাষার নতুন আবর্তন আরম্ভ হোল। এই যুগের নাম ইসলামী যুগ।

অতঃপর আমরা এই ইসলামী যুগের সাহিত্যের পরিচয় দিতে অগ্রসর

হচ্ছি। এই ইসলামী যুগেও মাঝে মাঝে ইরানী কবিদের ইচ্ছা হয়েছে তাদের মাতৃভাষার বিশুদ্ধ রূপ তাঁরা উপাসনা করবেন। কিন্তু সমতলের গঙ্গাধারাকে কি কখনো পাহাড়ের চূড়ায় তোলা যায়? ভাষা যখন ভিতরের মন এবং বাহিরের জিহ্বাকে কবজা করে ফেলে, তখন পুরাতনে ফিরে যাওয়া যে কী কষ্টসাধ্য কৃত্রিম যুদ্ধ, তা আমরা জানি। আমরা কি আর কখনো বিশুদ্ধ তৎসম, তদ্ভব এবং দেশি শব্দের সাহায্য নিয়েই বাংলায় কথা বলতে পারব? সিদ্ধাচার্যরা সহস্রবৎসর পূর্বে যা পেরেছিলেন, আমরা তা পারিনে। আমাদের কথার মধ্যে অনিবার্য বেগে আসবে পার্সী-আরবী তুর্কী পর্তুগীস ইংরেজী শব্দমালা। শুধু তাই নয়, আমাদের কথার মধ্যে এসে যাবে ইংরেজী কায়দা, ইংরেজী প্রসাধন। শব্দভাণ্ডারে তো বাংলা পার্সী ও ইংরেজীতে ভরপুর। একাদশ শতাব্দীতে ইরানী কবি ফেরদৌসী চেয়েছিলেন তাঁর শাহ্‌নামা রচনা করবেন বিশুদ্ধ পার্সী শব্দ দিয়ে তাতে কোন বিদেশী উপাদানের স্পর্শও থাকবে না। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি বাধ্য হয়েছিলেন অনেক শব্দ নিতে যে গুলি পার্সী হ'লেও সূক্ষ্মসন্ধানে বিদেশী-মূল শব্দ ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

এই প্রসঙ্গে পার্সীতে ব্যবহৃত কতগুলি বৈদেশিক শব্দ তুলে ধরতে চাই। এই শব্দগুলি আরবীর মধ্য দিয়ে পার্সীতে এলেও মূল তাদের অন্যত্র—আরবে নয়।

(১) পার্সী—আবনুস মূলে গ্রীক ebenos, গ্রীক eben মানে পাথর। পাথরের মত শক্ত কালো কাঠ। শব্দটি আফ্রিকার মনে হয়। 'হাব্‌স' আরবীতে আবেসেনীয়া। পার্সী আবনুস ইংরেজী Ebony.

(২) পার্সী কইস্বর Caesar ছাড়া কিছু নয়। রোমান সমরনায়ক জৈবকী Caius থেকে সীজর। জার্মান কথা Kaiser. গথিক—kaisar-রুশী czar.

(৩) আল্‌ কী মী আ বা শুধু কীমীআ আরবী এবং পার্সী শব্দ। গ্রীক Alchemy ইংরেজী Chemistryর মূল। শব্দটি মূলে মিসরের 'খেম'। ওরাই প্রথম অন্য ধাতুকে সোনায় আনতে চায় এবং জীবনরসায়ন তৈরী করতে চায়। ইন্দ্রজালের রাজ্য ছিল Egypt.

(৪) গ্রীক কথা ছিল Kānon যার অর্থ মূলে অবক্র সরল দণ্ড-তাই শাসনদণ্ড।—এর থেকে আরবী এবং পারসীতে কানূন্।

(৫) গ্রীক কথা diadēma—dia=round dēom=bend রাজমস্তকে আবদ্ধ সূত্র, বস্ত্র, অলঙ্কার, সর্বশেষে ইংরেজী diadem—রাজমুকুট। শব্দটি পার্সীতে গতি নিয়েছিল দীহীম রূপে।

(৬) আর্মানী শব্দ গজীত্ হ'য়েছিল আরবী পার্সীতে জিজীয়া।

(৭) আরবী পার্সী ত্বিলসম্—গ্রীক telein অর্থ মন্ত্রপুত-সূক্ষ্মফলপ্রদ বস্তু —ইংরেজী Talisman.

(৮) 'দীনার' আরবীপার্সী—এর পুরাতনরূপ 'দিন্নার'। শব্দটি লাতীন Denarius.

(৯) আরবীফার্সী—সন্দাল চন্দন কাষ্ঠ বা চন্দন। মূলে ভারতীয় শব্দ 'চন্দন' —এরও মূল, মনে হয় দ্রাবিড় ভাষায় আছে। দক্ষিণভারতের জিনিস এটি—আধুনিক তামিল চান্তু (cāntu) চন্দনবৃক্ষ। রুমী দুনিয়া ভারত থেকে এই জিনিস নিয়েছিল। লাতীন 'সন্দালুম', ইংরেজী sandal (wood).

এই ইসলামী যুগের সাহিত্যের রসগ্রহণ করতে হোলে প্রাচীন ইরানী সংস্কারগুলি নিয়ে থাকলে চলবে না। আমার বক্তব্য, এই নব যুগের পারসী সাহিত্য নবধর্মের সঙ্গে জড়িত হ'য়ে গেল। মুসলিম ধর্মশাস্ত্র, সুবিস্তৃত সেমীয় পুরাণ কাহিনী এবং মুসলিম আচার-আচরণের জ্ঞানে এবং প্রয়োজন স্থলে অভিজ্ঞতাকে সোপান ক'রে এই সুবিপুল সাহিত্যভাণ্ডারে প্রবেশ করতে হয়; নতুবা মর্ম উদ্ঘাটন অসম্ভব। এই সাহিত্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে সমগ্র পশ্চিম এসিয়া এবং পূর্ব এসিয়ার ইতিহাস, মিসরাইন্ (Egypt) ও পশ্চিম য়ুরোপের ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে—সিন্ধুনদের অপর তীরের এই সুবিপুল ভারতবর্ষ। দুনিয়ার একটা সুবৃহৎ অংশ, তার রাজ্য ও সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন এই সাহিত্যের সঙ্গে অনিবার্যভাবেই সংপৃক্ত হয়ে গিয়েছে। দিগ্বিজয় ও লুণ্ঠন, সংগ্রাম ও সন্ধি, বিদ্রোহ ও শান্তি, সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের নির্মম নিষ্ঠুর রক্তপ্লাবন অনেক কিছুই বিজড়িত এই সাহিত্যের ইতিহাসে। এই প্রসঙ্গে সুন্নী উম্মাইদ ও শিয়া আব্বাসীয় খলিফাদের সাম্প্রদায়িক লড়াইর কথা মনে আসছে; আর মনে আসছে—ইরানের উপর দিয়ে—মঙ্গোল ও তুর্কীদের লুণ্ঠন ও তাণ্ডবের কথা। বাগদাদে শেষ আব্বাসীয় খলিফা আল্ মুস্তাসিমের সপরিবারে নিধনের কথা। এক কথায় সুদীর্ঘ কাল ও সুবিপুল দেশ সংবদ্ধ হ'য়ে আছে এই তৃতীয় পর্যায়ের পারসী সাহিত্যের সঙ্গে।

এহো বাহ্য। ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল থেকে দার্শনিক বলয়রেখা, আকাশের ইন্দ্রধনুর মত আমাদের অভিভূত করে রাখে। এক সময় ইরানে সূফী ধর্মের প্লাবন এসেছিল। প্রথমশ্রেণীর বহুকবি তাঁদের কাব্য সাধনা এবং অধ্যাত্ম সাধনার সমন্বয় করতে পেরেছিলেন। মনন ও অধ্যাত্ম চেতনার দিক দিয়ে সে যুগ সত্যই অতুলনীয়। সে সাহিত্য প্রেমের টানে উপচে পড়া মাধুর্যের

পরিপ্লব। সে সাহিত্যের কবি বলেন—মজহাব-এ-ইশ্‌ক দারম্—আমার ধর্ম একটি, সে ধর্মের নাম প্রেম। সেই কবি আবার বলেন আমার ভালবাসার এই পৃথিবী ছেড়ে আমি স্বর্গে যেতে চাইনে। "বরতর অজ গরদুঁ মোকামে আদম অস্ত"—। মানুষের বাসস্থান—এই মাটীর পৃথিবী স্বর্গ থেকে বড়। আর এক প্রেমের সাধক সগর্বে বলেছিলেন,—সাম্প্রদায়িক মোল্লারা কোরানের অস্থিপঞ্জর নিয়ে কুকুরের মত লড়াই করছে, আমি সুখী; আমি কোরানের মগজটা তুলে নিয়েছি। হাড়গুলি কুকুরের সম্মুখে নিক্ষেপ করেছি। 'মন্ জ কোরান মগ্‌জ রা বরদাশতম্, উস্তখোয়ান্ পেশে সগান্ আনদাখ্‌তম্"। ইরানের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য এই সুফী সাহিত্য। এই সাহিত্যে প্রেমের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা। দিব্য প্রেরণা সেখানে সুরা, প্রেমের গুরু সেখানে সাকী, বিষয় সেখানে অপার্থিব প্রেম সম্ভোগ।

এই নবধর্ম কোরানের বাণীর প্রতিকূল কিছু নয়। তার আচারে এবং আচরণে যে বিদ্রোহ আভাসিত হ'য়ে ওঠে, রহস্যের আবরণ উন্মুক্ত হ'লে তা নির্বিরোধ শান্তি এবং আনন্দে লয় প্রাপ্ত হয়। সর্বশক্তিমান প্রেমময় আল্লা তালায় আত্মসমর্পণের নাম 'ফানা' সেই ফানাই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। সে আসে প্রেমের মধ্য দিয়ে। এই নব দৃষ্টিভঙ্গীর প্রথম উন্মেষ আরবে, তার প্রসার ইরানের মধ্য দিয়ে হ'য়ে দূর দিগন্তে বিস্তৃত হ ল। মনে হয় তার শেষ পরিণাম এই ভারতবর্ষে। আল্‌বার, বৈষ্ণব এবং আউলিয়াদের গ্রন্থিবন্ধনে সে পরিণাম বড় মধুর, বড় সুন্দর হ'য়ে দেখা দিয়েছিল।— (ক্রমশঃ)

'আলেখ্য'র পুরানো সংখ্যা এখনো কিছু পাওয়া যায়। মূল্য প্রতি কপি দুই টাকা মাত্র। বাঁধানো 'আলেখ্য'র সেট—১ম, ২য় ও ৩য়—১৫৲ প্রতিখণ্ড
৪র্থ ও ৫ম—১৩৲ প্রতিখণ্ড

হজরত আমীর খুসরু দেহল্‌ভী

(১২৫৩-১৩২৫)

জগদীশ নারায়ণ সরকার

[২]

আমীর খুসরু ও ভারতবর্ষ

আমার মনে হয় আমীর খুসরুর মহত্ত্ব তাঁর বহুমুখী প্রতিভা, গদ্য ও পদ্যে সমতুল্য সাহিত্যিক দক্ষতা, ইতিহাস-রচনাশৈলী, সংস্কৃতি সম্পন্ন, সভাসদ সুলভ মার্জিত কলাকৌশল, সুফী অতীন্দ্রিয়বাদ, সঙ্গীতে পারদর্শিতা ইত্যাদির জন্য ততটা নয়, যতটা তাঁর ভারতবর্ষের প্রতি প্রীতির মনোভাব, ও ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল্যবোধের জন্য। দরবারী আবহাওয়ায় পুষ্ট, মার্জিত রুচিসম্পন্ন সভাসদ হয়েও খুসরু কখনও জনজীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখেন নি। তাঁর ভারতবর্ষীয় জীবনধারা ও কৃষ্টির প্রশস্তিতেই এটা প্রতিপন্ন হয়। হিন্দুরধর্ম ও বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে আবু-রৈহান-অল বিরুণীর নিরপেক্ষ বুদ্ধি-জীবীসুলভ কৌতূহল, এবং ঐ সব বিষয়ে আকবরের গভীর ও স্থায়ী উৎসাহ—এ দুই এর মাঝখানে আমীর খুসরুর ভারত সংক্রান্ত তাবৎ বিষয়ে অকৃত্রিম অনুরাগ সশ্রদ্ধ উল্লেখ্যের যোগ্য। আজিজ অহমদের সহিত সকলেই একমত হবেন যে, নিজে তুর্কী (তুর্ক-উল্লাহ) হইয়াও খুসরু ছিলেন সম্ভবতঃ প্রথম ভারতীয় তুর্কী ('তুর্ক-ই হিন্দুস্তানী') এবং প্রথম ভারতীয় মুসলমান যিনি মাতৃকুলের মাধ্যমে নিজেকে ভারতীয় হিসাবে গণ্য করে গৌরববোধ করতেন। বিদেশ থেকে আগত ভারতে বসবাসকারীর সন্তান হলেও বৈদেশিক বন্ধন ভুলে ভারতবর্ষকেই তিনি নিজের মাতৃভূমি বলে' মনে করতেন। ভারতই যে ভূস্বর্গ তার সাতটি কারণ তিনি দেখিয়েছেন। (১,২,৩) ইডেন (স্বর্গোদ্যান) থেকে বিতাড়িত হ'বার পর সর্বত্রই অসুখী হ'য়ে আদম অবশেষে ভারতেই আশ্রয় পেয়েছিলেন। ভারত ছিল সর্পেরও শেষ আশ্রয়; (৪) ভারত নন্দনকাননের পাখী ময়ূরের বাসস্থান। (ময়ূরই স্বাধীন ভারতের জাতীয় পাখী বলে পরিগণিত হয়েছে) (৫) ভারতের পুষ্পরাজি সুরভি-পূর্ণ কিন্তু পারস্য বা অন্যস্থানের কুসুম গন্ধহীন, (৬) কথিত আছে পয়গম্বর বলেছিলেন পার্থিব সুখ সত্য বিশ্বাসীদের জন্য নয়, অবিশ্বাসীদের জন্য, কিন্তু অবিশ্বাসীরা

CENTRAL LIBRARY

পরলোকে স্বর্গীয় সুখভোগ করবে না ; তাই অবিশ্বাসী হিন্দুদের ভাগ্যেই ভারত-স্বর্গ পড়েছে ; (৭) ভারত পরম সুখপুর্ণ স্থান, কেননা এর শাসক তাঁরই পৃষ্ঠ-পোষক কুতুবুদ্দীন মবারক (নুহ্ সিপিহর)। এ ছাড়া ভারত দশটি কারণে খোরাসান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর (১) ভারতের আবহাওয়া খোরাসানের মত শীত প্রধান নয় ; (২) এখানে লোক মারা যায় শৈত্য প্রবাহে উত্তাপের আতিশয্যে নয়, (৩) এখানে পোষাক পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা কম ও জীবিকা নির্ব্বাহ সস্তা ; (৪) ভারত চির সবুজ, কিন্তু খোরাসানে বসন্ত ঋতু ক্ষণস্থায়ী, মাত্র কয়েক সপ্তাহ ব্যাপী ; (৫) ভারতীয় পুষ্পরাজি বর্ণাঢ্য ও সুরভিত। খোরাসানী কুসুমে আছে মাত্র বর্ণবৈচিত্র্য ; (৬) শুকিয়ে যাবার পরও ভারতীয় পুষ্পে সুগন্ধ বজায় থাকে ; (৭) খোরাসানে কদলী ফল পাওয়া যায় না ; (৮) কিন্তু খোরাসানী ফল ভারতে উৎপন্ন হয় ; (৯) ভারতের একটী দুর্লভ ফল (কদলী) ও (১০) একটী অসাধারণ পত্র (পান) পাওয়া যায় (নুহ সিপিহ্র্)। সম্ভবতঃ এই ভারত-প্রশস্তি রাজনৈতিক রীতি-অনুযায়ী ছিল, কেননা নুহ্ সিপিহ্র সুলতান কুতুবুদ্দীন মবারকের আদেশানুযায়ীই রচিত হয়েছিল ও তাঁর প্রিয়পাত্র খুসরু খান শুধু একজন ধর্মান্তরিত হিন্দুই ছিলেন না, রাজদরবারে সর্বশক্তিমানও ছিলেন।

আমীর খুসরু প্রশংসা করে গেছেন দিল্লীর,—তাঁর পৃষ্ঠপোষকের রাজধানীর, —যে দিল্লী মসজিদ, সুন্দরী নারী, জাঁকজমক ও পাণ্ডিত্যের জন্য বোখারা, খোয়ারিজম, ও বাগদাদকেও অতিক্রম করেছিল(দ্রঃ 'কিরান্ উস্ সদাইন্' ও 'নুহ সিপিহ্র্') তিনি প্রশংসা করেছেন ভারতের উদ্ভিদের ও প্রাণিকুলের। যে ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন তা হ'চ্ছে 'হিন্দ্বী' অর্থাৎ ফার্সীও হিন্দী এই দ্বিভাষার সংমিশ্রণ। তিনি আরবী ভাষা জানতেন না এই অজুহাতে তিনি চাইতেন যে তাঁকে যেন 'হিন্দবী'তেই প্রশ্ন করা হয়।

ভারতবর্ষের প্রতি খুসরুর মনোভাব বিশ্লেষণ করলে আমরা বিপরীত-ধর্মী টানা-পোড়েন বা দ্বি-ধারার ইঙ্গিত পাই। কখনও কখনও তিনি প্রথাগত হিন্দু বিরোধী ভাষা ও রচনা শৈলী ব্যবহার করেছেন। একজন সভাসদ, মুস্লিম সুলতানের সভাকবি ও তৎকালীন মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে বোধ হয় তাই নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল।

একদিকে তিনি হিন্দুধর্ম ও মুস্লিম শাসনের প্রতি হিন্দু প্রতিরোধ, এই দুইয়ের প্রতিই প্রতিকূলতা দেখিয়েছেন। অন্যদিকে ('আশিকা' গ্রন্থে) তিনি ভারতীয় পুষ্পরাজির, বিবিধ মশলার, উজ্জ্বল সূর্য্য ও পাণ্ডুর শীতল

চন্দ্রালোকের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু যে ভারতকে তিনি ভালবাসতেন তা হ'ল ইস্‌লামের দেশ, যেখানে হিন্দুধর্ম অবনমিত ও শরিয়া (মুস্লিম আইন) দৃঢ়ভাবে স্থাপিত (Ex. D. iii. 546) হিন্দুরা যে তুর্কীদের সর্বদাই পদানত হবে এটা তাঁর মতে ছিল স্বতঃসিদ্ধ (নুহ্‌ সিপিহর)। 'ভগবান না করুন সুলতানের রাজ্য যেন কখনো কৃষ্ণ-বর্ণ হিন্দুদের করতলগত না হয় (মালো-উল্‌ আনওয়ার)। খোরাসানীরা প্রত্যেক হিন্দুকেই নির্বোধ ভাবে ও 'পান'কে ঘাস বলে' মনে করে (আশিকা, Ex. D iii 552) হিন্দুদের মানুষ বলে মনে করো না,—কেননা তারা গরুর পূজা করে,কাকাতুয়ার চেয়ে কাককেই শ্রেষ্ঠ বলে ভাবে, ও গাধার ডাককে শুভাশুভের পূর্বলক্ষণ সূচক মনে করে (B, M. MS. দ্রঃ Aziz. Ahmad, 117)।

অন্য দিকে তিনি ভারতীয় পরিবেশের প্রতিও সানন্দে সাড়া দিয়েছেন। তিনি ইসলামী, বরণী বা আফিফের মত কট্টর গোঁড়া ছিলেন না। সাহসিকতার জন্য তিনি হিন্দুদের প্রশংসা করেছেন, তারা দশানন, দৈত্যের মত যুদ্ধ কর্তে পারে ('তুঘলকনামা')। এবং বিদেশীদের বিরুদ্ধে তিনি হিন্দুদের পক্ষই সমর্থন করেছেন। (১) যুক্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞানসমূহে, ন্যায়শাস্ত্রে গণিতে ও জ্যোতিষে ব্রাহ্মণরা গ্রীকদের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়, কিন্তু তারা মুস্লিম আইন সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাদের জ্ঞান বিশ্বে অজ্ঞাতই রয়ে গেছে, কেননা মুসলমানরা এবিষয়ে ব্রতী হয় নাই। তবে খুসরু দাবী করেছেন যে তিনি ব্রাহ্মণদের কিছু কিছু গুপ্তবিদ্যা জানেন (নুহ সিপিহর্‌ ১৬১-৩)। (২) ব্রাহ্মণদের ধর্মের সারাংশ ইসলামেরই অনুরূপ ;—একেশ্বরবাদ, জীবন ও বিলয় তত্ত্ব এবং ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি (নুহ সিপিহর ১৬৩-৪); (৩) অজ্ঞবাদী, নাস্তিক, দ্বৈতবাদী ও খৃষ্টান প্রভৃতি অবিশ্বাসীদের চেয়ে হিন্দুরা শ্রেষ্ঠতর (নুহ সিপিহর ১৬৫-৬); (৪) হিন্দুদের পৌত্তলিকতা উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ, নব প্রবর্তিত বস্তু নয় ; (৫) অন্যদেশীয়-দের অপেক্ষাও ভারতীয়েরা শ্রেষ্ঠতর। তিনি এর দশটী কারণ উল্লেখ করেছেন।

(ক) ভারতীয়গণ অন্য দেশের বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করেন কিন্তু বিদেশীয়েরা ভারতীয় বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ।

(খ) ভারতীয়েরা বিদেশী ভাষা বলতে পারেন, কিন্তু বিদেশীয়রা ভারতীয় ভাষা শেখবার চেষ্টা করেন না।

(গ) পৃথিবীর নানা অংশ থেকে লোকেরা ভারতে শিক্ষালাভে কর্তে আসেন কিন্তু কোনও ব্রাহ্মণ এ জন্য বিদেশে যান না ;

(ঘ) গণিতে যা আমরা আর্‌বী সংখ্যা বলে জানি, বিশেষতঃ শূন্য (০),

তাদের উৎপত্তি ভারতে ;

(ঙ) নীতি ও গল্পে—'কলিলা ওয়া দিমনা' ভারতেই রচিত হয়েছিল ;

(চ) দাবা (শতরঞ্চ) আবিষ্কৃত হয়েছিল ভারতে ।

(ছ) উল্লিখিত তিনটীই হচ্ছে পৃথিবীর সভ্যতায় ভারতের অবদান ।

(জ) ভারতীয় সঙ্গীত প্রাণবন্ত ও মর্মস্পর্শী, এবং আয়ত্ত করা কঠিন ।

(ঝ) হিন্দুরা ভাবে এই সঙ্গীত শুধু মানুষকেই নয় পশুদেরও মুগ্ধ করে ।

(ঞ) অন্য কোনও দেশ খুসরুর মত কবির গর্ব করতে পারে না । (হুহ্ সিপিহর্ ১৬৬-৭২) ।

এতদ্ব্যতীত আমীর খুসরু হিন্দুদের সতীদাহ প্রথা (পুরুষের প্রতি নারীর প্রেম) ও জহরব্রতকে (প্রভু বা দেবমূর্ত্তির জন্য মানুষের মৃত্যুবরণ) বীরোচিত বলে মনে করেন, যদিও এগুলি কুসংস্কারমূলক ও ঐন্দ্রজালিক ।

(হুহ সিপিহর্ ১৯৪-৫ ; খ্ াজাইন)

এবং আমীর খুসরু যে ভারতীয় ভাব দ্বারা নিষিক্ত হয়েছিলেন তার প্রকাশ আমরা পাই তাঁর সাহিত্যিক সমন্বয়ে,—ফার্সী ও ব্রজভাষায় লিখিত দোহা ও গানে ; হিন্দী কাব্যে ফার্সী ছন্দের উপপ্রয়োগে ; সঙ্গীতে তিনি যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়সূচক নূতনত্বের প্রবর্তন করেছিলেন তাতে, যেমন সেতার (ভারতীয় বীণা ও ইরানীয় তম্বুরার সংমিশ্রণ ; মৃদঙ্গ (তবলা) ; নতুন ইন্দো-পারসিক সুর-লহরী (সাজ্গরি, জিলাফ, উশ্শাক্) ।

খুসরুর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী :—

আমীর খুসরু জনসাধারণের অবস্থা, এবং কৃষি ও কৃষক ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু কিছু উল্লেখ করেছেন । কৃষকদের কল্যাণ যে পরম প্রয়োজন তাও তিনি বিশ্বাস করতেন । এমন কি সেই সামন্ততান্ত্রিক যুগেও তিনি মনে করতেন যে তারাই ছিল সমাজের মেরুদণ্ড । তাঁর 'ইজাজ্ ই খুসরভি' গ্রন্থই এই মনোভাবের উদাহরণ । ফ্রান্সের Physiocrats ও শের শাহের মনোভাবের সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে রায়ত (কৃষক)দের উন্নতির উপর । কৃষকদের সর্বনাশ হ'লে রাজ্যও বিনষ্ট হয় । সাধারণ মানুষের চেয়ে সুলতানগণ কোনও বেশী দামী উপাদানে তৈরী ন'ন । সুখ কেবল মাত্র সুলতানদেরই সম্পত্তি নয় । আমরা সবাই একই খনির রত্ন । ন্যায়বিচারের তত্ত্বাবধায়ক, অসাধু কাজিদের সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে তিনি লিখেছেন যে, তাদের মনোভাব অনমনীয় ও তারা যুক্তির কোনও ধার ধারেন না ; তাঁরা প্রাসাদ

তৈরী করেছেন উৎকোচ গ্রহণ করে'। খুসরু এমনভাবে কালোবাজারী ও মালের মজুতদারীর কথা লিখেছেন যা বর্তমানকালের সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। বাজার থেকে শস্যকণা উধাও হ'য়ে গেছে কিন্তু তা সর্বত্র মজুত আছে। কৃষক-দের শোষণ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন যে রাজমুকুটের প্রতিটি মুক্তা হ'চ্ছে দরিদ্র কৃষকের জমাট অশ্রু ও রক্তবিন্দু মাত্র ('কুল্লীয়াৎ ই আমীর খুসরু')। বিংশ শতাব্দীর কোনও সমাজবাদী লেখকও এর চেয়ে বেশী স্পষ্ট বক্তা হ'তে পারবেন না। এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাবে যে, আমীর খুসরু তাঁর কালের প্রশাসনিক দুর্নীতির ও শোষিত জনগণের দুঃখের সমালোচনা করতে ভয় পাননি। এ বিষয়ে তাঁর অসন্তুষ্ট মনোভাব তিনি ব্যক্ত ক'রে গেছেন।

সর্ব্বশেষে বিখ্যাত চিস্তীয় সুফী ফকির নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সাথে খুসরুর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের মধ্যেও জন মানসে তাঁর বিপুল প্রভাবের কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। দৌলত শাহ সমরকন্দী খুসরুর উচ্চ প্রশস্তি করে' তাঁকে 'দর্‌-ই-দরিয়া-ই-ইরফান্‌ (আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সমুদ্রের রত্ন) বলেছেন। সুফী সম্প্রদায়ে খুসরুর যথাবিহিত দীক্ষার কথা 'আফজল-অল্‌-ফওয়াইদ্‌' গ্রন্থে উল্লেখিত আছে। সন্ত নিজামুদ্দীন তাঁকে 'তুর্ক আল্লাহ' (ঈশ্বরের তুর্কী) নামে অভিহিত করেন। তাঁর কবিতা ও মসনভীগুলি ('তসঃউফ') অতীন্দ্রিয়বাদ-এর স্পর্শে পরিপূর্ণ।

পীর ও মুরিদ্‌ (শিষ্য) পাশাপাশি সমাধিতে শায়িত আছেন। আজও তাঁদের 'উর্‌স্‌' উৎসব যে প্রগাঢ় ভক্তি ও উৎসাহ সহকারে উদ্‌যাপিত হয়, যা বর্তমান যুগের উপর খুসরুর প্রভাবের নিদর্শন। দেশের সাংস্কৃতিক ঐক্য ও অখণ্ডতার জন্য অন্যান্য মধ্যযুগীয় সুফী ও অতীন্দ্রিয়বাদী সাধুসন্তগণ সাধনা করে গেছেন। তাঁদের সঙ্গে আমীর খুসরুও তসঃউফের মাধ্যমে এক স্মরণীয় স্থান অধিকার করে আছেন। এবং ভারতে সাংস্কৃতিক মিলনের প্রবক্তা হিসাবেও আমীর খুসরু এক অমর উত্তরাধিকার রেখে গেছেন আমাদের জন্য।

(সমাপ্ত)

CENTRAL LIBRARY

মুখ

বীতশোক ভট্টাচার্য

অ.

অন্ধকার একটি মুখ অরণ্যের
পাহাড় থেকে একটি মুখ শরণ নেয় ;
একটি মুখ ক্ষমার মতো সমুদ্রের ;

রুদ্র, তোমার দক্ষিণের মুখ দেখাও।
আনন, আনন, আনন, আনন ; কী ঝংকার !

বীণার তারে একটি পশুর দন্তাঘাত :
আত্মা ক্ষীণ বেরিয়ে আসে, তীব্র তাই ,
গূঢ় মানুষ, ওঁ জান্তব সুর শেখায় :
কিন্তু কই, সে পথ কই, সে তান লয় ?

আনন, আনন, আনন, আনন : অন্ধকার ।

আ.

তিনটি সেই পাহাড় কাটা দীর্ঘধাপ ;
স্বপ্নবিহীন, পেরোয় পথ সুষুপ্তির ;
ঘুমের খাড়ি, ঘুমের নদী পাহাড় বন :
হৃদয়ে এসে পাথর লাগে : ছলাৎছল।

মুখের রেখা জলীয়ভাব খেয়েছে তাঁর ;
তবুও স্থাথো ক্ষুধিত জাগেন, বিস্মৃতির
পাথরে এসে ধাক্কা খায় কার হৃদয় :

হৃদয় কার ? আমার । মুখ ত্রিমূর্তির ।

সৃষ্টি তাঁর ভ্রুকুর ভঁাজ বিসর্পিল ;
চক্ষু চায় অকম্পন স্থিতির ফল :
হে শিব, শিব তৃতীয় আর কোন প্রলয়
বিপুল কোন আস্য থেকে আহূত এই ?

অন্ধ পাহাড়। মুখের রেখা তিনটি স্থির।

খেলা

বাজীরাও সেন

আমার ঘরের মধ্যে অন্য এক ঘর গড়ে নিয়ে—
ছোট্ট মেয়ে প্রতিদিন জুড়ে দেয় খেলা ;
বর বৌ, গৃহস্থালী কাদা দিয়ে বানানো পায়েস।
কত কি যে খেলার ক্ষণিকা।
খেলার আর এক নাম নিরন্তর বিস্তৃত জীবন ;
প্রখর দৃশ্যের ভীড়ে অনন্ত পরিধি,
আমরা মানুষ সব রঙ্‌চঙে বানানো পুতুল।
বিছানায় ছেঁড়া কাঁথা তবু আঁকি মোহরের মুখ ;
দল বেঁধে, কখনও একক। পরস্পর—
সাঁতালি পর্বত ভেঙ্গে গড়ে তুলি লাশকাটা ঘর।
কতবার জীবনের পবিত্র সকালে,
শ্যামচ্ছায়া অরণ্যের আনত শিয়রে ঝড় নামে।
পৌষের শস্যের মাঠ ভরে ওঠে আহত কংকালে।
তবু তা ফুরোলে, আন্দোলিত সবুজ পল্লব আসে,
ঘন কান্তি স্নিগ্ধ বনাঞ্চল—এর ও নাম খেলা।
মেয়েটাও সারা ক্ষণ খেলে খেলে যায়,
রাগ, যত্ন, অভিমান শাসন, শোধন।
হাতেরই পুতুল আমি. হাঁসি, কাঁদি কিংবা তৃপ্তি পাই
অন্তরালে অন্য এক মেয়ে আমাকেই খেলায় যেমন।

CENTRAL LIBRARY

হলুদ ফুলের বনভূমি

গীতাঞ্জলি বিশ্বাস

হলুদ ফুলের বনভূমি,
আরও কিছুক্ষণ আমাকে থাকতে দাও তুমি।
এখনও আকাশ নীল
হাওয়ায় গুঞ্জন তোলে মৌমাছির পাখা,
দুপুরের রূপো রোদে কনক চাঁপার রং মাখা।
হেমন্তের নতুন শিশির
সুগন্ধিত করে দেয় বনভূমি! তোমার শরীর॥
এখনও সামান্ত দেরী আছে
উত্তর মেরুর বায়ু পৌঁছবার কাছে।
যখন ফুলেরা মৃত, ভ্রমর বিবাগী
দলছুট প্রজাপতি ক্বচিৎ কুঁড়িতে অনুরাগা
বন্ধ্যা মাটির বুক শস্যশূন্য।
এখন বিলম্ব আছে তার;
কিছুটা সময় আছে কর গুনে মিলিয়ে নেবার
লাভ-ক্ষতি, পাপ ও পুণ্য।
হলুদ ফুলের বনভূমি,
আরও কিছুক্ষণ আমাকে থাকতে দাও তুমি!

নেমেই চলেছি

মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

পকেটে হাত দিলাম যেন বাসভাড়া দেব
কণ্ডাক্টারটা আচমকা অন্যদিকে গেলে
পয়সাশুদ্ধ হাতটাকে বাইরে ক'রে নিলাম
যেন মুঠোয় টিকিট, এইভাবেই এসে পড়ল স্টপ
এইভাবেই নেমে পড়লাম বাসভাড়াটা হাতে
তারপর থেকেই যেন নামছি ক্রমশ
হ্যাঁ, মশাই, তারপর থেকেই
নাম্‌ছি, নাম্‌ছি, যেন নেমেই চলেছি…

CENTRAL LIBRARY

পথে-বিপথে

সাধনকুমার ঘোষ

পাঁচ

দাক্ষিণাত্যের ভ্রমণ ভাষাসমস্যা ও খাদ্যসমস্যা সত্ত্বেও একরকমের তৃপ্তি দেয় যা উত্তর ভারতে হিমাচল প্রদেশ ব্যতীত অন্যত্র দুর্লভ। আমার স্বদেশ পশ্চিম বাংলার কথা তো ছেড়েই দিলাম। মোটামুটিভাবে উত্তর ভারতে, বিশেষ করে' পশ্চিমবাংলায়, homo homine lupus—মানুষ মানুষের প্রতি নেকড়ের মতো ব্যবহার করে। রেলে নিজের সংরক্ষিত আসনই অনেক সময় পাওয়া যায় না, অরক্ষিত আসন তো দূরের কথা। পার্ব্বত্য পথে বাসে জানালার ধারের সীটের জন্য বঙ্গসন্তানেরা যে-নির্লজ্জ বাকযুদ্ধ করেন তা কলকাতার সিনেমার অল্পমূল্যের আসনের জন্য লাইনের কথা মনে আনে। ঘটনাচক্রে যদি আপনার গাড়ীতে Restaurant Car না থাকে, বা ষ্টেশনেও খাবার সুবিধা না পান (বলা বাহুল্য সঙ্গে খাবার আনতে আপনি ভুলেই গেছেন), আপনার সহযাত্রী আপনার সামনেই গোছা গোছা লুচি, আলুরদম ও ফিশ্‌ফ্রাই গলাধঃকরণ করে যাবেন। আপনাকে মৌখিক অনুরোধটাও একবার করবেন না যোগ দিতে। অবিশ্যি কখনো যে ব্যতিক্রম ঘটে না তা নয়। এবং জীবনের স্মৃতি এই ব্যতিক্রমগুলি নিয়েই।

একবার পশ্চিম-বাংলা সরকারের পরিচালিত একটি Coach-tour-এ গিয়েছিলাম। পঃ বাংলার ট্যুরিষ্ট বিভাগের পরিচালিত ভ্রমণ খুবই ব্যয়-সাধ্য হয়ে থাকে। একসপ্তাহের ভ্রমণের দক্ষিণা ছিল বোধ হয় সাড়ে তিনশ টাকা। তবে সেবার একটা অপ্রত্যাশিত লাভ হয়েছিল আমার—অনেকগুলি আকর্ষণীয় ভ্রমণ সঙ্গী পেয়েছিলুম। জীবনে একাধিকবার আবিষ্কার করেছি, অনাত্মীয় যতো সহজে যতো আপন হয়, আত্মীয় তেমন কখনো হয় না। এবং এই কোচট্যুরের ফলে আরেকবার এই উপলব্ধি হলো আমার। এই ভ্রমণসঙ্গীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করবো কয়েকজনকে—বিশিষ্ট দন্ত-চিকিৎসক ডঃ বসাকের ; যক্ষ্মারোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ এস. সি. লাহার,—ইনি একটি ঐতিহ্যময় পরিবারের কৃতী প্রতিনিধি—; শ্রীমতী মঞ্জুলা লাহিড়ী ও তস্য স্বামী শ্রী রমাপদ লাহিড়ীর। এ দের চেষ্টাতেই আমরা কেউ কাউকে

ভুলতে পারিনি। একটি বার্ষিক পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিবৎসরই একবার করে' স্মৃতি-রোমন্থন করে থাকি। আর স্মৃতিরোমন্থনই তো ভ্রমণের প্রধান সঞ্চয়। উপযুক্ত ভ্রমণসঙ্গী থাকলে যে নতুন ও ভিন্ন স্বাদের আনন্দ লাভ হয় তা আমি অনেকবার লক্ষ্য করেছি। ভ্রমণে আত্মবিস্মৃতি ও আত্ম-বিলোপের স্থান অবশ্যই আছে, কিন্তু অনুরূপ স্থান আছে যৌথ আনন্দের, যাকে বলা যায় shared ecstasies তার। অগাধ নীল আকাশ, সুনীল অরণ্য, হিমালয়ের তুষারাবৃত রূপ, কন্যাকুমারীর মহিমময় সৌন্দর্য্য—এ সবই যৌথ আনন্দের পটভূমি।

অনুরূপ ভাবে আমার মুসৌরীর স্মৃতি ইংরেজ লেখক রাস্কিন বণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। মুসৌরী আমি অনেকবার গিয়েছি, কিন্তু দীর্ঘ অবস্থান করেছি মাত্র একবার—শ্রীযুক্ত বণ্ডের অতিথি হিসাবে।

সেবার দেরাদূনে বড় একা বোধ করছিলাম। আমার ভ্রমণ সঙ্গীরা সকলেই কেদার-বদরী গিয়েছিলেন। আমাকেও তাঁরা যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, ট্যাক্সিতেও একজনের জায়গাও ছিল। কিন্তু কেদার-বদরীর জন্য আমার শারীরিক বা মানসিক কোনও প্রস্তুতিই ছিল না, তাই এই প্রস্তাব আমায় সসঙ্কোচে প্রত্যাখ্যান করতে হয়। শ্রীমতী মঞ্জুলা ও তাঁর স্বামী একটু ক্ষুণ্ণই হলেন। ওঁরা সব কেদার-বদরী যাওয়ার পরে আমি দেখি দেরাদূনে আমার আর সময়ই কাটে না। বেশীর ভাগ সময় কাটাই রেলোয়ে রেস্তোঁরায়। আমার হোটেলটি ছিল ষ্টেশনের কাছেই। দেরাদূনের কাছাকাছি অনেক সুন্দর নয়নাভিরাম স্থান আছে, কিন্তু দেরাদূনে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর মতো খুব বেশী জায়গা নেই। রাজপুর রোডের কাছে দু-একটি রাস্তা ছাড়া হেঁটে বেড়ানোর সুবিধাও নেই। অন্য অনেক ভারতীয় শহরের মতো দেরাদূনও তার সাবেকী চেহারা হারিয়েছে। যাঁরা আমার মতো বছর কুড়ি আগে দেরাদূন মুসৌরী গিয়েছেন, তাঁরা আর আজকের দেরাদূনকে চিনতে পারবেন না। আজকের দেরাদূন জনাকীর্ণ, শিখ-অধ্যুসিত, অপরিচ্ছন্ন শহর। সব চেয়ে অসুবিধা এখানে সাইকেল-রিক্‌শ নেই।

মনে হল সপ্তাহ দুয়েকের জন্যে মুসৌরীতে কাটিয়ে এলে হতো। শৈলাবাসও হয়, বন্ধু রাস্কিন বণ্ডের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়। তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব এযাবৎ পত্রালাপে নিবদ্ধ ছিল।—এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি যে, সারা পৃথিবীতে আমার এমন অনেক বন্ধু ছিলেন এবং আছেন যাঁদের আমি চাক্ষুষ দেখিনি, দেখার সম্ভাবনাও নেই বললেই হয়। কিন্তু তাতে কি? বন্ধুত্বের ভিত্তি

একাত্মবোধ, নৈকট্য নয়। রবীন্দ্রনাথে এ-অভিমত স্পষ্ট উচ্চারিত। বাইবেলে অবশ্য "তোমার প্রতিবেশী কে?" এ-প্রশ্নের উত্তর একটু ভিন্ন। কিন্তু মূলতঃ রবীন্দ্রনাথ ও যীশুখ্রীষ্টের বক্তব্য একই। একমাত্র বন্ধন আত্মিক বন্ধন।

আমার পত্রযোগের বন্ধুদের সর্ব্বাগ্রে নাম করতে হয় সুধীন ঘোষের। এই মনীষী এবং সুলেখক (যে কয়জন মুষ্টিমেয় ভারতীয় লেখকের ইংরাজী লেখা ইংলণ্ডের বিদগ্ধ সমাজে আদৃত হয়েছে, ইনি তাঁদের অন্যতম) স্বদেশে তাঁর প্রাপ্য সম্মান পাননি। বিশ্বভারতীতে তিনি ইংরাজীর অধ্যাপনা করতে এসেছিলেন প্রধানতঃ পণ্ডিত নেহেরুর অনুরোধে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সেটা সৌভাগ্যই বলবো। কিন্তু সেখানকার ক্ষমতা-চক্র তাঁকে স্বাগত জানায় নি। শেষ পর্যন্ত তিনি প্রহৃত, অপমানিত ও বিতাড়িত হয়েছিলেন। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা তাঁর বিরুদ্ধে প্রচুর বিষোদ্‌গার করে। শ্রীযুক্ত ঘোষের বন্ধু শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় তখন সেই সাপ্তাহিকে একটি ধারাবাহিক রচনা দিচ্ছিলেন। তিনি তাদের কাছে প্রতিবাদ জানিয়ে আর লিখতে অস্বীকার করেন। আমিও এই সংবাদ পড়ে গভীর বেদনাবোধ করি এবং তাঁকে বিলাতে চিঠি লিখি, সত্য ঘটনা জানার উদ্দেশ্যে। তিনি উত্তরে জানান যে, ঘটনাটি এতই বেদনাদায়ক যে তাঁর পক্ষে তা বর্ণনা করাও কঠিন। তিনি চিঠি শেষ করেছিলেন,—"My only fault was that I wanted to raise the standard of English teaching. I had to pay for this with the loss of one eye."

সুধীন ঘোষ ছাড়া আর যাঁদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব পত্রালাপেই নিবদ্ধ কিন্তু নিবিড়, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ করতে হয় জেম্‌স্ কির্কাপ (James Kirkup), এ. এল. রাউজ (A.L. Rowse), ও ক্লিফোর্ড লীচের (Clifford Leech)। Kirkup—আমার মতে—আধুনিক ইংরেজ কবিদের মধ্যে প্রথম সারিতে। তবে তিনি Establishment এর কড়া সমালোচক বলে' তাঁর বিরোধী চক্রও কম শক্তিশালী নয়। তবু কবি, সমালোচক ও ভ্রমণরসিক হিসেবে তাঁর স্থান আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। ওঁর কবিতা Hiroshima মানববেদনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। ওঁর দুটি ভ্রমণকাহিনী, These Horned Islands (জাপান সম্বন্ধে) আর The Tropic Temper (মালয় সম্বন্ধে) ইংরেজী সাহিত্যেও অসাধারণ। ওঁর আত্মজীবনীখানিও—Sorrows, Passions and Alarms—অনবদ্য। কির্কাপ অনেকদিন হংকং, টোকিও, নাগোয়া ও

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় নানা জায়গায় প্রবাসী ছিলেন। কিছুদিন হলো স্বদেশে ফিরেছেন। কিন্তু স্বদেশে ওঁর মন টেঁকেনা, যেমন টিঁকতো না এডমণ্ড ব্লাণ্ডেনের; সমারসেট মমের এবং যেমন মন টেঁকে না কবি রবার্ট গ্রেভ্‌সের। লেখার সময় পর্যন্ত জানি কির্কাপ মরক্কোর ট্যাঞ্জিয়ার শহরে অবস্থান করছিলেন।*

ক্লিফোর্ড লীচ আর এ. এল. রাউজের পরিচয় অবশ্য বিদগ্ধ পাঠককে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। শেক্সপীয়র সমালোচক হিসেবে লীচের স্থান একেবারে প্রথম সারিতে; আমি মনে করি, অপ্রতিদ্বন্দ্বী শেক্সপীয়র সমালোচক উইলসন নাইটেরই পরে। বর্ত্তমানে তিনি কানাডায় টোরণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন। আর ঐতিহাসিক এ. এল. রাউজ তো কর্ণওয়াল তথা সমগ্র ইংলণ্ডেরই গৌরব, যেমন গৌরব ছিলেন ঐতিহাসিক Trevelyan ও অধ্যাপক-সমালোচক-গল্পলেখক "Q" (Sir Arthur Quiller-Couch)। রাউজ একাধারে ঐতিহাসিক, সাহিত্য-সমালোচক ও কবি। শেক্সপীয়রের চতুর্থ জন্মশতবার্ষিকীতে ওঁর এবং Peter Quenell-এর কবিজীবনীই উল্লেখযোগ্যতম।

মুসৌরী ও রাস্কিন বণ্ডের কথা বলতে গিয়ে অনেক কথা এসে পড়ল। মুসৌরীতে আমি রাস্কিন বণ্ডের আতিথেয়তা ও সাহচর্য্যে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছিলাম। উনি বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিক, অবশ্য ইংরেজী ভাষায়। ওঁর Panther Moon দেশে বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। পার্ব্বত্য শহরের, বিশেষ সিমলা ও মুসৌরীর সঙ্গে ওঁর আশ্চর্য একাত্মবোধ। মুসৌরীর Gun hill, লাল টিব্বা ও গোরস্থানগুলিতে বেড়াবার সময় এটা বারবার দেখেছি।

মুসৌরী নৈনিতালের মতোই বাসযোগ্য সহর। সিমলার মহিমা এদের কারোই নেই তবে সেই সঙ্গে নেই বর্ত্তমান দার্জ্জিলিং-এর অপরিচ্ছন্নতাও। দুটিতেই অজস্র হোটেল এবং অধিকাংশই খুব ব্যয়সাধ্য নয়। অবশ্য যাঁরা ব্রিটিশ যুগে মুসৌরীর Hakman's বা নৈনিতালের "নৈনিতাল ক্লাব"-এ অবস্থান করেছেন তাঁরা একটু নষ্টালজিয়া অনুভব করবেন। দুটি সহরের আর একটি সাদৃশ্যও আছে—এখানে ওঠা নামা না করেও যথেষ্ট ভ্রমণ করা যায়। নিজেকে Mall-এ আবদ্ধ রাখলেই যথেষ্ট। মণীন্দ্রলাল বসুর "ভেরনল" গল্পটিতে নৈনিতালের উপভোগ্য নির্জ্জনতা উপলব্ধি করা যায়।

---

* পরে ডাবলিনে গিয়েছেন।

নৈনিতালে Mall হলো হ্রদটির চারপাশের বৃত্তাকার পথটি। এককালে অশ্বারোহী ও পদাতিকদের পথ আলাদা ছিল, আজ সব একাকার হয়ে গেছে। আমরা যারা মাত্র বিশ-পঁচিশ বছর আগে নৈনিতাল গিয়েছি আমরাও বোধ করি Blue Bird-এর মতো একটি Coffee Bar-এর অভাব। একটি হ্রদের মধ্যে একটি ভাসমান কফি-হাউস ছিল, নৌকা করে' যেতে হতো। তবে আজও Mall-এর উপরে Sakby's Coffee House আছে, যেখানে বসে' হ্রদের শোভা আর তুষারমৌলী বিন্‌সার আর কৌশানীর স্বপ্নলীন সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায়। নৈনিদেবীর মন্দিরও কাছেই। চারদিকে পাহাড়,—তার একদিকে Cheena Peak, অন্যদিকে All-Saints College ও বিখ্যাত Dorothy's Seat (এডিনবরার Arthur's Seat-এর কথা মনে আনে)। নৈনিতাল, মুসৌরী ও ডালহৌসীতে চোখ মেলে দেখার আয়োজন অপর্য্যাপ্ত। এবং নির্দ্বিধ কণ্ঠে বলার "এদেশ লেগেছে ভালো নয়নে"। দাক্ষিণাত্যের উটকামণ্ডেও তাই—তা ছাড়া আছে কোইম্বাটুর বা মেটুপালায়াম থেকে রেলপথে ভ্রমণের স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। কিন্তু উটকামণ্ডে নৈনিতালের নির্জ্জনতা নেই। লেক আছে একটি, সেখানে নৌকাও আছে, কিন্তু—। স্মৃতিকে আচ্ছন্ন করে' থাকে রেলপথের নয়নাভিরাম ষ্টেশনগুলি—Lovedale, Coonoor, Wellington.

যে কোনো আকর্ষণীয় স্থান, তা ষ্ট্র্যাটফোর্ডই হোক, আর সিমলাই হোক, একদিন তার কাছে বিদায় নিতেই হয়। ম্লান হয়ে আসে কণ্ঠে মন্দার মালিকা। ঝিলিমিলি ঝিলমের বাঁকাস্রোত সম্বন্ধে তখন নতুন করে' সচেতন হই। সচেতন হই জ্যোৎস্নাস্নাত গুলমার্গের তুষারকিরীট সম্বন্ধে। এবং ভিন্ন পরিবেশে মাক্লাস্কীগঞ্জের নির্জ্জনতা ও বড়কাকানা লুপের মনোহারিনী রূপ সম্বন্ধে এবং সার্থকনামা মহুয়াখিলন সম্বন্ধে (রমাপদ চৌধুরীর "দরবারী ও বুদ্ধদেব গুহের "একটু উষ্ণতার জন্য"-য় এ-অঞ্চলের আকর্ষণীয়তার কিছু আভাষ মেলে)।

লরেন্স ডারেল সত্যই বলেছেন, Loneliness and time are the two companions without which no journey can yield us anything.। নববর্ষা যখন নামে কেতকীবনে আর শালমঞ্জরীতে তখন উজ্জয়িনী আর রেবানদীর কথা এজন্যই মনে আসে। মেঘমল্লারের সব মীড়গুলি আর্ত্ত হয়ে ওঠে। আকাশবীণার আলাপ আসে সর্বকালের নেপথ্য থেকে।

আগেই বলেছি আমার ভ্রাম্যমান জীবনে পরিচয়-পত্র অপরিহার্য্য ছিল। আমার প্রথম বার দক্ষিণভারত ভ্রমণের সময় অবশ্য পরিচয়-পত্র দরকার হয়নি। আমি আমার বন্ধু অধ্যাপক হেমেন্দ্র দত্তের অতিথি হয়েছিলাম। সেটা বোধহয় ১৯৩৮ সাল। বন্ধু হেমেন্দ্র তখন অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ওঁর বাড়ীটি ছিল ওয়ালটেয়ারের মহারাণীপেটা অঞ্চলে, একেবারে সমুদ্রের উপরে। কতকটা পুরীর বি. এন. আর. হোটেলের মতো অবস্থান। খান তিন চার বাড়ী পরেই অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের বাড়ী। তাঁর পাশের বাড়ীটি ছিল শৈলেশ্বর সেনের—ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক।

ওয়ালটেয়ারের সমুদ্রতীর ভারী সুন্দর, যদিও জাহাজের কারখানা হওয়ার পর থেকে তার সৌন্দর্য্য খানিকটা ব্যাহত হয়েছে। শহরের শেষ প্রান্তে Uplands, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়, Constitution Club (পরিচয় পত্র থাকলে অল্প ব্যয়ে থাকবার পক্ষে একটি মনোরম জায়গা) ইত্যাদি অবস্থিত। পাশেই একটি পাহাড়। পাহাড় ও সমুদ্রের সহাবস্থান ওয়ালটেয়ারকে একটি বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। অনতিদূরের বিমলিপটম্-এর বৈশিষ্ট্য তার নির্জ্জনতা। এবং গোপালপুরের ও তাই। তবে গোপালপুরের সঙ্গে শুধু বিমলিপটম্ নয়, এক Cape Comorin ছাড়া কোনো সমুদ্রতীরেরই তুলনা চলে না। পার্বত্য সহরের মধ্যে যেমন সিমলার জন্য, তেমনি সমুদ্রতীরের মধ্যে গোপালপুর ও কন্যাকুমারীর জন্য আমার হৃদয়ে একটি সংরক্ষিত আসন আছে।

আমার সেবার (এবং প্রথম) ওয়ালটায় যাওয়াটা হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সামান্য আগে। ফিরে আসি যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার দিন কয়েক পরে। তখন গোপালপুর উড়িষ্যার অন্তর্গত হয়নি, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ছিল। তবে বেরহামপুর স্টেশন এলেই বোঝা যেত দাক্ষিণাত্যে এসেছি। ষ্টেশনে চা পাওয়া যায় না, শুধু কফি। আর বাঁকে করে' ফেরীওয়ালা বিক্রি করে "পালো"। "পালো" বোধ করি তেলেগু ভাষায় দুধের নাম। প্রথমবার ওয়ালটেয়ারে আমার প্রধান সমস্যাই ছিল চা। বাড়ীর বাইরে এক পেয়ালা চা কোথাও মিলবে না। কফি অবশ্য যত্র তত্র এবং অপর্য্যাপ্ত। কিন্তু কফিতে কি চায়ের স্বাদ মেলে, আর তা কি যখন তখন যত ইচ্ছে খাওয়া যায়? দ্বিতীয় সমস্যা ছিল ভাষা। আমাদের অনেকের ধারণা দক্ষিণভারতে দোকানদাররাও ইংরেজী বলতে বুঝতে পারে। কিন্তু দেখলাম তারা হিন্দী বা ইংরাজী কোনোটাই বোঝে না।

কিন্তু বছর খানেক পরে যখন দ্বিতীয়বার ওয়ালটেয়ারে যাই দেখি 'জমানা বদল গিয়া'। চায়ের দোকান আর হিন্দী ফিলমের পোষ্টারে সমুদ্রতট ছেয়ে গেছে। তবে সে চা মোটেই সুপেয় নয়। আর হিন্দী ফিলমের পোষ্টার? ও দেখলেই আমি বিবমিষা বোধ করি। আমার মনে হয় আমাদের আধুনিক যুবসমাজের নৈতিক অধোগতির অন্যতম কারণই এই হিন্দী ফিল্ম। তার পোষ্টারগুলির ক্ষতিকরতাও কম নয়। আজকাল নাকি ছাত্রছাত্রীদের মদ্যপান ও প্রকাশ্যে মাতলামি মৌলিক অধিকারের পর্যায়েই পৌছেচে, গণ টোকা-টুকির পরেই! এইজাতীয় ফিল্মের অবাধ বিস্তারের চমৎকার ফলশ্রুতি। আমাদের দেশে কতরকমের আইন আর অর্ডিনান্স প্রত্যহ পাস হচ্ছে। যুগল অবস্থায় মদ্যপান যুবসমাজের মৌলিক অধিকার, এই মর্মে একটি আইন পার্লামেন্টে পাশ হলেই তো হয়ে যায়। সমালোচনার আর অবকাশই থাকবেনা। আমাদের আইনপ্রণেতারা ও মন্ত্রীগণ বিদেশে গিয়ে তো বটেই, দিল্লী কলকাতাতেও যে কাণ্ড করেন, তার কতক পরিচয় নাট্যকার গিরীশ ঘোষ আজ বেঁচে থাকলে হয়তো দিতে পারতেন। আমি পারব না।

শেষবার যখন ওয়ালটেয়ারে যাই তখন আমার প্রথম কাজই হলো Scandal Point-এর নির্জ্জনতা তখনও অব্যাহত আছে কি না তা দেখা। দেখলাম আছে এবং পরম তৃপ্তিলাভ করলাম। Scandal Point-এর অবস্থান কতকটা পুরীর চক্রতীর্থের শেষ প্রান্তের মতো। এখানে সমুদ্রের সঙ্গে মুখোমুখি বসতে হয় tête-à-tête এর মতো। অপার আনন্দ আছে, কিন্তু কাশ্মীরের বানিহাল pass থেকে নীচে তাকানোর মতোই সে আনন্দ ভয়মিশ্রিত। প্রসঙ্গক্রমে বলি যে, আজকের পর্য্যটকরা বানিহাল pass এর উচ্চতার খবর রাখেন না এবং তাই ঐ আনন্দ থেকেও বঞ্চিত।

* * *

আমার শৈশব মধ্যপ্রদেশে কাটলেও মধ্যপ্রদেশের অনেক দর্শনীয় স্থান আমি পরিণত বয়সে দেখেছি। শৈশবে কেবল একবার বাবার সঙ্গে পেণ্ড্রা রোড গিয়েছিলাম, যা অমরকণ্টক যাওয়ার প্রবেশপথ। বিলাসপুর থেকে কাটনি, একটি শাখা রেলপথ আছে, তারই মধ্যে পেণ্ড্রারোড একটি স্টেশন। এপথের বর্ণনা বিভূতিভূষণের 'অভিযাত্রিক' ও 'অপরাজিত'-য় আছে। অপুর গন্তব্যস্থান উমেরিয়াও এই লাইনেই পড়ে, তবে অপুকে আসতে হয়েছিল বিপরীত পথে অর্থাৎ কাটনি থেকে (স্মরণ রাখতে হবে অপুর যাত্রা সুরু এলাহাবাদ থেকে।)

CENTRAL LIBRARY

পেণ্ড্রারোডে তখন আমেরিকান মিশনারী পরিচালিত একটি ভালো টি, বি, হাসপাতাল ছিল। বাবা বৈষয়িক কাজে গিয়েছিলেন এবং আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে পারেননি বলেই আমাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। পথের ধারের ছোট ছোট স্টেশনের বিশেষ এক রকমের আকর্ষণ আছে। আমি আমার সেজমামার দাক্ষিণ্যে কোলিয়ারী অঞ্চল বেশ ভালো করে বেড়িয়েছিলাম, যে-অঞ্চলের সাহিত্যিক মর্যাদা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কল্যাণে। ধানবাদ থেকে বেরমো (Bermo) যেতে এরকম অনেকগুলি ছোট ষ্টেশন পড়তো। আর ম্যাকলাস্কিগঞ্জের পথে পড়তো পাত্রাতু আর মহুয়ামিলন স্টেশন দুটি—যারা নাম মাহাত্ম্যেও বটে, নিসর্গ সৌন্দর্য্যের জন্যও ওপথের যাত্রীদের মন কেড়ে নিত।

আর একটি অতি সুন্দর ষ্টেশন পেয়েছিলাম—পানপোশ। চক্রধরপুর ও মনোহরপুর-এর মধ্যে। মনোহরপুর ছোট স্টেশন, তবে বিখ্যাত সারাণ্ডার জঙ্গলের প্রবেশদ্বার। বিভূতিভূষণের একাধিক ডায়েরীতে এবং উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একাধিক স্মৃতিচারণে সারাণ্ডার বিশেষ সম্মানিত স্থান। যাই হোক, পানপোশ স্টেশনটি আমি দেখতে পাই আমার বিলাসপুরের এক শিক্ষক মহাশয়ের স্ত্রীর উপদেশে। তাঁকে আমি মাসীমা বলতাম। আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর কথামতো আমি মেল ট্রেনে না গিয়ে একবার কলকাতাগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরি। তখন আমার বয়স এগারো কি বারো।

পানপোশের বৈশিষ্ট্য ছিল তার অবস্থান। স্টেশন প্ল্যাটফর্মের পিছনেই একটি খরস্রোতা নদী, সম্ভবতঃ সুবর্ণরেখার কোনো শাখা। আমি যেদিন পানপোশ দেখি সেদিন নদীতে বেশী জল ছিল না, (বোধ হয় সেটা মে মাস) কিন্তু এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। ঘটনাক্রমে সেদিন প্যাসেঞ্জার অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। আমি ভিজে বালির উপরে অনেকক্ষণ বেড়ালাম। বোহারডির নিকটবর্ত্তী সারোয়ানির নদীর কথা মনে পড়লো। ট্রেনের ঘন্টা পড়লে মাসীমাকে মনে মনে ধন্যবাদ ও প্ল্যাটফর্মের কেঁদ ও কৃষ্ণচূড়া গাছগুলিকে বিদায় জানালাম।

পানপোশের সম্ভবত নাম পরিবর্ত্তিত হয়েছে। তবে সেদিনের পানপোশের সঙ্গে এডিনবরার পথে Berwick ষ্টেশনের বেশ কিছু সাদৃশ্য আছে। অবশ্য Berwick এর অনতিদূরে যে নর্থ সী—তার মহিমা একটি ছোট নদী কি করে পাবে? তবে ছোট নদীরও একটি স্বকীয়তা আছে, যদিও ভারতবর্ষে—পদ্মা,

মেঘনা, গঙ্গা, সিন্ধু, যমুনা, মহানদী, গোদাবরীর দেশে, তার বৈশিষ্ট্য তেমন চোখে পড়ে না। ছোট নদীর যথার্থ রূপ দেখতে হলে' যেতে হবে ইংলণ্ডে। স্পেন্সার আর ম্যাথু আর্নল্ডের প্রিয় নদী টেম্‌স্ ও মিল্‌টনের প্রিয় নদী সেভার্ন ত সে-দেশে পদ্মা মেঘনার পর্যায়ে পড়ে। সত্যিকার ছোট নদীগুলি—Ouse, Rotha, Wye, Isis বা Cam—বিভিন্ন কবির প্রেরণার উৎস ও সাহিত্য-রসিকের কাছে গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী দর্শনের তুল্য। আয়তনে Stour নদীও, যার তীরবর্ত্তী গ্রাম Sturminister Newton-এ বসে' হার্ডি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস The Return of the Native লিখেছিলেন, ছোটই। এবং এভন (Avon) নদীর কথা মনে করিয়ে দেয়। এভনেরই মতো Stourএর ও দুই পাশে উইলো গাছ, দু-একটি এলডার (Elder) গাছ। স্নিগ্ধতার পরিবেশ, উত্তেজনার নয়। অপরপক্ষে কুমুদরঞ্জন মল্লিকের অজয় ও শরৎচন্দ্রের রূপনারায়ণকে কোনোমতেই ছোট বলা চলে না। Perspective-এর তফাৎ এই মাত্র। ই, এম, ফর্ষ্টার একটি প্রবন্ধে বলেছেন, কবি Cowper-এর প্রিয় নদী Ouse এক হিসেবে ইংলণ্ডের প্রাণকেন্দ্র। সে-হিসাবে বিখ্যাত নদীগুলির নাম নেই। গ্রামছাড়া রাঙামাটির পথের আকর্ষণ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বা ন্যাশনাল হাইওয়েগুলির থেকে সতন্ত্র।

কথায় কথায় ছোট ষ্টেশন থেকে এতদূর সরে এসেছি যে ষ্টেশন মাষ্টারের কোয়ার্টারটাও আর দেখা যায় না। জর্জ্জিয়ান কবি এডওয়ার্ড টমাসের ছোট ষ্টেশন Aldestrop সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ কবিতা আছে। "Yes I remember Aldestrop"। তাতো মনে রাখবেনই। জর্জ্জিয়ানরা সকলেই টমাস হার্ডির মন্ত্রশিষ্য। টমাস হার্ডির কবিতায় সর্ব্বজীবের প্রতি যে-করুণা লক্ষিত হয় তা ইংরেজী সাহিত্যেও বিরল, এমন কি তুলনাহীন। ব্লেকের অনেকগুলি কবিতায়, কোলরিজের Ancient Mariner-এ এবং ওয়ার্ড্‌স্-ওয়ার্থের Heart-Leap Well ও Fidelity এই দুটি কবিতায় অবশ্যই সর্ব্ব-জীবের প্রতি প্রীতি ও করুণার অভিব্যক্তি আছে, কিন্তু তা হার্ডির After-wards-এর সঙ্গে তুলনীয় নয়। হার্ডির সঙ্গে তুলনীয় মহাভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র যুধিষ্ঠির, যিনি স্বর্গের চেয়ে বেশী মর্য্যাদা দিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গী ও অনুগামী কুকুরকে, এবং আংশিক তুলনীয় শরৎচন্দ্র যাঁর "দেওঘরের স্মৃতি" ও "মহেশ" সেণ্ট ফ্রান্সিসের কথা স্মরণে আনে। এই অতিপরিণত বয়সেও যখন গফুরের কথা মনে করি, "আল্লা! মহেশ আমার না খেয়ে মারা গেছে, কিন্তু তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া নদীর জল যারা তাকে

খেতে দেয়নি তাদের তুমি ক্ষমা কোরো না," তখন অশ্রু সংবরণ করতে পারি না। Afterwards স্মরণ করলেও তাই। যন্ত্রণাক্লিষ্ট পশুর আবেদন যে মানুষের আবেদনের চেয়ে বেশী মর্ম্মস্পর্শী তার স্বীকৃতি আছে অধুনাবিস্মৃত, কিন্তু ত্রিশ বৎসর আগে Edgar Snow বা John Gunther-এর মতোই পৃথিবীবিখ্যাত, সাংবাদিক Webb Miller-এর "I Found No Peace" গ্রন্থে আর মমের বিখ্যাত গল্প The Traitor-এ।

পেণ্ড্রারোডের প্রতি আমি সুবিচার করিনি। গাছপালা, জঙ্গল, নদী, পাহাড়, সমুদ্র—সবই আমার আজন্ম ভালো লাগে, কিন্তু নিসর্গ সৌন্দর্য্যে আত্মবিলোপ করার বয়স আমার তখনও হয় নি। আমি তখন Tintern Abbey'র প্রথম সোপানে। তবুও আশা করি স্মৃতি আমায় প্রতারণা করেনি। আমরা দু-তিন দিন পেণ্ড্রা রোডে ছিলুম। দুপুরে খেতাম শিউলী ফুলের মতো চালের ভাত, ঘি-দেওয়া অড়র ডাল, আলুর তরকারী প্রচুর কাঁচালঙ্কা মিশ্রিত, ও পুদিনার চাটনি। রাত্রে খেতাম মোটা মোটা পুরী ও আলু-ঝিঙ্গার তরকারী। আগাগোড়া নিরামিষ। তবু কী ভালোই যে লেগেছিল। (অমৃতস্য পুত্র না হতে পারি অমৃতস্য ভোক্তা রসিক আমি আজীবন।) স্যানাটোরিয়ামের অনতিদূরেই আমরা থাকতাম। আবলুস গাছের ফাঁক দিয়ে—সন্ধ্যাতারা উঠছে দেখতাম, এখনও মনে আছে। আর মনে আছে শাল, বাদাম ও চিরঙ্গী গাছের সমারোহ। পলাশও যথেষ্ট আছে তবে বিলাসপুরের চেয়ে কিছু কম। শুনলাম এই নাকি রামায়ণ-মহাভারতে বর্ণিত বিন্ধ্যারণ্য যার বর্ণনা নৈষধচরিতেও আছে। সমস্ত দিকচক্রবাল জুড়ে বহুদূরে বিন্ধ্যপর্বতের অস্পষ্ট সীমারেখা ছিন্দওয়ারা ও মহাদেও শৈলশ্রেণীর নীলাঞ্জন। অনতিদূরে নর্ম্মদা। পেণ্ড্রারোডের সূর্য্যাস্ত আমার এখনো মনে পড়ে। অস্তাচলের ধারে এসে পূর্ব্বাচলের অনেক স্মৃতিই আবার সজীব হয়। পেণ্ড্রারোডের অন্যতম মধুর স্মৃতি কিন্তু অস্তাচলেরই। সেখানকার তারা-ভরা আকাশ আর গভীর নীরবতা আমি আজও পরোক্ষভাবে উপলব্ধি করে থাকি। সেদিন পারি নি, কারণ খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তাম। কিন্তু শাল ও মেহগনি গাছের আড়ালে সূর্য্যাস্ত সেই অতি অল্প বয়সেও আমার মনোহরণ করেছিল। শঙ্কু মহারাজের 'শঙ্কর-নর্ম্মদা'ও এই অঞ্চল নিয়ে লেখা, তবে তিনি বোধ হয় পেণ্ড্রা রোড যান নি।

রায়পুর যাই যখন আমার বয়স পঁচিশ। একটি পরিচয়পত্রের প্রয়োজন হয়েছিল, সেটি দিয়েছিলেন পিতৃবন্ধু ত্র্যম্বক দেহাঙ্কর, বিলাসপুরের সরকারী

উকিল। পত্রটি ছিল রায়পুরের বিখ্যাত বাঙ্গালী উকিল মন্মথনাথ ভাদুড়ীর নামে। ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজের এককালীন রসায়নের অধ্যাপক জ্যোতি ভাদুড়ীর ভ্রাত। পূর্ব্বেই বলেছি যে সেই প্রাক্-হোটেল প্রাক্-ট্যুরিষ্টলজ যুগে (হাজারিবাগ ও চুনার সে যুগে সম্মানিত ব্যতিক্রম) পরিচয় পত্র না থাকলে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ অসম্ভব ছিল।

রায়পুরে পৌঁছে দেখলাম মন্মথবাবুর প্রতিষ্ঠা ও আতিথেয়তার স্বরূপ। তাঁর গাড়ী করে' আমি সহর পরিক্রমা করি ও শিউনাথ নদীর ব্রিজটি দেখতে যাই। দেখলাম পথে ঘাটে কত লোক যে তাঁকে জোড়হাতে নমস্কার করছে, তা গুণে শেষ করা যায় না। যে কয়দিন ছিলাম রোজ রাত্রে তিনি আমার সঙ্গে বসে খেতেন। আহার্য্যের ব্যবস্থা ছিল রাজসিক এবং শেষ কোর্সটি ছিল এক প্লেট মিষ্টি—এটা মনে পড়ে। ফেরার দিন নিজে গাড়ী করে' ষ্টেশনে নিয়ে যান এবং অন্ততঃ আর একবার যেন আসি ও বেশী দিন থাকি এ অনুরোধ করেন। অবশ্য সে অনুরোধ রক্ষা করা হয়নি। পরে শুনেছি আমার মতো পরিচয়-পত্র-ওয়ালা অতিথি তাঁর মাসে জন তিন চার থাকতেনই। ওঁরই বাসায় আমার পরিচয় হয়েছিল অনাদি দে-র সঙ্গে। তিনি ছিলেন বহু-ভাষাবিৎ হরিনাথ দে-র কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

আতিথেয়তার মান সে যুগে খুবই উঁচু ছিল। প্রবাসী বাঙ্গালীর মান মর্য্যাদাও যথেষ্ট ছিল। এখন দুইই গেছে। এলাহাবাদে রামানন্দ বাবু ও বামনদাস বাবু, লক্ষ্ণৌতে অতুলপ্রসাদ সেন, সিমলায় স্যর ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, পেশোয়ারে ডাঃ চারুচন্দ্র ঘোষ—এঁরা তখন কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। এবং সঙ্গত কারণেই। কেবল ব্যক্তিগত জীবনে সাফল্য নয়, চারিত্রিক ঐশ্বর্য্যই এঁদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় করেছিল। বর্ত্তমান প্রবাসী বাঙ্গালীর প্রতীক আমাদের আজমীঢ়ের সেই ভদ্রবেশী ক্ষুদ্রচেতা মানুষটি—এবং কাশী রাঁচি ও এলাহাবাদের অসংখ্য নিষ্কর্ম্মা বাঙ্গালী যুবক। এরা জীবন যুদ্ধে পরাজিত, কিন্তু বাঙলার যুবকদের মতো, বিশেষ কারণে শাসক সম্প্রদায়ের প্রসাদপুষ্ট নয়। তার উপর এরা যে-প্রদেশে থাকে তাদের সঙ্গেও এদের একাত্মবোধ নেই। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ("মহাস্থবির") এদের কদর্য্য রূপটা খুব ভালো করেই দেখেছিলেন। এই দুকূলহারাদের প্রতি আমার যে সহানুভূতি নেই তা নয়। তবে একথা মনে না করে' পারি নে যে, বাঙ্গালী আজ সবই হারিয়েছে ও খুইয়েছে—integration-এর ক্ষমতা হারিয়েছে, আত্মমর্য্যাদা হারিয়েছে, সর্বোপরি আত্মরক্ষার দৃঢ় ইচ্ছাটুকুও নেই।

পরিচয়পত্রের প্রসঙ্গে আমার একাধিকবার ওয়ালটেয়ার ভ্রমণের কথা বলেছি। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ একবার ছাড়া—আমাকে পরিচয়পত্রের সাহায্যেই করতে হয়েছে। দূর দক্ষিণ যাত্রায় আমায় পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন আমার পরলোকগত বন্ধু হিরণাকুমার দাশগুপ্ত (মাণ্টু)। ইনি ছিলেন আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন Actuary এবং ক্যানাডার একটি শীর্ষস্থানীয় কোম্পানীর শীর্ষস্থানীয় হয়েছিলেন। ফরাসী ভাষা জানতেন সুমার্জ্জিত ফরাসীদের মতোই। তাঁর কর্ম্মস্থল ছিল Montreal-এ (এখানেই তাঁর দেহান্ত হয়), যেখানে কথ্য ভাষা ইংরাজী নয়, ফরাসী।

দাক্ষিণাত্যে আমি বার পাঁচেক গেছি, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করবো দাক্ষিণাত্যের অনেক দ্রষ্টব্য স্থানই আমার অদেখা। এর কারণ আমার কাছে উটির আকর্ষণ এত প্রবল ছিল যে, আমি আর মাদুরা আর ত্রিচিনপল্লীর জন্যে সময় সঙ্কুলান করতে পারতুম না। অবশ্য যেবার আমার লক্ষ্য ছিল কমোরীন, সে বারের কথা স্বতন্ত্র। সেবার ত্রিবান্দ্রাম কোভেলাম ও পণ্ডিচেরী ঘুরে যাই এবং দেখি; এবং বেশ কিছুদিন সময়ও দিতে পেরেছিলাম। কমোরীনে ছিলাম বোধ হয় চারদিন।

প্রথম বার যখন দক্ষিণপ্রান্তে যাই আমার কৃষ্ণা গোদাবরী দেখার ঔৎসুক্যের চেয়ে ব্লু-মাউণ্টেন এক্সপ্রেসে চড়ার ও উটকামণ্ড দেখার উৎসাহই প্রবলতর ছিল। ভারতবর্ষের অনেকগুলি বিশেষ চিহ্নিত গাড়ী আমার চড়া হয়নি—যেমন প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের ইম্পীরিয়াল ইণ্ডিয়ান মেল (ব্লু ট্রেন) যার সাপ্তাহিক আগমনের জন্য বিলাসপুর ষ্টেশনে প্রতীক্ষা করতুম এবং পশ্চিম ভারতের ডেকান কুইন; অথবা তাজ এক্সপ্রেস। অবশ্য ইম্পীরিয়াল ইণ্ডিয়ান মেল ছাড়া অন্য কোনো ট্রেন ব্লু-মাউণ্টেন এক্সপ্রেসের সমপর্য্যায়ের নয়। আমি প্রথম যখন এই ট্রেনে চড়ি তখন ইণ্টিরামিডিয়েট ক্লাস ছিল। তাতে শয়নের ব্যবস্থা ত সংরক্ষিত ছিলই, বিলাসের উপকরণ বর্ত্তমান ফার্ষ্ট ক্লাসের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট ছিল। এই রকম কোনো ট্রেন (সম্ভবতঃ Victoria ষ্টেশনে The Golden Arrow) দেখেই বোধ হয় চেষ্টারটন বলেছিলেন, "রেলগাড়ীর অভ্যন্তরকে আমি কবির স্বপ্ন ও ভূস্বর্গের সমপর্য্যায়ে ফেলি।"

মাদ্রাজে আমার থাকার ব্যবস্থা ছিল হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সুসজ্জিত গেষ্ট হাউসে। গেষ্ট হাউসটি Marina-র সন্নিকট। প্রসঙ্গত বলি, দক্ষিণ ভারতে ডাকবাংলোর সংখ্যা উত্তর ভারতের মতো নয়।

ধর্ম্মশালা অবশ্য ছিল ও আছে। কিন্তু একটু রুচিবিশিষ্ট সংস্কৃতিবান ভ্রমণরসিকের পক্ষে দক্ষিণভারতে একটিই আশ্রয়স্থল ছিল—স্থানীয় হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স-এর গেষ্ট হাউস। বহু-সমালোচিত নলিনীরঞ্জন সরকারের এটি একটি স্মরণীয় কীর্ত্তি। ম্যানেজার জিতেনবাবুও আমার বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। তাঁর আতিথেয়তাও ভোলবার নয়। আমি তাঁর সঙ্গে প্রত্যেক বাঙ্গালীর বাড়ী নিমন্ত্রিত হয়ে গেছি এবং মাদ্রাজের যত দর্শনীয় স্থান—যেমন আডিয়ারের থিওসফিক্যাল কলেজ বা সেণ্ট টমাসের সমাধি—সব দেখেছি। জিতেনবাবু আমাকে তাঁর মোটর গাড়ীতে উটকামণ্ড যেতেও অনুরোধ করেছিলেন। প্রস্তাবটি নিঃসন্দেহে লোভনীয় ছিল কিন্তু গাড়ীবিহীন হলে তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে থাকবেন সেজন্য এবং ব্লু-মাউণ্টেন ট্রেনে ভ্রমণের লোভও ছিল, সেজন্যে আমি তাঁর সস্নেহ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করি।

ব্লু-মাউণ্টেন এক্স্প্রেসে প্রথম ষ্টেশন বোধহয় আর্কোনাম, পরের ষ্টেশন ভেলোর। ভেলোর এখন তার হাসপাতালের জন্য বিখ্যাত হয়েছে। এদেশে এটিই একমাত্র হাসপাতাল যেখানে ব্রেন-সার্জ্জারি হয়। তবে ইতিহাসের ছাত্রেরা জানেন যে ভেলোরেই প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছিল, ১৮১৮ সালে, মীরাটে নয় ১৮৫৭ তে। Sir Henry Newbolt-এর একটি কবিতা আছে এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে। সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে Newbolt-এর Vitae Lampada এবং He fell among thieves কবিতা দুটি সুপরিচিত।

ভোরবেলা কোইম্বাটুর পৌঁছুই। কোইম্বাটুর ষ্টেশনে নেমেই দেখি এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিই কি অধ্যাপক ঘোষ?" অস্বীকার করলুম না। তিনি বললেন, "চলুন বাইরে আমার গাড়ী আছে। জিতেনদা কাল রাত্রে ট্রাঙ্ক-কল করেছিলেন, আপনার যেন কোনও অসুবিধা না হয়।" ভদ্রলোকের নাম বোধহয় ছিল বীরেন দেব। উনি হিন্দুস্থানের ওখানকার ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার। যতোবার উটি গেছি ওঁর বাড়ী হয়েই গেছি। এবং কোথাও কোনো অসুবিধা হয়নি। সবই কিন্তু পরিচয় পত্রের গুণে।

কোইম্বাটুর—হাজারিবাগ, পুণা ও দেরাদুনের মতোই, আধা পাহাড়ী সহর। হাজারিবাগের চেয়ে অনেক বড় ও বর্ত্তমান দেরাদুনের চেয়ে অনেক পরিচ্ছন্ন। বিশ বছর আগেও দেরাদুনকে ইয়োরোপীয় সহর বলে' ভ্রম হতো, কিন্তু এখন সেখানে দলে দলে সর্দারজীদের উপনিবেশ হওয়ায় গেলেই claustrophobia

অনুভব করি এবং মুসৌরী যাবার জন্য প্রাণটা আন্‌চান্ করে। কোইম্বাটুর পরিচ্ছন্ন তো বটেই, রাস্তাগুলিও প্রশস্ত। অদূরেই মেটুপালায়াম, যেখান থেকে উটি যাওয়ার পাহাড়ী রেল ধরতে হয়। বাসেও যাওয়া চলে। আমি কিন্তু ট্রেনেই যেতুম। ট্রেনে পাহাড়ী পথের শোভা যেভাবে উপভোগ করা যায় ট্যাক্সি বা বাসে তা হয় না। দেব মহাশয়ের বাংলোটি ছিল Ooty Road-এর উপরে। বারান্দায় বসেই উটির আভাষ পাওয়া যেত।

মেটুপালায়াম থেকে উটির রেলপথের সৌন্দর্য্য—কালকা-সিমলা রেল পথের সঙ্গে তুলনীয়। তবে কোনো টানেল নেই, যেখানে কালকা-সিমলার পথে একশো পাঁচটি টানেল। কিন্তু মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনগুলি বেশ বড় ও সমৃদ্ধ। কালকা-সিমলার পথে আছে দুটি উল্লেখযোগ্য ষ্টেশন। তার মধ্যে বারোস-এর মর্য্যাদা—সেটি প্রাতরাশের ষ্টেশন বলে'। এখানে গরম সামোসা, পুরী তরকারী সর্ব্বদাই টাটকা পাওয়া যায়। একটি বিলিতি কেতার Refreshment Room-ও আছে। জানতে ইচ্ছে করে, কিপলিং-ভক্ত কিন্তু ইংরেজী প্রচার বিরোধী ম্যালকম মাগারিজ কোন্‌টিতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেন। কালকা-সিমলা পথের অন্যতম বড় ষ্টেশন সোলন মদিরানুরাগীদের কাছে প্রিয়। ষ্টেশনটিও সুন্দর।

আমি প্রায় তিন সপ্তাহ করে উটিতে থাকতাম। এবং মাঝে মাঝে এক আধ দিন দেব মহাশয়ের বাড়ীতে অতিথি হয়ে রাত্রি যাপন করতাম। তখন আমি কলকাতার Statesmen পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলাম। এবং সেই সুবাদে কোইম্বাটুরের শিক্ষিত সমাজে আমার নাম অপরিচিত ছিল না। এর খেসারৎও আমার দিতে হলো,—স্থানীয় কলেজের সাহিত্য বাসরে বক্তৃতা দিয়ে। এরকম মাঝে মাঝেই আমাকে দিতে হয়েছে। তবে কাজটা আমার কাছে খুব প্রীতিকর নয়। কেবল ত্রিবান্দ্রমে বক্তৃতা দিয়ে অপার আনন্দ পেয়েছিলাম। এমন alert সাহিত্যরসিক ও তীক্ষ্ণধী শ্রোতা আমি ইংলণ্ডের বাইরে আর কোথাও পাইনি। যারা পশ্চিম বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শ্বাসরোধকর ও পঙ্কিল পরিবেশ দেখে জুগুপ্সা বোধ করেন তাঁরা যদি কিছুদিন ত্রিবান্দ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে আসেন অপার আনন্দ ও তীর্থযাত্রার সুফল পাবেন। আমার মনে হয় দক্ষিণ ভারতের সব বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষার যে-পরিবেশ এখনো আছে তা উত্তর বা পূর্ব্ব ভারতে কোথাও নেই।

কোইম্বাটুরে যাঁদের সঙ্গে পরিচিত হই, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যতম হলেন একজন অবসর প্রাপ্ত ফরেষ্ট অফিসার, নাম বোধহয় কৃষ্ণস্বামী (সঠিক

মনে নেই)। প্রাণিজগৎ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এম. কৃষ্ণণ (যাঁর লেখা বহু পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়) এবং দক্ষিণ ভারতের জিম করবেট, ব্যাঙ্গালোর-প্রবাসী কেনেথ এ্যাণ্ডারসন তাঁর বিশেষ বন্ধু, বললেন তিনি। নিজে ফরেষ্ট অফিসার ও রাইফেল চালনায় সুদক্ষ হয়েও প্রাণিহত্যার ওঁর বিশেষ অনীহা। সৌম্যমূর্ত্তি চন্দনচর্চিত ভদ্রলোককে ফরেষ্ট অফিসার বলে' বিশ্বাস করাই কঠিন। বরং মীনাক্ষী মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হলে' ওঁকে বেশী মানাত। ভদ্রলোক যাকে বলে, raconteur—আলাপ বিশারদ। বনজঙ্গলের গল্প এমন চিত্তাকর্ষক করে' বল্লেন যে, শুনলে এক কালের "সন্দেশ"-এর বিখ্যাত লেখক প্রমদারঞ্জন রায়ও তন্ময় হয়ে যেতেন। রাজনীতি সম্বন্ধেও ওঁর স্মৃতি-রোমন্থন সমান চিত্তাকর্ষক ঠেকলো। দেখলাম শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সম্বন্ধে ওঁর গভীর শ্রদ্ধা। ওঁর মতে বক্তা হিসাবে ভারতীয়দের মধ্যে তিনি অতুলনীয়। নেহরু ও সরোজিনী নাইডুকে তিনি শাস্ত্রী মহাশয়ের অনেক নীচে স্থান দিলেন। প্রসঙ্গ ক্রমে আরও জানলাম যে, চক্রবর্তী রাজা-গোপালাচারী ওঁর দূর সম্পর্কে আত্মীয় এবং খুবই ঘনিষ্ঠ, কিছুদিন আগেই ওঁর অতিথি হয়েছিলেন। দেব মহাশয়েরও রাজাজীর সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ফরেষ্ট অফিসার মহাশয় আমাকে ও দেব মহাশয়কে পরদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করলেন। মনে হলো, দেব মহাশয় তাতে খুব উৎসাহ বোধ করলেন না।

দেব মহাশয়ের অফিশ নিজের বাড়ীতেই কাজেই নিমন্ত্রণ রক্ষার কোনো অসুবিধা ছিল না। মেজেয় বসেই খাওয়ার ব্যবস্থা। মেনু দেখলাম, তুষার শুভ্র ভাত (যার পরিমাণ দেখলে এক বর্দ্ধমানের লোক ছাড়া আর সকলেই আতঙ্কিত হতো), এক বাটি সম্বর যাতে বেগুন ও কুমড়ো ভাসছে, দুই প্রস্থ সবজী, একটি ছোট বাটিতে এক বাটি ঘি, আর এক বাটি পায়েস। আর কিছু নারকেল ভাজা, যা আমার কাছে কখনোই খুব সুখাদ্য মনে হতো না। দেব মহাশয় দেখলাম অস্বস্তি বোধ করছেন। তিনি আমার কানে কানে বললেন, "কাউকে নিমন্ত্রণ করলে যে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয় সে প্রথা এদেশে নেই। বড় জোর একটা বেশী item—সে ওই পায়েসটা। আপনি কিছু মনে করবেন না—রাজা গোপালাচারীকেও ঠিক এইরকম খাইয়েছিল।

কোইম্বাটুরে তখন সাতটি বাঙ্গালী পরিবার ছিলেন। তার মধ্যেও তিনজন একক এবং অকৃতদার। তবে আমি যাওয়ার অল্প দিন আগে স্থানীয় বাঙ্গালী সমাজের মধ্যমণি শৈলেশ চন্দ্র বসু কোইম্বাটুর ছেড়ে যান। তিনি ছিলেন

CENTRAL LIBRARY

নেতাজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

মেটুপালায়াম থেকে উটি রেলপথের একটি প্রধান আকর্ষণ জনতার অভাব। গাড়ীতে ভিড় ছিলনা, অন্ততঃ আমার সময়ে ছিল না। তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনেও রাজকীয় নির্জনতা উপভোগ করা যেত, দেখা যেত নীল দিগন্তের সঙ্গে নীল পাহাড়ের মিতালি। সত্যেন দত্তের 'নীল পরি' এই ট্রেনে মোটেই বেমানান হতো না। মধ্যবর্ত্তী স্টেশনগুলির মধ্যে একদিন লাভডেল (Lovedale) ও দুই দিন কুনূর-এ নেমেছিলাম। কুনূর—বিশেষতঃ আপার কুনূর—একটি উদ্যান সহর। এত বিস্তৃত উদ্যান কোনো হিল-ষ্টেশনেই দেখা যায় না। যদি কালিম্পং সহরের সবটা গ্রেহাম্‌স্ হোম হতো তা হলে আপার কুনূরের অনেকটা আভাস পাওয়া যেত। কুনূর স্টেশনটিও বেশ বড়, উটির চেয়ে অনেক বড়। এখনো চোখ বুজলে কুনূর ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কাঁটাতারের বেড়া ঘেরা মে-ফ্লাওয়ারের ঝোপ মনে পড়ে। এই পথের অন্য একটি সুন্দর ষ্টেশন, ওয়েলিংটন। এটি একটি ক্যান্টনমেণ্ট বা সেনা নিবাস। ইংরেজ আমলে কতকগুলি হিল স্টেশন সৈন্যদের জন্য নির্দিষ্ট থাকতো তার মধ্যে ওয়েলিংটন অন্যতম। অপর দুটি হলো ল্যান্সডাউন ও চাক্রাতা। ল্যান্সডাউন আমার যাওয়া হয়নি কিন্তু চাক্রাতা গিয়েছি। দেরাদুন থেকে যেতে হয়, তবে মুসৌরীর বিপরীত দিকে, সাহরানপুর হয়ে। বাসও যায়, তবে পথ মসৃণ নয়, বেশ দুর্গম। চাক্রাতার একমাত্র আকর্ষণ তার তুষারদৃশ্য। একসঙ্গে নয়টি হিমালয় শৃঙ্গ, যার মধ্যে নন্দাদেবী, বন্দরপুঞ্চ ও কৈলাসও আছে! এ দৃশ্য চিরতুষারের দেশ কৌশানী থেকেও দেখা যায় না। অন্যকোনো হিল স্টেশনের তো কথাই ওঠে না। উচ্চতাও মুসৌরীর থেকে প্রায় দু হাজার ফিট বেশী। কাশ্মীরের বাইরে নারকাণ্ডা ও চাক্রাতাই বোধ হয় আমাদের সব চেয়ে উচ্চতম হিল ষ্টেশন। । তবে এও বলবো, নারকাণ্ডার নয়নাভিরাম পরিবেশ চাক্রাতায় নেই। আর নেই আশ্রয়স্থল ও ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা। 'আছে শুধু পাখা, আছে মহানভঅঙ্গন'—আর তুষারমৌলী। (ক্রমশ)

[৪৮ পৃষ্ঠার পরবর্ত্তী অংশ]

কাব্য-কবিতায় প্রকৃতির এ রুদ্র-মধুর রূপ যে বাস্তব-বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি লাভ করেছে তা কারো অজানা নেই। ঢাকায় নীলক্ষেতে বাসকালে তাঁর প্রকৃতি-প্রীতি সংহত রূপ লাভ করে পুষ্প-পরিচর্যার মধ্যে। মোহিতলালের পুষ্প-প্রীতির কথা বহুল-প্রচলিত। কিন্তু তাঁর পুষ্প-পরিচর্যা কত একনিষ্ঠ ছিল দুই এক প্রসঙ্গে তার পরিচয় পেয়ে অবাক হয়েছিলাম। মোহিতলালের অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে আসার পর তাঁর বাড়ী যাবার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। এক সকাল বেলায় মোহিতলালের বাসায় উপস্থিত হয়ে দেখি, মোহিতলালের চেহারা উদ্‌ভ্রান্তের মত, চোখ দুটি লাল, সমস্ত দেহে অবসন্নতার চিহ্ন সুস্পষ্ট। আগের রাত্রে ভীষণ ঝড়-ঝঞ্ঝা হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল তাঁর দেহ-মনের বিপর্যয়ের কারণ সেই ঝড়-ঝঞ্ঝা। যে গভীর সন্তান বাৎসল্যের সঙ্গে তিনি কতগুলি দুর্লভ ফুলের চারাকে নিত্য পরিচর্যায় বড় করে তুলছিলেন পূর্ব রাত্রের ঝড় ঝঞ্ঝায় সেগুলির সমূহ ক্ষতি হয়ে গেছে। একটির পর একটি স্তর পরম্পরার মধ্য দিয়ে মোহিতলাল কি ভাবে সেগুলিকে সযত্নে লালন করেছেন, কীট পতঙ্গ থেকে রক্ষা করবার জন্য কিভাবে গভীর রাত্রে ঘুম থেকে উঠে তাদের ওপরে মশারী খাটিয়ে দিতেন—তার বিস্তৃত বর্ণনা দিলেন। সাহিত্যের রূপ, রীতি ও তত্ত্বসন্ধানী মোহিতলালের এ গভীর পুষ্পপ্রীতি দেখে অবাক হলুম। জীবন চর্যায় মোহিতলাল অত্যন্ত সাদাসিধে হলেও দেশ-বিদেশ থেকে উৎকৃষ্ট গোলাপ-চারা সংগ্রহে তিনি যে অকাতরে অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠিত হতেন না, মোহিতলালের ঘনিষ্ঠমহল তা বেশ ভালোভাবেই জানেন।

মোহিতলালের অকৃত্রিম প্রকৃতি-প্রীতি এবং একনিষ্ঠ পুষ্পপ্রীতি তাঁর সৃষ্ট কাব্যের সৌন্দর্য্য বর্ধনে কি পরিমাণে সহায়ক হয়েছে তার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর কোন কোন কাব্য সমালোচক। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতী ছাত্র, বর্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলার অধ্যাপক ডঃ হরনাথ পাল 'মোহিতলালের কাব্যে ফুল' সম্পর্কে এক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। প্রকাশিত হলে মোহিতলাল-সমালোচনায় নতুন অধ্যায় যুক্ত হবে।

রোমান্সপ্রীতির মত ক্লাসিকপ্রীতি মোহিতলালের সাহিত্যিক-সত্তার মজ্জা-গত ধর্ম হলেও এ প্রীতি বিকাশলাভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাসূত্রে গভীর পঠন-পাঠনের ফলে। মোহিতলাল ইংরেজী সাহিত্যের মনোযোগী ছাত্র ছিলেন, ইংরেজীতে এম.এ. পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরীও হয়েছিলেন, কিন্তু পারিবারিক জীবনে অপরিহার্য অসুবিধা দেখা দেওয়ায় পরীক্ষা দিতে পারেননি। এজন্য

একদিন তিনি আমার কাছে দুঃখ প্রকাশও করছিলেন। তাঁর একনিষ্ঠ ইংরেজী সাহিত্যপাঠ শুধুমাত্র সাহিত্যের রূপরীতির উচ্চমানের সঙ্গে তাঁকে পরিচিত করায়নি, ইংরেজী সাহিত্যের এবং অনুবাদের মাধ্যমে পৃথিবীর উন্নত অনেক সাহিত্যের ক্লাসিকের সঙ্গেও তাঁকে পরিচিত করিয়েছিল।—সে পরিচয়ের পরিধি বিস্তৃত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময়। শেক্সপীয়রের অমর নাটকের নিবিষ্ট পাঠ, টমাস হার্ডির উপন্যাস, কন্টিনেন্ট ও রাশিয়ার উচ্চমানের সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যপাঠ মোহিতলালের মানসদিগন্ত প্রসারে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। সাহিত্য সমালোচনায় তিনি মুখ্যত বাংলা দেশের উনবিংশ শতাব্দীকে নির্বাচন করেছিলেন, যেহেতু এ শতাব্দীর কোন কোন প্রতিভাবান লেখকের সাহিত্যকর্ম ক্লাসিকতার লক্ষণাক্রান্ত। বস্তুতপক্ষে ইদানীংকালে উনবিংশ শতাব্দী নিয়ে যে বিস্তৃত আলোচনা-গবেষণা হয়েছে তার প্রথম পথপ্রদর্শন করেন ক্লাসিক-প্রীতিসম্পন্ন সাহিত্যিক মোহিতলাল মজুমদার।—সে সন্ধ্যাটির কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে, যেদিন দুরু দুরু বক্ষে আমি এম.এ. পরীক্ষার ফল জানবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে দাঁড়িয়ে আছি, পরীক্ষক সভায় দীর্ঘ আলোচনার পর মোহিতলালই সর্বপ্রথম বাইরে এসে আমাকে খবর দিলেন আমি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছি, এবং সানন্দে আমাকে নির্দেশ দিলেন 'উনবিংশ শতাব্দী' সম্পর্কে গবেষণা করবার জন্যে। মোহিতলাল নিজে উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক লেখক মধুসূদন এবং বঙ্কিমের সাহিত্যকৃতি এবং বিংশ শতকের শরৎচন্দ্রের কোন কোন অমর উপন্যাস সম্পর্কে যে মূল্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন, ইদানীং-প্রকাশিত খুব কম গবেষণা গ্রন্থ তাদের সমকক্ষতা দাবী করতে পারে। এটা মন্তব্য করতে দ্বিধা হয়না যে পাশ্চাত্ত্য ক্লাসিক সাহিত্য-পাঠের সাহায্যে মোহিতলালের সাহিত্যবুদ্ধি যদি পাকা ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হতো তবে তাঁর রচিত সমালোচনা সাহিত্য এত মূল্যসমৃদ্ধি অর্জন করতে সমর্থ হতো না।

সাম্প্রতিক কালে কোন কোন বামপন্থী সমালোচক মোহিতলালের সমালোচনায় সমাজচেতনার অভাব লক্ষ্য করেছেন এবং এ কারণে সে সমালোচনাকে আধুনিক সমালোচনার মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন। মোহিতলালের কাব্য সম্পর্কেও অনুরূপ অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে।

মোহিতলালের কাব্য এবং সমালোচনা সম্পর্কে এ সমালোচনা সর্বাংশে সত্য না হলেও কতকাংশে সত্য তাতে সন্দেহ নেই।

মোহিতলালের কাব্য ও সমালোচনা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে গেলে প্রথমেই একটা কথা মনে রাখা দরকার—মোহিতলাল ছিলেন সাহিত্যে

রসবাদী, যে রসকে সংস্কৃত আলংকারিকেরা বলেছেন 'ব্রহ্মস্বাদ সহোদর।' রাজনীতি-সমাজনীতি-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ সাহিত্য বলতে যা বোঝায় মোহিতলাল ছিলেন সে সাহিত্যের সাধক। সে সাহিত্যকে মোহিতলাল বলতেন চিরায়ত সাহিত্য—যা সর্বকালের সর্বদেশের সকল সহৃদয় লোক সমানভাবে উপভোগ করতে পারে। রাজনীতি, সমাজনীতি এমনকি ধর্মনীতিও যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়, নতুন রূপ গ্রহণ করে, কিন্তু মানুষের আবেগ, কামনা, বাসনা, প্রবৃত্তির প্রচণ্ড বেগ, মোহ, মোহভঙ্গজনিত হতাশা, প্রেম, মিলন, বিরহ—চিরকালীন বস্তু। মোহিতলাল মানবমনের চিরকালীন অভিমুখিনতাকে মুখ্যত অবলম্বন করে' তাঁর কাব্য ও সমালোচনা সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। বামপন্থী সমালোচকেরা মোহিতলালের চিরকালীন রসসৃষ্টি প্রয়াসের কথা ভুলে যান বলে তাঁর কাব্য-সাহিত্য সমালোচনায় এত মুখর।

মোহিতলাল নিজেও আমাকে অনেক সময় বলতেন—তিনি রসবাদী। সাহিত্যরস উপভোগ করতে পারে এমন লোকের সংখ্যা সমাজে চিরকালই স্বল্প ছিল, বর্তমান মস্তিষ্কচর্চা এবং বস্তুতান্ত্রিকতার যুগে সে সংখ্যা তো আরো অনেক কমে গেছে। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল আমাদের ক্ষয়িষ্ণু সমাজে প্রকৃত সাহিত্যরস উপভোগ করতে পারেন এমন লোকের সংখ্যা ভয়ানক হ্রাস পেয়েছে—সে কারণেই তাঁর কবিতা অনাদৃত। সাময়িক বিষয় নিয়ে যাঁরা কাব্য রচনা করেন তাঁদের কাব্যকবিতার সমাদরের কারণও এই। ভবভূতির মতই তিনিও আশা করতেন যেহেতু কাল অসীম এবং পৃথিবী বিপুলা সে কারণে মানুষের চিরকালীন আবেগ ও অনুভূতিনির্ভর তাঁর কাব্য কবিতা ভবিষ্যৎ মানুষের [illegible]দিন আদৃত হবেই (দ্রষ্টব্য : 'হুইনবার্ণের অনুসরণে,'—বিস্মরণী)। মোহিতলাল এ আকাঙ্ক্ষা যে অহেতুক নয়—তাঁর 'কালাপাহাড়,' 'নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর,' 'দেবদাসী' প্রভৃতি কবিতার এ যুগেও জনপ্রিয়তা তার অভ্রান্ত প্রমাণ।

বামপন্থী সমালোচকেরা সমাজের একশ্রেণীর লোকের সংগ্রামশীলতার চিত্র কিংবা সে শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি না দেখলেই সে সাহিত্যকে সমাজচেতনাহীন বলে ধিক্কৃত করেন। স্ব-দেশ, স্ব-জাতি ও স্ব-সমাজ নিয়ে সাহিত্যে মননশীল ভাবনাও জাগ্রত সমাজচেতনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচয়—একথা তাঁরা স্বীকার করতে চান না। মোহিতলালের সাহিত্য সমালোচনা এবং আলোচনার অধিকাংশ আবর্তিত হয়েছিল তাঁর ভাবগুরু বঙ্কিমের মতই এই ত্রি-মূর্তিকে অবলম্বন করে। তাঁর সমকালীন লেখকদের রচনায় যখনই দেশের মাটির গন্ধ পেতেন, দেশের অকৃত্রিম প্রাণধর্মের স্পন্দন শুনতেন, দেশের ঐতিহ্য গৌরবকে

প্রতিফলিত দেখতেন—তখনই সে রচনার রস আস্বাদন করে' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, মনোজ বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন কোন গল্প উপন্যাসে বাংলা দেশের অকৃত্রিম গণজীবন এবং প্রাণ-ধর্মের প্রতিফলন দেখে তিনি যে উচ্ছ্বসিত সমালোচনা লিখেছিলেন, তা এ সমস্ত লেখকের অন্তরে শুধু উৎসাহ-অনুপ্রেরণা জোগায় নি, সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতেও যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। মধুসূদনের মহাকাব্য প্রয়াসের ভিতর দেখতে পেয়েছিলেন তিনি বাঙালী জীবনের গীতি-কবিতা; দেশের অতীত গৌরব নিয়ে স্বপ্নদর্শী বঙ্কিমের ভাবোচ্ছাস তাঁর গ্রহিষ্ণু অন্তরে দেশপ্রেমের প্রেরণা জুগিয়েছে; আবার বাঙালী জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতা নিয়ে স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমের আবেগময় ক্রন্দন তাঁর স্পর্শকাতর অন্তরকে করেছে বেদনাতুর। শুধুমাত্র তাঁর গৃহগত অন্তরঙ্গ পরিবেশে নয়, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশে পর্যন্ত স্ব-দেশ এবং স্ব-জাতির ক্ষয়িষ্ণুতায় মোহিতলালের বেদনা-বিদীর্ণ অন্তরের বিক্ষোভ দেখে বিস্মিত হতাম। মনে হতো মোহিতলাল যেন তাঁর পূর্বপুরুষের বহুকাল সঞ্চিত অমূল্য মণিমুক্তা হারিয়ে পাগল হয়ে গেছেন!

আসলে মোহিতলালের সমাজচেতনা এ কালের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং আদর্শ-অনুপ্রাণিত কোন গোষ্ঠীবদ্ধ প্রয়াস নয়—সে চেতনা ছিল তাঁর সমস্ত ব্যক্তি-সত্তার সঙ্গে জড়িত-মিশ্রিত। এ কারণেই মোহিতলালের সমাজচেতনা এত আবেগময় ও এত বলিষ্ঠ। মোহিতলালের সমালোচনায় এবং সাহিত্যালোচনায় যে ঋজু কঠিন ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করে' সে রচনাকে এত মূল্যসমৃদ্ধ করেছে—সে বলিষ্ঠতার উৎসও খুঁজতে হবে মোহিতলালের এই সমাজচেতনার মধ্যে।

সমালোচনা ও সাহিত্যালোচনায় মোহিতলালের এ বলিষ্ঠ সমাজচেতনার কথা বলতে গিয়ে তাঁর বাঙালীর প্রাণধর্ম-অনুসন্ধান-তৎপরতার কথা মনে পড়ে।

মোহিতলাল একাধিক প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন—বাঙালীর প্রকৃত প্রাণ-ধর্ম নিহিত তান্ত্রিকতার মধ্যে। স্মরণাতীত কাল থেকে বাঙালী এই বীরাচারি তন্ত্রধর্মের সাধক—জীবনকে পৌরুষ এবং বীর্যের পথে উদ্বোধিত করাই ছিল সে-সাধনার অন্যতম লক্ষ্য। যতকাল বাঙালী এই বীরাচারী তন্ত্রধর্মের সাধক ছিল ততকাল তার ইতিহাস ছিল গৌরবমণ্ডিত। বাঙালীর জাতীয় জীবনে ভাঙন ধরে যখন বাঙালী এ বীরাচারী ধর্মবোধকে পরিত্যাগ করে' বৈষ্ণবধর্মের ভাব-বিহ্বলতা, কোমলতা ও নমনীয়তার দ্বারা প্রভাবিত হলো। এ ভাবধর্মী ধর্ম গ্রহণ করায় বাঙালী শুধু বলিষ্ঠতা হারায়নি, বস্তুদৃষ্টি থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। পৌরুষ-বীর্যহীন ভাবধর্মী ধর্মমোহে আচ্ছন্ন হওয়ায় বাঙালী ক্ষয়িষ্ণুতার সম্মুখীন হয়ে

জাতির পূর্বগৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

বাঙালী-জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতা নির্ণয়ে মোহিতলালের এ মতামত ঐতিহাসিক সত্যনির্ভর কিনা তা বিচার করবার সামর্থ্য তখনও আমার হয়নি। তবে পরবর্তীকালে শুনেছি তন্ত্রধর্ম সম্পর্কে মোহিতলাল পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য বহু খ্যাতনামা লেখকের মূল্যসমৃদ্ধ লেখা পড়েছিলেন। এ অধ্যয়নের প্রভাবেই নাকি তিনি বাঙালীর জীবনধর্ম সম্পর্কে উক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। মনে আছে, একদিন সকালে যেতেই মোহিতলাল আমার দিকে একখানি বই বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন,—একখানি চমৎকার বই বেরিয়েছে, পড়ে দেখো। বইখানি হাতে নিয়ে দেখি—বইখানির নাম 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ,' লেখক—শ্রীমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়।

মোহিতলাল নিজে তান্ত্রিক জীবনচর্যায় অভ্যস্ত ছিলেন কিনা জানিনা, তবে তন্ত্রধর্মের যে দিকটায় ব্যক্তির পৌরুষ-বীর্যের উদ্বোধন ঘটিয়ে তাকে বীরাচারী করে তোলে, সে দিকটির প্রতি ছিলেন পরম সশ্রদ্ধ। পরবর্তীকালে একদিন ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের সঙ্গে আলাপচারীতে জানতে পেরেছিলাম, শুধুমাত্র মনোধর্মের দিক থেকেই মোহিতলাল তান্ত্রিক ছিলেন, দীক্ষিত তান্ত্রিক তিনি নন। অথচ মোহিতলালের তন্ত্রধর্ম সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্য এবং দৃঢ় মত দেখে মোহিতলালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করেছিলেন তারাশঙ্কর।

মোহিতলাল নিজে তন্ত্রধর্মে দীক্ষিত হোন বা না হোন তাতে যায় আসেনা। তবে তিনি যে পৌরুষ বীর্য ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সাধক ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। পূর্বে মোহিতলালের রবীন্দ্রনাথ-আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথা জানিয়েছি, রবীন্দ্রনাথ ততক্ষণ তাঁর প্রিয়কবি যতক্ষণ স্বদেশের পৌরুষ, বীর্য এবং ঐতিহ্য উদ্‌ঘাটনে তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও লেখনী সমুদ্যত, মানবতার মাহাত্ম্য উদ্‌ঘাটনে তাঁর কবি-কল্পনা দীপ্তোজ্জ্বল। যে সমস্ত অবিস্মরণীয় কাব্যকবিতায় এবং গদ্য রচনায় রবীন্দ্রনাথের পৌরুষময় কবি-ব্যক্তিত্বের এ লক্ষণগুলি ফুটে উঠেছিল সে সমস্ত রচনা ছিল মোহিতলালের অতি প্রিয়—বারবার সেগুলি পড়েও তাঁর তৃপ্তি হতো না, আমাকে এবং আমার মত বহু সাহিত্য-জিজ্ঞাসুকে জোর করে আবৃত্তি ও পাঠ করে শুনাতেন। 'ইহার চেয়ে হতাম যদি আরব বেদুইন'—আবৃত্তি করতে করতে দিগন্তবিস্তৃত রুক্ষ মরুভূমিতে মুক্ত প্রাণধর্মী বেদুইনের বলিষ্ঠ ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হতেন; 'তার লটপট করে বাঘছাল, বৃষ রহি রহি গরজে'—আবৃত্তি করতে গিয়ে রুদ্রমূর্তি

শিব যেন তাঁর ওপর ভর করতো ; 'অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতী তীরে' উদার হৃদয় ঋষি যেখানে ভর্তৃহীনা জবালা-সন্তান সত্যকামকে ব্রাহ্মণত্বে প্রতিষ্ঠিত করছেন—উদাত্ত কণ্ঠে সে অংশ আবৃত্তি করতে করতে মোহিতলালের স্বাভাবিক কঠোর মূর্তির ওপর সুদূরের আলো এসে পড়তো ; 'কর্ণ কুন্তী সংবাদে' কর্ণের পৌরুষময় ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক ভাষণ আবৃত্তি করতে করতে মোহিতলাল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন ; 'নৈবেদ্য'র কবিতাগুলিতে প্রাচীন ভারতের বীরত্ব, মাহাত্ম্য, ক্ষমা, ত্যাগ, বৈরাগ্য—এককথায় ভারতবর্ষের যুগসঞ্চিত জীবনাদর্শ নিটোল মুক্তার মত সংহত রূপ পেয়েছে বলে' সে কাব্য ছিল মোহিতলালের অতি প্রিয়। আমার অকিঞ্চিতকর সাহিত্যজীবনে কালচারবিলাসী অনেক রবীন্দ্রভক্তকে আমি দেখেছি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পৌরুষবীর্যময় কবি-ব্যক্তিত্বের প্রতি মোহিতলালের মত এত সশ্রদ্ধ ও বিমুগ্ধ ভক্ত আর দেখিনি। মোহিতলালের প্রতি অহেতুক বিদ্বেষপরায়ণ যে সমস্ত সাহিত্যের ইতিহাসকার এবং সমালোচক মোহিতলালকে রবীন্দ্র-বিদ্বেষের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন আমার উক্ত মন্তব্য তাদের কাছে অভিনব মনে হলেও সত্য।

হৃদয়ধর্মের অনুশীলনের পরিবর্তে আত্যন্তিক বুদ্ধিচর্চা, ভঙ্গীপ্রধান কালচার-বিলাস, ও তার প্রভাবে স্বদেশচিন্তা ছেড়ে আন্তর্জাতিক জীবন-চিন্তা নিয়ে মাতামাতি,—এর অনিবার্য পরিণতিতে বাঙালীজীবনে ক্ষয়িষ্ণুতা—স্ব-দেশ এবং স্ব-জাতিপ্রেমিক মোহিতলালকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। এক সময় জাতীয় জীবনে সকল প্রকার মিথ্যার বিরুদ্ধে 'সত্যসুন্দর দাস' ছদ্ম-নামে একক অভিযান চালিয়েছিলেন তিনি। একদা গৌরবোজ্জ্বল বাঙালী জাতির এ ক্ষয়িষ্ণুতা দেখে মর্মান্তিক মর্মজ্বালা অনুভব করতেন মোহিতলাল। অনেক সময় অসহিষ্ণুও হয়ে উঠতেন। বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার স্বার্থের বিরুদ্ধে যাঁরা কথা বলতেন তাঁদের কুৎসিৎ ভাষায় ভর্ৎসনা করতে পর্যন্ত ছাড়েননি। আমি যখনকার কথা বলছি তার থেকে প্রায় একদশক পরে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিলেন আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। মোহিতলালের মৃত্যুর পর সেনেট হলে একটি স্মৃতি সভায় আচার্য সুনীতিকুমার সর্বসমক্ষে স্বীকার করেছিলেন, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে সেদিন মোহিতলাল ঠিকই বলেছিলেন। তাঁরই ভুল হয়েছিল। বঙ্গবাসী কলেজে অনুষ্ঠিত মোহিতলালের একটি স্মৃতিসভায় আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মোহিতলালের অসহিষ্ণু ব্যক্তিত্বের চমৎকার বিশ্লেষণ করে বলেন, বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি মোহিতলালের পরুষবাক্য ব্যবহার তাঁর গভীর

সত্যোপলব্ধি এবং প্রত্যয় সঞ্জাত—তাঁর রুদ্রমূর্তি এবং সত্য প্রকাশে রূঢ় পরুষ বাক্য তাঁর চরিত্রবৈশিষ্ট্যেরই পরিচায়ক। মোহিতলালের এর চাইতে ভালো চরিত্র-বিশ্লেষণ আমি আর কারো মুখে শুনিনি।

বিংশ শতাব্দীতে বাঙালী জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতা দেখে মোহিতলাল দৃষ্টি ফেরান উনবিংশ শতাব্দীর দিকে—যে-শতাব্দীতে পৌরুষবীর্যশালী কতিপয় বাঙালীর ব্যক্তিত্ব বাঙালী জাতিকে নবজীবনের তোরণপ্রান্তে উপনীত করেছিল। এই বীর্যবান বাঙালীব্যক্তিত্বের মধ্যে মোহিতলালের চেতনাকে সব চাইতে বেশী উদ্দীপ্ত করেছিল রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিবেকানন্দ। মোহিতলাল মনে করতেন এঁদের সর্বাত্মক প্রয়াসে বাঙালীজীবনে নব-জাগরণের বান আসে—প্রকৃত রেনেসাঁসের সূচনা হয়। এঁদের সুগভীর স্ব-দেশ ও স্ব-জাতিপ্রীতির কথা মোহিতলাল সগর্বে আমাদের ক্লাশে অধ্যাপনার সময় ঘোষণা করতেন। পরবর্তী কালে দেখেছি তাঁর সে সমস্ত বক্তব্য আরো বিস্তৃত ও চিন্তাশীল আকারে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'বাংলার নবযুগ' গ্রন্থে। বিংশ শতাব্দীর 'দেড়জন' বাঙালীর প্রতি মোহিতলাল ছিলেন পরম সশ্রদ্ধ। প্রথম, সূর্যের মত দীপ্তিমান, মহাকালের মত শক্তিমান, বাঙালীর অতি-প্রিয় সুভাষচন্দ্র —পরবর্তীকালে 'নেতাজী'। অমেরুদণ্ডী ক্ষয়িষ্ণু বাঙালী জাতির মধ্যে সুভাষ চন্দ্রের মত প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বশালী বীরের উদ্ভব মোহিতলালের কাছে ছিল পরম বিস্ময়। এই ব্যতিক্রমী বাঙালী বীরের উদ্দেশে মোহিতলাল তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন 'জয়তু নেতাজী' গ্রন্থে। আর আধ জন যে বাঙালী প্রবল ব্যক্তিত্ব প্রভাবে মোহিতলালের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, তিনি 'সাধনার' যুগের, স্বদেশী যুগের পৌরুষদৃপ্ত কবি রবীন্দ্রনাথ—যে প্রসঙ্গ আমি ইতোপূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করেছি। (রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের এরূপ ভাগাভাগি কতখানি যুক্তিসঙ্গত তা বিচার করবেন মননশীল পাঠক)। অবসর গ্রহণের পর কলকাতায় এসে ক্ষয়িষ্ণু বাঙালী জীবনকে তার পুর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবার আকাঙ্ক্ষায় মোহিতলালের শেষ প্রয়াস 'বঙ্গদর্শন' ও 'বঙ্গভারতী' সম্পাদনা। সাহিত্য সংস্কার, জাতীয় সংস্কার, জীবন চিন্তা ও জীবনধারণার ক্ষেত্রে বাঙালীর মানস ও চারিত্রের ইতোমধ্যে যে আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে তীক্ষ্ণধী মোহিতলাল বুদ্ধি দিয়ে তা বুঝতে পারলেও হৃদয় দিয়ে তা গ্রহণ করতে পারেন নি। এর অনিবার্য পরিণতিতে মোহিতলালের জাতীয় উজ্জীবন স্বপ্ন কিভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল—সে খবর মোহিতলালের অন্তরঙ্গ মহলে অনেকেরই জানা।

মোহিতলালের অন্তরটিকে তুলনা করা চলে ঝুনো নারকেলের সঙ্গে।

বাহিরটি অত্যন্ত কঠোর, রুক্ষ, কঠিন ; কিন্তু অন্তরটি সরস শাঁসে ভরা। অন্তর-বাইরের এ বৈপরীত্য শুধুমাত্র বহিরঙ্গ মহলে নয়, মোহিতলালের অন্তরঙ্গ মহলেও অনেক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেছে। কেউ কেউ মোহিতলালের চরিত্র হননেরও চেষ্টা করেছেন। এ চরিত্র হননকারীদের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন লোকান্তরিত রাজনৈতিক নেতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ। তাঁর আত্মস্মৃতি কথায় তিনি মোহিতলালকে 'আত্মম্ভরী' ও 'আত্ম-কেন্দ্রিক' বলে অভিহিত করেছেন। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে মোহিতলাল অতিরিক্ত মাত্রায় সচেতন ছিলেন সন্দেহ নেই। এ সচেতনতা অনেক সময় চরম (extreme) ভাষায় দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত হতো—যা শুনতে অনেকটা আত্মম্ভরিতার মতই শোনাত। কিন্তু বাস্তবপক্ষে যা আত্মম্ভরিতার মত শোনাতো তা ছিল তাঁর দৃঢ় মতেরই অভিব্যক্তি। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদের মত রাজনীতির বন্ধুর পথে বিচরণকারী ব্যক্তির পক্ষে মোহিতলালের এ চরিত্র বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করবার ক্ষমতা ছিলনা বলেই মনে হয়,—যেমন ছিল সদহৃয় সমালোচক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের—মোহিতলালের চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যাঁর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। সম্প্রতি সুরসিক সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামীর 'যখন সম্পাদক ছিলাম' গ্রন্থেও দেখলাম তিনি সকৌতুকে মোহিতলালকে 'সাহিত্যের অভিভাবক' বলে বর্ণনা করেছেন। মোহিতলালের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণে এ অভিধাও খুবই সহৃদয়। অভিভাবকের ভূমিকা মোহিতলালের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বে অবশ্যই ছিল, সে ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার জন্য তিনি জীবনে কৃচ্ছ্রসাধনাও কম করেন নি। আসলে মোহিতলালের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব নির্ণয় প্রসঙ্গে নির্দ্বিধায় এটা বলা চলে সাহিত্যের অভিভাবকত্বের অভিমান থাকলেও আত্মম্ভরী তিনি ছিলেন না। থাকলে সমকালীন অপর সাহিত্যিকের প্রতিভাকে এত উচ্ছ্বসিতভাবে পাঠক সমাজে তুলে ধরতে পারতেন না। দ্বিতীয়ত, মোহিতলালকে 'আত্মকেন্দ্রিক' বলার অর্থ তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা করার সম্পূর্ণ অক্ষমতা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি এ কথা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি, মোহিতলালের মত এত আত্মবিস্মৃত, উদার, গুণগ্রাহী সাহিত্যিক বর্তমান সাহিত্য জগতে আমি খুব কমই দেখেছি। সত্যিকারের প্রতিভাবান, এমনকি অকৃত্রিম সাহিত্যপ্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তির পরিচয় পেলে কী করে তাকে তিনি তৃপ্ত করবেন ভেবে পেতেন না। বিশেষ করে কাব্য প্রীতির পরিচয় পেলে তিনি স্থান কাল এমনকি নিজের সাংসারিক অবস্থার কথা পর্যন্ত

বিস্মৃত হতেন। সত্যিকারের কবিতাপ্রিয় ব্যক্তির সঙ্গে কাব্যালোচনায় মশগুল হয়ে গেলে মাঝে মাঝে তিনি হাঁক দিতেন—'ওগো, অমুক বাবুর জন্য লুচি পাঠিয়ে দাও।' গৃহিনীর ভাঁড়ারে ময়দা, ঘি, এবং লুচির সঙ্গে খাবার অন্যান্য উপকরণ আছে কিনা সে সমস্ত খোঁজ নেবার কোন প্রয়োজনই বোধ করতেন না। সহৃদয় ব্যক্তির অন্তরের সঙ্গে নিজ অন্তরকে মিশিয়ে দেবার এ আত্ম-বিস্মৃত ভাবোন্মাদনা 'আত্মকেন্দ্রিক' লোকের পক্ষে সম্ভব কিনা কমরেড্ আহমেদের মত মোহিতলালের চরিত্র-হননকারীরা তা বিচার করে দেখবেন।

সম্প্রতি 'বিদ্রোহী নজরুল' নামক একটি যাত্রাপালায় মোহিতলালের মৃত্যুর এতকাল পরেও সেই চরিত্রহননের একই প্রয়াস দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। নাট্যকার ব্রজেন দে-র সঙ্গে গ্রীন রুমে আলাপ করে দেখলাম, ভদ্রলোক মোহিতলালের জীবন এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মোহিতলালকে কখনও চোখেও দেখেন নি, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর বিরোধী শিবিরের লোকও নন। তথাপি নাটকে মোহিতলালকে এমনভাবে উপস্থিত করেছেন—যাতে তাঁর আদর্শবাদী বলিষ্ঠ সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে। মনে হয়, অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে একশ্রেণীর স্বার্থান্ধ লোক মোহিতলালের চরিত্র হননের চেষ্টা করছে। এরূপ চরিত্র হনন প্রয়াসকে সংঘবদ্ধভাবে বাধা দেওয়া সুবিবেকী সাহিত্যিক মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি।

অপরাজিত বিভূতিভূষণ

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়

(চোদ্দ)

পূর্ব্ববর্তী অধ্যায়ে 'কেদার রাজা' উপন্যাস প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা আছে। আরোও কয়েকটি কথা বলতে হবে।

শ্রীযুক্ত প্রসিত রায় চৌধুরী এবং আরোও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি 'কেদার রাজা' উপন্যাসের ভগ্ন দেব দেউল ও মন্দিরাদির কথা বিভূতিভূষণ রাজপুর গ্রামের পটভূমিকায় বর্ণনা করেছেন বলে অনুমান করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরোও একটি মতও প্রচলিত আছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়-এর 'The School of Oriental and African Studies'-এর বাংলা ভাষার অধ্যাপক এবং 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের ইংরেজি সংস্করণ-এর সহযোগী অনুবাদক :

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় মনে করেন—বিভূতিভূষণ প্রাচীন যশোরের চাঁচড়া রাজবাড়ি পরিদর্শন করে 'কেদার রাজা' উপন্যাস লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। তিনি 'বিভূতি রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় 'কেদার-রাজা' উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে একথা উল্লেখও করেছেন এবং বিভূতিভূষণের 'তৃনাঙ্কুর' দিনলিপি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

বিভূতিভূষণের সহধর্মিনী শ্রীযুক্তা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত হোলো—কৃষ্ণনগর রাজবংশের পূর্ব নিবাস 'শিব নিবাস'-এর ভগ্ন দেবায়তন ও অট্টালিকা দেখে বিভূতিভূষণ 'কেদার রাজা' লেখার প্রেরণা পান। 'শিব নিবাস' থেকে বারাকপুর গ্রামের সম্পন্ন 'রায় বাড়ি'তে 'একটি বালিকা' বধূ হয়ে এসেছিলেন। বালক বিভূতিভূষণ তাঁর সঙ্গে ২।১ বার বাপের বাড়ী 'শিবনিবাস'-এ নাকি বেড়াতে গিয়েছিলেন। তাঁর বাল্যস্মৃতিও 'কেদার রাজা' উপন্যাসের পটভূমি হওয়া বিচিত্র নয়।

'কেদার রাজা' সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক অংশ তাঁর 'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপি থেকে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

'সেদিন নীরদবাবু ও সুশীল বাবুর সঙ্গে মোটরে বহুকাল পরে যশোরে গিয়েছিলাম—আবার স্কুলটা দেখলাম—আবার চাঁচড়া দেখলাম। শীতের সন্ধ্যায় চাঁচড়া দশমহাবিদ্যার মন্দির দেখতে দেখতে কি অদ্ভুত ভাব যে মনে জাগছিল—চারি ধারের ঘন সবুজ বেত ঝোপ, পুরোনো মজা দীঘি—মহলের পর মহল নির্জ্জন, সঙ্গীহীন, ধূসর সান্ধ্য ছায়ায় শ্রীহীন অথচ গভীর রহস্যময় পাথরপুরীর মত দেখাচ্ছিল। পেছনের ঘাট-বাঁধানো প্রকাণ্ড দীঘিটাই বা কি অদ্ভুত! রাজা রামচন্দ্র খাঁয়ের চাল ধোয়া পুকুরই বা দেখলাম কত কাল পরে। একটা সুন্দর প্লট মাথায় এসেছে।...এই ভাঙ্গাপুরী, বনেদী ঘরের দারিদ্র্য, জীবনের দুঃখ কষ্ট—Back-ground-এ সব সময়ই পুরাতন দিনের আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য্য—সহস্র tradition—এই সব নিয়ে।' ('বিভূতি রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২০৩)।

সম্ভবতঃ বাল্যকালে দেখা 'শিব নিবাস' এবং যৌবনে দেখা রাজপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং ১৯২৯-১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে দেখা পুরনো যশোরের চাঁচড়া রাজবাটী তাঁকে 'কেদার রাজা' লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তবে বর্তমান নিবন্ধকারের দৃঢ় ধারণা—প্রথম যৌবনে দেখা রাজপুরের 'রোমান্টিক' পরিবেশ

'কেদার রাজা' রচনার সময় বেশী ছাপ ফেলেছিল বিভূতিভূষণের মনের মধ্যে। ভবিষ্যত 'গবেষক'রাই এর বিচার করে স্থির সিদ্ধান্ত নেবেন। আপাততঃ এই প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করা যাক।

০ ০ ০

রাজপুর-হরিনাভি অঞ্চলের লোকের মুখে এখনো শোনা যায়—বিভূতিভূষণ সেখানে থাকতে প্রায়ই ভগ্ন দেব দেউলে গিয়ে বসে থাকতেন অলস মধ্যাহ্নে অথবা অপরাহ্নকালে দীর্ঘশীর্ষ গাছের ছায়ায়। রাজপুরের কাছাকাছি আরো অনেক জায়গায় তিনি বেড়াতে যেতেন। গড়িয়ার জলার জ্যোৎস্না ও বোড়াল গ্রামের রাজনারায়ণ বসুর ভিটা ও ত্রিপুর সুন্দরী দেবীর মন্দির দেখতে বিভূতি-ভূষণ প্রায়ই সেখানে যেতেন। বোড়ালের একটা জঙ্গল বিভূতিভূষণের বড় প্রিয় বেড়ানোর জায়গা ছিল। বোড়ালের বাসিন্দারা অনেকেই দেখেছেন বিভূতিভূষণকে ঐ জঙ্গলের মধ্যে বসে থাকতে।

বিভূতিভূষণের আরও একটা প্রিয় স্থান—রাজপুরের দুর্গারাম করের গঙ্গার ধার ও তাঁর রাসমঞ্চ—এখনো ভগ্ন অবস্থায় টিঁকে আছে।

বিভূতিভূষণের সঙ্গে প্রায়ই ভ্রমণে সঙ্গী হোতেন গ্রামের 'বালক কবি' হিসেবে খ্যাতিমান পাঁচুগোপাল। যে জোর করে বিভূতিভূষণকে সাহিত্যক্ষেত্রে নামিয়েছিল।*

পাঁচুগোপাল না হোলে 'বঙ্গবাণী' হয়তো একজন মহাশক্তিশালী কথা সাহিত্যিকের পূজার অর্ঘ্য থেকে বঞ্চিত হোতেন। অবশ্য বীজ বপন করে রেখেছিলেন বিভূতিভূষণের পিতা নিজেই। অনুকূল আবহাওয়ায় বীজ থেকে ফল ধরতে শুরু করে। হয়তো কিছু আগে বা পরে ব্যাপারটা ঘটতো নিশ্চয়ই। বিভূতিভূষণ নিশ্চয়ই—অল্প বয়স থেকেই হাত 'মশ্‌কো' করতেন। তাঁর কাছে উদাহরণস্বরূপ তাঁর কথক পিতা তো ছিলেনই। তিনি 'তৃনাঙ্কুর' দিনলিপির এক জায়গায় লিখেছেনও পিতার আরব্ধ কাজ শেষ করতে

* দ্রঃ 'আলেখ্য' (৫ম বর্ষ, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮১)। 'কথা সাহিত্য' (দোল সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৭৯) এবং বিভূতিভূষণের নিজের লেখা নিবন্ধ ও 'বেতারে' পঠিত-সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশের ইতিহাস—"আমার লেখা" স্মরণে রাখা দরকার। সেখানে বিশদভাবে পাঁচুগোপালের কথা বিভূতিভূষণ লিখেছেন। তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রাথমিক পর্ব্বের কথাও সেখানে বর্ণিত হয়েছে।

পেরে তিনি তৃপ্তবোধ করেছেন। কথাটা তিনি লিখেছিলেন 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশ প্রসঙ্গে তাঁর 'তৃনাঙ্কুর' দিনলিপিতেঃ 'আজ বই বেরুল। এতদিনের সমস্ত পরিশ্রম আজ তাদের সাফল্যকে লাভ করেচে দেখে আমি আনন্দিত। প্রবাসী অফিসে বসে এই কথাই কেবল মনে উঠছিল সে আজ মহালয়া, পিতৃ তর্পণের দিনটা, কিন্তু আমি তিলতুলসী তর্পণে বিশ্বাসবান নই—বাবা রেখে গিয়েছিলেন তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করবার জন্যে, তাই যদি করতে পারি, তার চেয়ে সত্যতর কোনো তর্পণের খবর আমার জানা নেই।

আজ এই নির্জ্জন, নীরব রাত্রিতে বহুদূরবর্ত্তী আমার সেই পোড়ো ভিটার দিকে চেয়ে এই কথা মনে হোল যে তার প্রতি সন্ধ্যা, প্রতি বৈকাল, প্রতি জ্যোৎস্না-মাখা রাত্রি, তার ফুল, ফল, আলো, ছায়া, বন, নদী—বিশ বৎসর পূর্ব্বের সে অতীত জীবনের কত হাসি কান্না ব্যথা বেদনা, কত অপূর্ব্ব জীবনোল্লাসের স্মৃতি আমার মনকে বিচিত্র সৌন্দর্য্যের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল। আমার সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির প্রচেষ্টার মূলে তাদেরই প্রেরণা, তাদেরই সুর।' ('বিভূতি রচনাবলী,' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬২)।

তবু পাঁচুগোপালকে ধন্যবাদ-তিনি জোর করে হাতে ধরে সাহিত্য ক্ষেত্রে না নামালে বিভূতিভূষণের আত্মবিকাশের—স্বকীয় পথের-দিশা খুঁজে পেতে হয়তো আরো বিলম্ব হোত। এমনিতেই তিনি বিলম্ব করে সাহিত্য ক্ষেত্রে এসেছিলেন। চলেও গেছেন অকালে। পাঁচুগোপাল একটা মহৎ কাজ করেছেন। চিরকাল তিনি বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে ধন্যবাদের পাত্র হয়ে থাকবেন।

* * *

পূর্ব্ববর্ত্তী কোনো অধ্যায়ে রাজপুরে বিভূতিভূষণের প্রথম 'গল্প লেখার গল্পের কথা' লিখেছি। আবারও লিখতে হবে। তার আগে পাঁচুগোপালের একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। পাঁচুগোপালের ভালো নাম যতীন্দ্র মোহন রায়। রাজপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান তিনি। বিভূতিভূষণের থেকে তিনি কিঞ্চিৎ বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর ছিল সাহিত্য চর্চ্চা ও যাত্রা অভিনয়ের শখ। 'সদগতি' নামে তিনি একটি যাত্রার পালাও লিখেছিলেন।

পরিণত বয়সেও যাঁরা তাঁকে দেখেছেন—তাঁরাও বলেন চিরকাল পাঁচুগোপালের এ শখগুলি বিদ্যমান ছিল। অভিজাত বংশের রক্ত ছিল তাঁর ধমনীতে। অর্থকরী বিদ্যার দিকে তাঁর নজর ছিল না। ভূস্বামী বংশের সন্তান

ছিলেন তিনি। তাঁর আভিজাত্য বোধ ছিল আলাদা। তাঁর ভাগ্নী জামাই ছিলেন বিভূতিভূষণের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী।* 'কলেজ-জীবন' থেকে ননীগোপালের সঙ্গে বিভূতিভূষণের বন্ধুত্বের সূত্রপাত। আমৃত্যু সে বন্ধুত্ব অটুট ছিল। ননীবাবুর স্ত্রী 'জতু'র পিত্রালয় ছিল রাজপুর। ননীবাবু যে বিভূতিভূষণের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে গণ্য হোতেন, এ কথা আগেই বলেছি। তাঁর স্ত্রী 'জতু' বা জ্যোতির্ময়ীকে বিভূতিভূষণ সহোদরার মত জ্ঞান করতেন। বিভূতিভূষণ তাঁর একাধিক গ্রন্থে ননীবাবু ও জ্যোতির্ময়ীর কথার উল্লেখ করেছেন। ('তৃনাঙ্কুর,' 'বিভূতি রচনাবলী', দ্বিতীয়খণ্ড, পৃ. ২০২)।

বিভূতিভূষণের বন্ধু রাধারমণ মিত্র মনে করেন 'দৃষ্টি-প্রদীপ' উপন্যাসের 'জিতু' চরিত্রটি তিনি প্রধানত ননীবাবুকে দেখেই লিখেছিলেন (যদিও বর্ত্তমান নিবন্ধকারের এ বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। তার কারণ পরবর্ত্তী কোনো অধ্যায়ে বিবৃত করা যাবে।)

* * *

বিভূতিভূষণ রাজপুরে থাকতেই মাঝে মাঝে মনীষী হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ের কাছে যেতেন 'থিওসফি' চর্চ্চার জন্যে—এমন কথা শোনা যায়। প্রথমা পত্নী গৌরীদেবীর মৃত্যুর পরে পরলোকতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা সুরু করেছিলেন। জাঙ্গীপাড়াতেও কিন্তু এ চর্চ্চা করতেন এমন কথা শোনা যায়। হোতে পারে-কলকাতার আরও কাছে রাজপুর—সেজন্যে মাঝে মাঝে হীরেন বাবুর কাছে যেতেন। হীরেন বাবু বিখ্যাত আইনজ্ঞ, সাহিত্য-রসিক এবং সর্ব্বোপরি' 'ব্রহ্মবিদ্যার' চর্চ্চা করতেন। 'বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যদের মধ্যেও তিনি অন্যতম। তিনি সেকালের বিখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা অমরেন্দ্র নাথ দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হোলেন একালের অন্যতম বিখ্যাত পরলোকগত কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প তিনি রাজপুরে বসেই লিখেছিলেন। ১৩২৮ সালের মাঘ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে গল্পটি 'উপেক্ষিতা' নামে প্রকাশিত হয়। গল্পটির নাম বিভূতিভূষণ প্রথমে রেখেছিলেন 'পূজনীয়া'। কিন্তু 'প্রবাসী'তে প্রকাশের সময় গল্পটির নাম পালটে রাখেন 'উপেক্ষিতা'। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময়—গল্পের শেষাংশও বাদ যায়। সেখানে পারলৌকিক বা অলৌকিক

* সংবাদদাতা : রাধারমণ মিত্র

CENTRAL LIBRARY

জগতের কথা ছিল। 'বিভূতি স্মৃতি সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১৩৫৭) 'শনিবারের চিঠি'তে সম্পাদক সজনী কান্ত দাস লিখেছিলেন: "...১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী (১লা মাঘ ১৩২৮)তারিখেই বিভূতিভূষণ গল্প-লেখক রূপে বঙ্গ সাহিত্যের আসরে আবির্ভূত হন। সুতরাং ইহা যে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দেই লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার পত্নী বিয়োগ হইয়াছে, তিনি পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধেও চিন্তা করিতেছেন। বিভূতিভূষণের সাহিত্যের যাহা বৈশিষ্ট্য, তাহার সকলগুলিই বীজাকারে তাঁহার এই প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা'য় পাইতেছি। সেই শুভ্র শুচিতা বোধ, সেই খাদ্য-লোলুপতা, সেই আদেখ্‌লেপনী এবং সেই জন্মান্তর রহস্য, অর্থাৎ 'পথের পাঁচালী' ও 'দেবযান' দুই-ই এই গল্পটিতে উঁকি মারিতেছে। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় ('মেঘ মল্লার')" আমার সাহিত্যিক জীবনের সর্ব্ব প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা'—সুতরাং গল্পটির ওপর আমার মায়া থাকা স্বাভাবিক"—এই রূপ ভূমিকা করিয়া বিভূতিভূষণ কেন যে 'দেবযান' অংশ এই গল্পে পরিত্যাগ করিলেন, তাহা গবেষণার বিষয়। পরিত্যক্ত অংশটি এই—

"এ কাকে দেখলুম বলবো?"

"আমাদের এই পৃথিবীর জীবনের বহু উর্দ্ধে যে অজ্ঞাত রাজ্যে অনন্তের পথের যাত্রীরা আবার বাসা বাঁধবে, হয়তো যে দেশের আকাশটা রঙে রঙে রঙীন, যার বাতাসে কত সুর, কত গন্ধ, কত সৌন্দর্য্য, কত মহিমা, ক্ষীণ জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া কত সুন্দরী তরুণীরা যে দেশের পুষ্পসম্ভারসমৃদ্ধ বনে উপবনে ফুলের গায় বসন্তের হাওয়ার মতো তাঁদের ক্ষীণ দেহের পরশ দিয়ে বেড়াচ্ছেন, সেই অপার্থিব দিব্য সৌন্দর্য্যের দেশে গিয়ে আমাদের এই পৃথিবীর মা বোনেরা যে দেহ ধারণ করে' বেড়াবেন,—এ যেন তাঁদের সেই সুদূর ভবিষ্যৎ রূপেরই একটা আভাস আমার বৌদিদিতে দেখতে পেলুম।"...

"আমরাও বহু সম্ভাবনার আভাস পাইলাম এই রচনাটুকুর মধ্যে। মহা সাধক বিভূতিভূষণের তখন বৃহত্তর কীর্ত্তির জন্য প্রস্তুতির কাল। অনন্তের সঙ্গে সুরসামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা চলিতেছে। তাহার জন্য এই লৌকিক জগতের অসংখ্য বিচিত্রতা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের ব্যাকুল সন্ধান চলিতেছে, তিনি দুই চোখ ভরিয়া দেখিতেছেন চারিদিকে, বিজ্ঞান-দর্শন হইতে সংগ্রহ করিতেছেন মনের খোরাক, নানা সচিত্র ভ্রমণ কাহিনী হইতে পৃথিবীর বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জন্মান্তর-রহস্য—উদ্ঘাটনেরও প্রয়াস করিতেছেন।" ('বিভূতি ভূষণের জীবন-কথা', সজনীকান্ত দাস, 'শনিবারের চিঠি', (বিভূতি-স্মৃতি সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭।)

বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা'র মধ্যে তাঁর সমাজ জীবনের সাহিত্যে-সম্ভবনার ইঙ্গিত নিহিত আছে—দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর সমগ্র সাহিত্য-জীবনের মূল সুর এই গল্পটির মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে। যশস্বী সমালোচক ও বাংলা সাহিত্যের জহুরী সজনীকান্তের চোখে এটা অনেক আগেই ধরা পড়েছিল। এই গল্পটিকে কেন্দ্র করেই তিনি তাঁর পরিধি বিস্তার করেছেন সাহিত্য রচনার বিভিন্ন পর্ব্বে। ক্রমশ ডানার পরিধি বিস্তার করেছেন তিনি। অতএব একথা হয়তো মিথ্যে নয়—তিনি হীরেন্দ্র নাথ দত্তের কাছে যেতেন 'থিওসফি'র চর্চ্চার জন্যে।

চিরকাল তাঁর মধ্যে দেখেছি জ্ঞানের ক্ষুধা ছিল। জানবার আগ্রহ ছিল অত্যন্ত তীব্র। যে মানুষের জানবার আগ্রহ নেই—সেই মানুষকে তাঁর পছন্দ ছিল না। চলমান গতিশীল জীবন তিনি ভালোবাসতেন। স্থানুবৎ জীবনকে তিনি বিষের মত জ্ঞান করতেন। গতির আবেগ তাঁকে স্থির থাকতে দেয়নি। ঋতু চক্রের আবর্ত্তনের মত তাঁকে তাড়িত করছে—আবর্ত্তিত করেছে—"গতিই জীবন—গতির দৈন্যই মৃত্যু"—একথা তাঁর বারবার মনে হয়েছে। 'অটোগ্রাফে'র খাতায় তিনি একথা লিখে দিতেন। আমার বড়দি'র অটোগ্রাফে'র খাতায় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে একথা লিখে দিয়েছেন—আমার 'অটোগ্রাফে'র খাতায় লিখেছেন ইংরেজী ১৯৪৬ কিংবা ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে। অতএব তাঁর মূল চিন্তা ধারার পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তন ঘটতে সময় লাগতো। যা তিনি উপলব্ধি করতেন সে কথা দৃঢ়মূল হয়ে তাঁর মনের মধ্যে গেঁথে থাকতো।

* * *

রাজপুরে এসে আবার নতুন করে ঘর সংসার সুরু করলেন মাতা মৃণালিনী। মৃণালিনী মহানন্দের দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী। মহানন্দের থেকে বয়সে অনেক ছোট। তাঁর সঙ্গে বিভূতিভূষণের পিতার বিবাহ হয় বঙ্গাব্দ ১২৯৬ সালের ২৪ জ্যৈষ্ঠ। তখন মৃণালিনী দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা। তা হোলে তাঁর আনুমানিক জন্ম সময় হোলো বঙ্গাব্দ ১২৮৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস। মৃণালিনীর সঙ্গে বিবাহেরও অনেক পরে অষ্টাদশী মায়ের ক্রোড়ে বঙ্গাব্দ ১৩০১ সালের ২৮ ভাদ্র (মাতুলালয় কাঁচরা পাড়ার কাছে মুরাতি পুরে) জন্ম গ্রহণ করেন বিভূতিভূষণ।

হরিনাভি স্কুলে চাকুরী পেয়ে মা ও ছোট ভাই মুটুবিহারীকে নিয়ে এলেন রাজপুরে বিভূতিভূষণ। প্রধান শিক্ষক কিশোরী মোহন ভাদুড়ীর শ্বশুর নগেন্দ্রনাথ বাগ্‌চির বাড়ীতে বাসা নিলেন। একথাও আগেই বলেছি।

পুত্রের সংসার সম্পর্কে উদাসীনতা এবং বিষন্নতা নিশ্চয়ই পীড়া দিত

মৃণালিনীকে। অত অল্প বয়সে বিপত্নীক বিভূতিভূষণের আচরণ ও উদাসীনতা দেখে তাঁর মনে অনেক খট্‌কা এসে জমা হোত। আশঙ্কা হোত ছেলে শেষ পর্য্যন্ত সন্ন্যাসী না হয়ে যায়।

'দৃষ্টি-প্রদীপ' উপন্যাসে জিতুর জন্যে মৃত্যুশয্যায় মায়ের কাতরতা দেখা যায়-জিতু সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছে ভেবে। বিভূতিভূষণ সম্পর্কেও মায়ের এমন ধারণা জন্মে ছিল। এই প্রসঙ্গে 'স্মৃতির রেখা' দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ নিজেই লিখেছেন: "তারপর ফিনিকফোটা জ্যোৎস্নারাত্রে কাশবনের মধ্য দিয়ে আমি ও নায়েব পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে এসে সীমানার কাছে যেখানে ও-বেলা মহিষ দেখেছিলাম ওখানে এলাম। মনে হ'ল দূরে আমার বাড়ি। এই জ্যোৎস্না-ওঠা সন্ধ্যায় মার সঞ্চিত হাঁড়িকলসী গুলো প'ড়ে আছে জঙ্গলভরা ভিটেতে। মার হাতের সজনে গাছটা এই ফাগুন দিনে জঙ্গলের মধ্যে ফুলে ভর্ত্তি হয়ে উঠেছে। কেউ দেখছে না, কেউ ভোগ করছে না। হরি রায়ের জমিটুকু নেবার কথা মা যখন সইমাকে অনুরোধ করেছিলেন, তখন তিনি জানতেন না যে ছেলে তাঁর ঘরকুনো গেরস্ত গোছের ছাপোষা গেঁয়ো মানুষ হবেনা। সে দেশে দেশে বহু দূরে বহু সমাজে পাহাড়ে পর্ব্বতে ঘোড়ায় ষ্টিমারে ট্রেনে—সারা জগতের অধিবাসী হয়ে বেড়াবে। জীবনের যাত্রাপথের সে হবে উৎসাহী উন্মত্ত পথিক-পথের নেশাতেই ভোর।

"মা ছিলেন গৃহলক্ষ্মী, এ দরিদ্র ঘরে বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত এসে অল্প সাজিয়ে গুছিয়ে চালিয়ে গিয়েছেন। সেই চালভাজা—সেই সব। ঘর কন্যা সাজাবার বুদ্ধি যেমন মেয়েদের থাকে, তার বেশী তারা কিছু জানে না, বোঝেও না। মাও ছিলেন তেমনি। মা চিরদিন ওই বাঁশ বনের ঘাটে, তেঁতুল তলায় শান্ত জীবনযাত্রা সংকীর্ণ ছোট গণ্ডীর মধ্যেই কাটিয়ে গিয়েছেন—সে জীবনের বাইরে তিনি অন্য কোন জীবনের সন্ধানও জানতেন না। তাই তাঁর সজনে গাছ পোঁতা—হরি রায়ের জমি নেবার পরামর্শ, বিয়ে না করতে চাওয়ায় সংসার উল্টে গেল এই ভেবে কান্না—যেন সত্যই তাঁর সংসার উল্টেই গেল—তাঁর সংসার—আমার সংসার নয়।" (দ্র: 'বিভূতি-রচনাবলী প্রথম খণ্ড, পৃ ৪২০)

* * *

বিভূতিভূষণের প্রথমা পত্নী গৌরীদেবীর মৃত্যুর পরে মৃণালিনী ছেলের আবার বিয়ে দিতে চাইতেন। এই নিয়ে মায়েতে ছেলেতে অশান্তি হোত। বিভূতিভূষণের শোকবিহ্বল, সংসারে-অনাসক্ত উদাসীন মন দেখে তিনি ভীত হয়েছিলেন। বিভূতিভূষণের মাতুল বসন্ত কুমারের কাছে শুনেছি—গৌরীদেবীর মৃত্যুর পরে প্রথম প্রথম অনেক বার বিবাহের চেষ্টা করেছিলেন—তাঁর বড় দ মৃণালিনী। বিবাহের কথা অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েও শেষ পর্য্যন্ত বিভূতিভূষণের অনিচ্ছা ও বিরক্তি প্রকাশের জন্যে সম্বন্ধ ভেঙে দিতে বাধ্য হোতেন মৃণালিনী।

(ক্রমশঃ)

ভ্রমণে উপেক্ষিত

হিরণকুমার সান্যাল

সাধনবাবু† পাহাড়ে পর্বতে পথে বিপথে ঘুরেছেন সাংরি-লা'র সন্ধানে। আমি কিন্তু সাংরি-লা'র সন্ধান পেয়েছি কোথাও না ঘুরেই একেবারে শৈশব থেকে : এটি হল একটি নীলকুঠি, এখনকার বাংলাদেশের একটি নদীর ধারে—একেবারে ঠিক ধারে নয়। এই পাঁচ মিনিটের পথ, নানা বড় বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা। আর এই গাছগুলির মধ্যে সব চাইতে লম্বা সাহেবদের আমলের বিরাট বিরাট ঝাউ। নদী পথে যখন যেতাম, বাড়ির ঘাটের দুচার বাঁক আগেই এই ঝাউর মাথা চোখে পড়ত আর চেঁচিয়ে উঠতাম। বড় ছোট সবাই। ঐ আমাদের বাড়ি। ভ্রমণের নেশার বশে নয়, একেবারে জন্মগত অধিকারে জায়গাটির সঙ্গে আমার পরিচয়, কেমনা এটি আমার মাতুলালয়। এই জায়গাটির কথা উল্লেখ করলাম এই জন্যে যে আমার মনে সাংরি-লা'র যে ছক আছে তা পেয়েছি এখান থেকেই। একটি পুরনো বাড়ি, খুব বড় না হলেও বেশ প্রশস্ত, বড় বড় গাছ, তার মধ্যে গুটি কয়েক ঝাউ থাকলে কথাই নাই; গাছের ফাঁকে অবারিত মাঠের দৃশ্য আর কাছাকাছি একটি নদী বা হ্রদ—এই হল মোটামুটি উপকরণ।

আমার অশেষ কপাল জোরে ঠিক ঐ রকম না হোক ওর সঙ্গে অনেকটা মেলে এই রকম একাধিক কুঠিবাড়িতে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, আর না থাকলেও দেখেছি এমন একটি নীলকুঠি যা দেখাটাও সৌভাগ্য। এটি হল ভাগলপুরের বিখ্যাত টিলাকুঠি, নামের কারণ এই কুঠিটি তৈরী হয়েছে বেশ একটু উচু জায়গায়। সামনেই গঙ্গার বাঁক আর কি চওড়া গঙ্গা!

কিন্তু এসব পুরনো বাড়ি হল হালের অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলের। এবার একটু পিছিয়ে যাওয়া যাক। একদা খাজুরাহো যাব ব'লে ঝাঁসি থেকে যাত্রা করেছিলাম ভাড়া করা মোটর গাড়িতে। পথে ওর্চার বিখ্যাত দুর্গ ও প্রাসাদ দেখবার লোভ সংবরণ করতে পারিনি।* একেবারে পথের উপর নয়, ২/৪ মাইল দূরে। দেখবার মতন জায়গা কিন্তু মন খুব নিশ্চিন্ত

† দ্রষ্টব্য শ্রীসাধন কুমার ঘোষের 'পথে-বিপথে' : আলেখ্য ৫ম, বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

* এইখানে একটু ঐতিহাসিক পাদটিকা দেওয়া যেতে পারে। রাজা

ছিল না কেন না রাত্রিবাস ছিল অনিশ্চিত। পথে বড়োয়া সাগর নামের এক অপরিচিত জায়গায় হয়তো ঠাঁই পাওয়া যেতে পারে এই রকম একটি অস্পষ্ট ধারণা ছিল। যখন বড়োয়া সাগর পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যে হয়েছে। একেবারে গ্রাম্য জায়গা। এর ওর কাছে খোঁজ নিয়ে প্রকাণ্ড এক তেঁতুল গাছ তলায় গাড়ি থেকে নামলাম। সামনে একটি ছোট খাটো পাহাড় পথ আগলে আছে। শুনেছিলাম ঐখানেই আশ্রয় পাওয়া যাবে তাই হাঁকডাক করতে মনে হল যেন একটি গুহার থেকে বেরিয়ে এল সাদা দাড়িওয়ালা একটি লোক। ঐ পাহাড়টি আসলে একটি ভগ্ন স্তূপ। ওখানে ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি দুর্গ, এর উপরতলার ঘরগুলির দুচারটি নিয়ে হয়েছে একটি ডাক বাংলো, বাকি ঘরগুলি সরকারি দপ্তর। ঘরগুলির সামনে প্রশস্ত চত্বর, আর একদিকে উঁচু দেওয়াল, তারই মাঝে মাঝে জানালার বদলে রয়েছে বড় বড় খিলান করা ফাঁক। জ্যোৎস্না রাত্রি। এই সব ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে প্রশস্ত এক হ্রদ— মানুষের তৈরি। মাটি কেটে নয়, নদীতে বাঁধ দিয়ে। মোগল আমলের, বড়োয়া সাগর নামের অর্থ এবার বুঝলাম। এই রকম জলের ব্যবস্থা থাকায় ঐ অঞ্চলটিতে গাছপালা রয়েছে প্রচুর যা আশেপাশে একেবারেই নেই। জায়গাটি মনোরম বটে কিন্তু ঐ রকম একটি নির্জন জায়গায় একটি স্তূপের মাথার উপর রাত্রিবাস করতে আমরা তিনজন হলেও গা ছম্ ছম্ যে করেনি তা বলতে পারি না। ঐ দাড়িওয়ালা লোকটি ঘরদোর খুলে দিয়ে যেভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল তাতে আমাদের ভরসা কিছু বাড়ে নি। তবে সকাল বেলায় যাবার সময়ে সে ঠিক সেলাম করে দাঁড়িয়ে বকসিসের জন্য হাত পেতেছিল আদবকায়দা মাফিক।

আমরা বেরিয়েছিলাম খজুরাহো দেখব বলে আর দেখেওছিলাম ভালোকরেই। বাড়োয়া সাগর হল ফাউ। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় এই

বীরসিংহদেব সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মাণ করেছিলেন ওর্চার বিখ্যাত প্রাসাদ ও দুর্গ। যুবরাজ সেলিমের প্ররোচনায় আবুল ফজলকে হত্যা করায় তিনি আকবরের বিরাগভাজন হন। পরে সেলিম যখন জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে মসনদে বসলেন, বীরসিংহদেবও ফিরে পেলেন তাঁর পূর্ব মর্যাদা। বীরসিংহ দেবের এক বংশধর অষ্টাদশ শতাব্দীতে বড়োয়া সাগর পত্তন করেন। রাজা বীরসিংহ দেবের আর একটি প্রাসাদ আছে ঝাঁসির অনতিদূরে দাতিয়াতে। এটিও একটি দেখবার মতন জায়গা, কিন্তু আশ্চর্য এই যে এই বিরাট প্রাসাদে কেউ কোনোদিন বাস করে নি।

কাউই বেশী মূল্যবান। সত্যিই আশ্চর্য জায়গা, কিন্তু কজন এর সন্ধান জানে। ঐ যাত্রায় আরো একটি ফাউ জুটেছিল—মহোবা। পৌরাণিক যুগে নাকি এখানে এক মহোৎসব হয়েছিল, তারিই স্মৃতি রয়েছে এই নামে।

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে সুপরিচিত মহোবা জায়গাটি সত্যি মনোরম। মদনসাগর হ্রদের ধারে ধারে আছে ছোট বড় মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। এখানে ওখানে নিচু নিচু পাহাড় আর মাঝে মাঝে উপত্যকা। আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা চব্বিশটি জৈন তীর্থংকরের বিরাট মূর্তি। মন্দির, মসজিদও আছে। মদন সাগর ছাড়া আরো একাধিক হ্রদ ছিল, তাদের মধ্যে এখনো রয়েছে কিরাত সাগর—যেমন গভীর তেমনি বড়। এই হ্রদগুলি একাদশ শতাব্দীর চাণ্ডেলা রাজাদের কীর্তি। বৌদ্ধদের কীর্তির চিহ্নও কিছু কিছু পাওয়া যায়। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, সকলেই কয়েক শতাব্দী ধরে স্বাক্ষর রেখে গেছে মহোবাতে। ওখানে গিয়েছিলাম বহুদিন আগে, আশ্রয় ও খাদ্য দুই পেয়েছিলাম ডাকবাংলোয়। এখন হয়তো আরো সব থাকার জায়গা হয়েছে। তবে মহোবাতে যে খুব বেশি লোকের যাতায়াত আছে তা মনে হয় না। ভ্রমণে উপেক্ষিত জায়গাগুলির মধ্যে তাই মহোবার উল্লেখ করলাম।

আমার এই তালিকায় আর একটি বিশিষ্ট নাম হল জৌনপুর। সুপরিচিত নাম, অন্তত জৌনপুরী টোড়ির জন্য। জৌনপুরী আতরেরও নাম কম নয়। ১৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে এই সহরটি প্রতিষ্ঠা করেন ফিরোজ সা তুগলক, জৌনপুর নাম তাঁরই দেওয়া। এক সময়ে এখানে গোমতী নদীর ধারে ছিল বড় বড় হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধমঠ। ঐ সব কীর্তি ঢাকা পড়েছে মুসলমান স্থপতিদের হস্তাবলেপে। কিন্তু এই হস্তাবলেপ মোটেই স্থূল নয়। প্রাক্-মোগলযুগের মুসলমান স্থাপত্যের যে সব নিদর্শন ছড়িয়ে আছে জৌনপুরে সারা ভারতবর্ষে তার তুলনা পাওয়া কঠিন।

এইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য অটলা ও জুম্মা মসজিদ আর দুর্গ। সম্রাট আকবর এই সহরটি জয় করে তাঁর কীর্তি রেখে গেছেন গোমতী নদীর ওপর এক পাথরের সেতুতে। দেখতে ছবির মতন। লক্ষ্ণৌ থেকে ফৈজাবাদ ও অযোধ্যা হয়ে যে রেলপথ গেছে বারাণসীতে, জৌনপুর পড়ে তারই উপর। অথচ জৌনপুরের তুলনায় নগণ্য লক্ষ্ণৌ দেখার জন্য যাঁরা উৎসুক তাঁদের কজন যান জৌনপুরে? আর কজনই বা যান সাসারামে, শেরসা'র সমাধি মন্দির দেখবার জন্যে? এই সমাধি মন্দিরটির বলিষ্ঠ গাম্ভীর্য দর্শককে স্তম্ভিত করে।

জৌনপুর থেকে মোটর বা বাসের রাস্তায় মাত্র ৪৬ মাইল দূরে মির্জাপুর। এখানকার কার্পেট ও পাঁপড় প্রসিদ্ধ। মির্জাপুরি গুণ্ডাদেরও একসময়ে এত পসার ছিল যে কলকাতায় দাঙ্গা বাধলে তাদের তলব করা হত। এখন এ বিষয়ে আমরা স্বাবলম্বী হয়েছি। মির্জাপুরের পাশেই বিখ্যাত হিন্দু তীর্থ বিন্ধ্যাচল। এখানে গেলে নিশ্চিত পুণ্য অর্জন হবে, যদিও এখানকার কালী-মন্দির এক সময়ে ছিল ঠগীদের এক প্রধান আড্ডা। কিন্তু মির্জাপুরও নিতান্ত ফ্যালনা জায়গা নয়। চাঁদের আলোয় এখানকার সব গঙ্গার ঘাট ও মন্দির দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আর দিনের আলোয় দেখেছিলাম ক'মাইল দূরে বিন্ধ্য পাহাড়ের গায়ে টাঙা জলপ্রপাত—প্রায় ষাট ফিট উঁচু। এ সব জানা জায়গা অনেকেই দেখতে যায়। কিন্তু ঐ বিন্ধ্য পাহাড়েরই ওপর কিছুদূরে আছে উইন্‌ড্‌হাম মেমোরিয়্যাল নামে একটি ডাক বাংলো (এখন হয়তো নাম বদলেছে) পাহাড়ের একেবারে কিনারায়। এখানকার বারান্দায় বসে তাকালেই দেখা যায় যোজনের পর যোজনব্যাপী অপূর্ব দৃশ্য। কিন্তু এখানকার প্রধান আকর্ষণ হল একটি জলপ্রপাত—টাঙার মতন উঁচু নয়। থাকে থাকে নেমে এসেছে একটির পর একটি কুণ্ডের মধ্য দিয়ে। কী আরাম পেয়েছিলাম এর একটি কুণ্ডে চান করে' কী বলব! চারিদিতে গাছপালা। একেবারে কাছে না এলে চোখেই পড়ে না এই নিরালা জায়গাটি।

এত তো ঘুরলাম কিন্তু ঝাউগাছ পেলাম কই? অতএব ফেরা যাক বাংলাদেশে যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম। কিন্তু যেতে হবে বাংলাদেশের আর এক প্রান্তে। চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম। মাঝখানে চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শন করতে হবে বৈ কি। আর দর্শনীয় জায়গাও বটে, কেননা কষ্ট করে পাহাড়ের উপর মন্দির পর্যন্ত পৌছান, চোখের দৃষ্টি পৌছবে একেবারে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত। চট্টগ্রাম শহরটিও দেখবার। বাংলার সমতল ভূমিতে এত সুন্দর সহর আর আছে কিনা জানি না সহরটি কিন্তু পুরো সমতল নয়। এর বৈশিষ্ট্য হল এখানে ওখানে সবুজ ঘাসে ঢাকা মাটির টিলা। গ্রীষ্মের প্রথমে যখন কৃষ্ণচূড়া গাছগুলিতে ফুল ফোটে তখন এই সবুজের গায়ে গায়ে লাল ফুলগুলি সহরটিকে দেয় এক বিচিত্র রূপ।

চট্টগ্রাম থেকে ছোট একটি ষ্টীমার ছাড়ে খুব সকালে। ক'মাইল পথ কর্ণফুলী দিয়ে যাবার পর এই খুদে জাহাজটি পড়ে বঙ্গোপসাগরের মোহনায়। আমার কপাল জোরে চাঁদা মাছ ভাজা জুটেছিল ঐ জাহাজেই। জাহাজটি যাবে এবার ডানদিকে মহেশখালি ও কুতুবদিয়া ও বাঁ পাশে এই উপমহাদেশের

মাঝের ফাঁড়ি দিয়ে সোজা ককস্ বাজার। তার ঠিক উলটো দিকেই ছোট পাহাড়ের গায়ে আদিনাথ তীর্থ। সবুজ আর সবুজ আর সবুজ। মাঝে মাঝে মগেদের গ্রাম আর কেয়াং অর্থাৎ বৌদ্ধ মন্দির। ককস্ বাজারের সামনে সমুদ্র। পিছনে জঙ্গল আর খেত আর গ্রাম। আর পাহাড়, কিন্তু পাথরের নয়, মাটির। ঝোপে ঝাড়ে ছাওয়া। প্রখর গ্রীষ্মের সময়ে এগুলি প্রায় রোদে রাঙা ইটের পাঁজার মতন দেখায়। সমুদ্রের ধারে লোহার ফ্রেমের ওপর এক কাঠের বাংলোয় কদিন থাকবার সুযোগ হয়েছিল। কাছেই ছিল এক সার ঝাউগাছ বেশ প্রমাণ আকারের যদিও আমার সেই নীলকুঠির ঝাউয়ের মতন অত বিরাট নয়! পুরনো বাংলো, দরজা জানালাগুলি ঢিলে ঢালা, সমুদ্রের হাওয়ার মাতামাতিতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে এরা করত বিচিত্র কাতর আওয়াজ। আর ছিল সমুদ্রের নিরন্তর জলোচ্ছ্বাস আর ঝাউগাছের সোঁ সোঁ শব্দ। কাছে কিনারে আর কেউ ছিল না, শুধু ঐ ভুতুড়ে বাড়িতে আমরা গুটি চার পাঁচ প্রাণী। আমার ঐ নীলকুঠীর বাইরে যদি কোথাও পেয়ে থাকি সাংরি-লা'র স্বাদ তা ঐখানে। -

---

সমাজ চিন্তা

ইমারজেন্সির প্রলম্বন

২৬শে জুন যে ইমারজেন্সির ঘোষণা করা হয় তা গত জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে পার্লিয়ামেণ্টে অনুমোদিত হয়েছে। ফলে এই নতুন ইমারজেন্সিরও দীর্ঘ প্রলম্বিতির আইনগত বাধা দূর হলো। পূর্ব্বতন—বৈদেশিক বিপদের আশঙ্কায় ১৯৭১ সালে ঘোষিত—ইমারজেন্সি এখনও বলবৎ রয়েছে। নতুন ইমারজেন্সিও ঐরূপ দীর্ঘজীবী হতে পারে। চীন ও পাকিস্তানের সুদৃঢ় ভারত-বিদ্বেষের কারণে আমাদের বৈদেশিক বিপদের আশঙ্কা উপেক্ষণীয় নয়, কাজেই প্রথম ইমারজেন্সি এখনো জারী থাকার যৌক্তিকতা আমরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করি না। কিন্তু নূতন ইমারজেন্সির দীর্ঘজীবিতার স্বপক্ষে সেরূপ কোনো স্বতঃগ্রাহ্য যুক্তি উপস্থাপিত নয়। সরকার (যেমন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি) বলেছেন ঠিক যতোদিন দরকার ততদিনই ইমারজেন্সি থাকবে তার বেশীও নয় কমও নয়। কিন্তু সেই দরকারটার স্বরূপটা কী? যদি আভ্যন্তরীন আইন শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা সে-দরকার হয়,—দ্বিতীয় ইমারজেন্সি ঘোষণার কালে এই কারণই উল্লেখিত হয়েছিল—আমরা দেশবাসীরা এখন সেরূপ আশঙ্কার কোনো

CENTRAL LIBRARY

কারণই আর দেখছি না। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করছে—কোথাও কোনো সংঘাত নেই, সংঘর্ষ নেই। কাজেই বিপদ থাকলেও তা প্রত্যক্ষগোচর নয়। যদি সে-বিপদ অপ্রত্যক্ষ হলেও সম্পূর্ণ বাস্তব ও মারাত্মক প্রকৃতির হয়, সে বিষয়ে সরকার আমাদের তথ্য জ্ঞাপন করে' আমাদের প্রত্যয় উৎপাদন করবেন, এই আমাদের অনুরোধ ও প্রত্যাশা। কারণ সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলি আমাদের অমূল্য সম্পদ। ঐ মৌলিক মানবিক অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত যে-জীবন তা খুব শ্লাঘনীয় নয়, বরং অপমানকর। অল্প কিছুদিনের জন্য—এবং তা-ও অতি প্রত্যক্ষ জাতীয় বিপদের মুখে—তার অপহার, অপহ্নব বা অবলোপ স্বীকার্য্য হলেও সুদীর্ঘ দিন তা থেকে বঞ্চিত থাকা কোনো মানুষের পক্ষে গৌরবের নয়,—তার আত্মসম্মান নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে।

এখন আবার সরকারের তরফে মাঝে মাঝে বলা হচ্ছে যে, এই ইমারজেন্সির ফলে সারা দেশে সরকারী ও বেসরকারী স্তরে সর্ব্বক্ষেত্রে নিয়ম শৃঙ্খলার যেরূপ উন্নতি হয়েছে এবং কলে-কারখানায়-অফিসে-বন্দরে সর্ব্বত্র যেরূপ উৎপাদনের অভিবৃদ্ধি লক্ষিত হচ্ছে তাতে ইমারজেন্সির আশু প্রত্যাহার খুব সুবিবেচনার কাজ হবে না—জাতীয় জীবনে এই শৃঙ্খলাবোধ ও দায়িত্বশীলতা যাতে সুদৃঢ়মূল হয় তদুদ্দেশ্যে ইমারজেন্সির স্থায়িত্ব নিরূপণ সঙ্গত হবে। অর্থাৎ ইমারজেন্সি বা জরুরী অবস্থা ঘোষণার প্রাক্কালে যে সকল কারণ উল্লেখিত হয়েছিল এখন সে সব যেন গৌণ হয়ে গেছে, এবং তার স্থলে মুখ্য হয়ে উঠেছে নতুন প্রয়োজন, এবং এই নতুন প্রয়োজন সাধনের জন্য ইমারজেন্সির আবশ্যিকতার উপরে এখন জোর দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু প্রশ্ন এই, যদি ইমারজেন্সি-প্রদত্ত সরকারের অপ্রতিহত ক্ষমতার ভয়েই সর্ব্বত্র নতুন করে শৃঙ্খলাবোধ ও দায়িত্ববোধ জেগে থাকে তা হলে' সেই ভয়ের অপসারণের সঙ্গেই যে এই ভয়তাড়িত শুভবুদ্ধিরও প্রস্থান ঘটবে সে-আশঙ্কাও তো অসঙ্গত নয়? কিন্তু তাই বলে কি চিরকালই সেই ভয়ের রাজত্ব কায়েম রাখতে হবে? নিশ্চয়ই না। তা হলে অন্য এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন যাতে সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য কাজে নিষ্ঠা ও দায়িত্বের পরিচয় দেয়। সমস্ত উন্নত (এবং গণতান্ত্রিক) দেশেই জাতীয় জীবনে এই গুণ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সেজন্য ইমারজেন্সির আবশ্যকতা হয় না। প্রাক্-জরুরী অবস্থায় লোকে যে এত ফাঁকি দিত তার কারণ ফাঁকি দিলে শাস্তি হতো না। কিন্তু ফাঁকির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান তো স্বাভাবিক আইনেই ছিল।

তার প্রয়োগ হতো না, কিম্বা হলেও যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে হতো না। অক্ষমতা ও অপদার্থতার জন্য শাস্তি দেওয়া হতো না। সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্নস্তরে এটা বিস্তৃত ছিল। জনসাধারণ অবাক হয়ে অপদার্থতার এই চমৎকার রাজত্ব দেখতো এবং মনে মনে ধিক্কার দিত। কিন্তু ফাঁকি, অপদার্থতা এবং দুর্নীতি যদি তখন শাসিত না হয়ে থাকে তা আইনকানুনের স্বল্পতার বা অসামর্থ্যের জন্য নয়। যে-আইনকানুন ছিল তার ব্যবহার হতো না। যথোচিত প্রয়োগ হলে সর্ব্বক্ষেত্রেই কাজকর্ম্ম ঠিক ভাবে চলতো।

সময় মতো ট্রেন চলবে, সময় মতো অফিসার ও করণিকবাবুরা দপ্তরে আসবেন, স্কুল কলেজে শিক্ষক মশাইরা পড়াবেন, ছাত্রেরা শুনবে— যার যা নির্দিষ্ট কাজ, যে জন্য তিনি নিয়মিত বেতন গ্রহণ করছেন, তা তিনি যথাসাধ্য ফাঁকি না দিয়ে করবার চেষ্টা করবেন, এটাতো স্বতঃসিদ্ধের মতোই হওয়া উচিত। কিন্তু তা যদি সুদীর্ঘকাল ধরে এদেশে নিরঙ্কুশভাবে লঙ্ঘিত হয়ে থাকে তবে তার জন্য দায়ী সর্বক্ষেত্রে উপরতলার শৈথিল্য। আমরা দেখেছি শীর্ষদেশে শৈথিল্য না থাকলে এই দেশেও সব কিছু যথাসঙ্গত ভাবেই চলে। এই পঃ বঙ্গেই প্রথম মুখ্য মন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের আমলে, তাঁর অনমনীয় দৃঢ়তা ও নীতিনিষ্ঠার জন্য সর্ব্বক্ষেত্রে ফাঁকি ও দুর্নীতি অনেকাংশে নিবারিত হয়েছিল, কর্তৃপক্ষের প্রতি বেশ একটা স্বাস্থ্যকর ভয়ের ও সম্ভ্রমের ভাব সকলের মনে সঞ্চারিত হয়েছিল। দুঃখের বিষয় তিনি বেশীদিন মুখ্যমন্ত্রী থাকতে পারেন নি। কী কারণে তাঁকে চলে যেতে হলো সে রহস্যে এখানে প্রবেশ করতে চাই না। কিন্তু বেশ বোঝা গিয়েছিল যে উপরের তলার সততা, নীতিনিষ্ঠা ও আপোষ-বিহীন মনোভাবের তাৎক্ষণিক সুফল সমাজদেহের সর্বত্র সঞ্চারিত ও প্রতি-ফলিত হয়। এজন্য ইমারজেন্সির ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগের প্রয়োজন নেই।

ইমারজেন্সিতে সুফল পাওয়া যায়, যাবেই। কিন্তু সেজন্য বিরাট মূল্যও দিতে হয়। এবং সে মূল্য দিতে হয়—সর্বসাধারণকে। তাদের সব মৌলিক অধিকারগুলি, সাময়িকভাবে হলেও, বিসর্জন দিতে হয়। আধুনিক শাসন-ব্যবস্থায় ব্যুরোক্রাটদের বা আমলাতন্ত্রের অপরিমেয় ক্ষমতা। ইমারজেন্সিতে সেই সর্বব্যাপী হৃদয়বর্জিত আমলাতন্ত্রের দায়িত্বহীন কাজকর্মের বিরুদ্ধে প্রতি-বাদের, ও আদালতের সাহায্যে প্রতিবিধানের, অধিকার থেকে জনগণ বঞ্চিত হয়। তাদের সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়, তাঁরা যাতে অপরাধ না নেন। অপরাধ নিলেই বিপদ এবং সে-বিপদের কাটান নেই।

ইমারজেন্সি দীর্ঘস্থায়ী হলে' সরকারী যন্ত্র দায়িত্বহীন হয়ে পড়ে। অপ্রতিহত

CENTRAL LIBRARY

ক্ষমতা প্রয়োগের একটা সুখ আছে—ইচ্ছামাত্র কাজ হয়ে যায়, আলাদীনের দৈত্য তো হাতের মুঠোয়। কাগজে পত্রে কোনও সমালোচনা নেই, সভা সমিতিতে আন্দোলন নেই, কাজেই নিজেদের গুণগান নিজেরাই অহোরাত্র করে' ও শুনে, যাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাঁদের একটা নেশার ঘোর আসে। আমার দেখাই সত্য দেখা, আমার বোঝাই সত্য বোঝা, এবং আমি যা করি তাই করার চরমোৎকর্ষ—এই রকম একটা মনোভাব। ফলে বিচার বিবেচনা শিথিল হয়ে পড়ে, খামখেয়ালিপনা বাড়ে। কাজেই ইমারজেন্সি কখনো দীর্ঘস্থায়ী করা সঙ্গত নয়। তাতে শাসিত ও শাসক কারও মঙ্গল হয়না।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে গঠনমূলক সমালোচনা তিনি চান, সেই ভরসায় এত কথা লিখলাম। আশা করি এটা গঠনমূলক বলেই বিবেচিত হবে।

আমরা কোনো রাজনৈতিক দলভুক্ত নই এবং আমরা দেশকে ভালবাসি। এবং আমরা বিশ্বাস করি, এই রাজনীতি শাসিত যুগে dissent বা বৈমত্যের মূল্য খুব বেশী। কারণ রাজনৈতিক দলের স্বার্থের রঙ্গীন চশমা পরে'—তা যে-রঙেরই হোক—সত্যকে, দেশের সত্য মঙ্গলকে, সব সময় স্পষ্ট দেখা যায় না। যে স্বার্থবিমুক্ত দৃষ্টির অধিকারী—তারই কাছে সত্য অধিকতর স্বচ্ছ প্রতিভাত হওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই যে-দলই ক্ষমতায় থাকুন, দল-নিরপেক্ষ দেশ-প্রীতি-সম্পন্ন সমালোচকের কণ্ঠে বিবাদী সুরটির মূল্য অবশ্যই গ্রাহ্য হওয়া উচিত। আধুনিক গণতন্ত্রে মন্ত্রীরাই রাজক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু রাজাদেরও সুমন্ত্রণার প্রয়োজন। এবং তা-ই সুমন্ত্রণা, যা হয়তো রোচক নয় তবু কল্যাণসন্ধী। "বৌঠাকুরাণীর হাটে" যশোররাজ প্রতাপাদিত্য তাঁর মন্ত্রীকে, তুমি কেবলই বিপরীত কথা বলো, বলে' তিরস্কার করায় মন্ত্রী বলেছিলেন, মহারাজ আমাকে সত্য পরামর্শ দেওয়ার জন্যই নিযুক্ত করেছেন, আপনাকে রোচনীয় চাটুবাক্য শোনানোর জন্য নয়।—বিমত বা বিপরীত মত বা dissent-এর মূল্য তাই খুব বেশী। দলনিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধী dissent এর মধ্যেই খুঁজলে প্রায়শঃ সুমন্ত্রণা পাওয়া যাবে।—আমরা তাই আশা করি আমাদের এই সমালোচনা গঠনমূলক বলেই গৃহীত হবে।

২০. ৯. ৭৫

প্রি-সেন্সরশিপ বনাম সেল্ফ্-সেন্সরশিপ

সম্প্রতি সরকারের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে, সংবাদপত্রের উপরে যে "প্রি-সেন্সরশিপ" আরোপ করা হয়েছিল তা ক্রমেই শিথিল করা হচ্ছে, তবে সংবাদপত্রগুলি তৎপরিবর্তে "সেল্ফ্ সেন্সরশিপ" যেন মেনে চলেন। অর্থাৎ

সংবাদপত্রে কী বেরুবে ও বেরুবে না তার উপর সরকারের বর্ত্তমান কড়া খবরদারি তুলে নেওয়া হবে এবং পরিবর্ত্তে সংবাদপত্রগুলি নিজেরাই নিজেদের সুবিবেচনা অনুসারে, যথোচিত দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে, প্রকাশিতব্য খবর ও মতামতগুলি ঝাড়াই-বাছাই করে,' যা দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে দেওয়া সঙ্গত সেরূপ জিনিষই প্রকাশ করবেন। অর্থাৎ তাঁরা আত্মনিয়ন্ত্রিত হয়ে চলবেন এইটেই সরকার প্রত্যাশা করেন, বাইরের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হচ্ছে।

ভালো কথা। কিন্তু তবু কথা আছে। ইমারজেন্সীর পূর্ব্বে আমাদের সংবাদপত্রগুলি নাকি খুবই দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছিল, অন্যায়কে তিরস্কার তো করেইনি বরং উসকানিই দিয়েছে এবং নানা মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত খবর প্রচার করে' জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেছে, এবং দেশের ললাটে কলঙ্ক লেপন করেছে—এই রকম অভিযোগ আমরা শুনেছিলাম। সেন্সরশিপের প্রবর্ত্তন এই দায়িত্বহীন অপসাংবাদিকতার বল্গাহীন স্বেচ্ছাচারিতাকে দেশ ও দশের স্বার্থে সংযত করতে। কিন্তু ইমারজেন্সির কালে, সেন্সরশিপের কড়া নিয়ন্ত্রণের ফলে আমরা দেখলাম খবরের কাগজগুলো সরকারের কাজকর্ম্মের বিবরণ ও কর্ত্তৃস্থানীয়দের মতামতের বাহনে পর্য্যবসিত হয়েছে। অর্থাৎ আকাশবাণী-প্রচারিত সংবাদ শুনলে ও মনে রাখলে, সংবাদপত্র না পড়লেও চলে। সম্পাদকীয় মন্তব্য সম্পূর্ণ ছাঁটাই হলো না, তবে তা' আকাশবাণীর 'সমীক্ষা' কিম্বা 'সংবাদ পরিক্রমা'-জাতীয় সুমিষ্ট মোদকে রূপান্তরিত হলো। কিন্তু মধুর রস তো সবাই ভালবাসে না, অম্লও চায়—কিন্তু অম্ল কষায় তিক্ত প্রভৃতি নানা রসের আয়োজন বন্ধ।

'প্রি-সেন্সরশিপ' তুলে নিয়ে 'সেল্ফ্ সেন্সরশিপ'-এর অধ্যায়ে পদক্ষেপের অর্থ কি, আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে খবরের কাগজগুলো যেমন জোলো ও বিস্বাদ হয়ে উঠেছে তেমনি চলতে থাকবে—শুধু আমলাতন্ত্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ থাকবে না? আমাদের সে আশঙ্কাই হচ্ছে। সরকার সংবাদপত্রের যে-আদর্শটি স্থাপন করলেন সম্ভবতঃ তাই অনুসৃত হয়ে চলবে। এবং আমরা পাঠক সাধারণ তিন মিনিটে কাগজ পড়া শেষ করে বলবো, নাঃ, কাগজগুলোতে পড়ার মতো কিচ্ছু থাকে না।

এটা ভুললে চলবে না যে, বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসকদলের অপরিমেয় ক্ষমতার উপরে যে কয়টি check বা প্রতিবন্ধ আছে—যেমন পার্লামেন্টে বিরোধী পক্ষের সমালোচনা, আদালত প্রভৃতি—তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হলো সংবাদপত্র। সংবাদপত্রে অনেক কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়

এবং জনসাধারণের মনে তার বিরূপ প্রভাবের আশঙ্কা, সরকারকে দায়িত্বশীল রাখে। খবরের কাগজে প্রতিফলিত জনমতও—পাঠকদের চিঠিপত্রের মাধ্যমে এবং সম্পাদকীয়তে—সরকারকে সজাগ, সংযত ও কর্তব্যপরায়ণ করে। সংবাদপত্রগুলিকে দায়িত্বহীন আখ্যা দিয়ে তাদের এই অত্যন্ত মূল্যবান গণ-তান্ত্রিক ভূমিকা থেকে বিচ্যুত করে' সরকার নিজেদের আপাততঃ নিরুদ্বিগ্ন করেছেন বটে, কিন্তু গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যতম 'সেফ্‌টি-ভাল্‌ভ' অকেজো করা হচ্ছে না কি? আমরা যে ভারতবর্ষে সুস্থ, সবল, সতেজ গণতন্ত্র গড়ে তুলতে চাই, একথা কখনো যেন না ভুলি।

খুব দুঃখের সঙ্গে বলবো, সব সেন্সরশিপের যে-প্রবণতা, অপ্রিয় সত্যকে গোপন করার প্রবণতা, আমরা এই সেন্সরশিপের মধ্যেও তা লক্ষ্য করেছি। ফলে বিবিধ গুজবে লোকের কান ও মন কেবলি ভারাক্রান্ত হচ্ছে। বি.বি.সি. ও 'ভয়েস্ অফ আমেরিকা'র সংবাদবিশেষ ক্রমপল্লবিত হয়ে লোকের মনে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পায় শুধু এই কারণেই। সত্যকে মানুষ জানতে চাইবেই, না জেনে তার তৃপ্তি নেই। সত্য সংবাদ, সরকারের অপ্রীতিকর হলে, প্রকাশিত হতে দেওয়া হয় না, এরূপ ধারণা কোনো সরকারের পক্ষেই গৌরবের নয়। লোকের মনে সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যায়। তাতে সরকারেরও ক্ষতি, দেশেরও ক্ষতি।

গত (জুলাই-আগষ্টের; পার্লামেন্টের অধিবেশনে বিরোধী দলের সদস্যদের সব উক্তি কেন সেন্সর করা হলো, কোনো সংবাদপত্রে ও বেতার সম্প্রচারে তা প্রকাশিত হতে দেওয়া হলো না, সে-জিজ্ঞাসা সকলের মনেই আছে। পার্লিয়া-মেন্টের কার্যকলাপও (সদস্যদের দ্বারা সরকারের কোনো কাজের সমালোচনাও তার মধ্যে পড়ে) যদি জনসাধারণকে জানতে না দেওয়া হয়, লোকে নানা রকম অনুমান করে' শুধু বিদেশী বেতারেই সত্য সংবাদ পাওয়া যাবে বলে' বিশ্বাস করতে প্রণোদিত হয়। এবং বিদেশী বেতারে যা-তা মিথ্যাও যদি প্রচারিত হয় তাও বিশ্বাস করে' বসে। এরূপ অবস্থা মোটেই স্পৃহনীয় নয়।

আমরা তাই আশা করবো, সরকার গভীরভাবে বিবেচনা করে সেন্সরশিপ সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করবেন। ২৩. ৯. ৭৫.

'বাংলাদেশ'-এ সামরিক অভ্যুত্থান

গত ১৫ই আগষ্ট প্রত্যূষে ঢাকায় বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট 'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবর রহমান এক সামরিক অভ্যুত্থানে সপরিবারে নিহত হয়েছেন।

প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেছেন তাঁরই জনৈক মন্ত্রী খোন্দকার মোস্তাক আহমেদ। একটি অসামরিক সরকারও গঠিত হয়েছে। বিদ্রোহী সেনানীদের সঙ্গে বর্তমান সরকারের সম্বন্ধটা ঠিক কী-যে তা এখনো স্পষ্ট নয়। সংবাদের উপরে ভয়ানক কড়াকড়ি। কিছুই পরিস্কার করে জানতে দেওয়া হচ্ছে না। নতুন সরকার কোনো বিদেশী সাংবাদিককেও সেখানে যাবার অনুমতি দিচ্ছেন না এখনো।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবার রহমান কয়েক মাস পূর্ব্বে দেশের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করেছিলেন। নিজের দল ছাড়া সব রাজনৈতিক দলই ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এবং সরকারী পত্রিকা ছাড়া প্রায় সব পত্রিকাই বন্ধ করে' দিয়েছিলেন। নানাবিধ প্রশাসনিক নূতন বিন্যাসের পরীক্ষা নিরীক্ষাও সুরু করেছিলেন। একশো টাকার নোট বাতেল্লাপ্ত করে'ও কালোবাজারী ও দুর্নীতিগ্রস্ত বড়-মানুষদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু এতগুলো বৈপ্লবিক নতুনত্ব একসঙ্গে প্রবর্ত্তন করে' তিনি জনমানসের আগ্রহণের সীমিত ক্ষমতার কথা চিন্তা করেননি। ফলে সবাই মনে করছিল তিনি সব ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করছেন। এবং তিনি তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিলেনও।

খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিসন সব নিজের হাতে, তাই তাদের মিলিত ঐক্যতানের মুখে তাঁর ও তাঁর নতুন কর্মধারার বিরোধী মনোভাব যে গড়ে উঠতে পারে তা তিনি বুঝতে পারেননি। ভাবতে পারেননি, তাঁর বিরোধীরা গোপনে এত সংহত হতে পারে। এবং কল্পনাও করেননি যে, যাদের সঙ্গে একত্রে ওঠা বসা শলা পরামর্শ খানাপিনা করছেন সেই অতি-মোলায়েম বিনীত বিগলিত হাস্যমণ্ডিত মুখগুলি কী ভয়ঙ্কর ঘৃণার মুখোস হয়ে উঠেছে, এবং তাঁকে হত্যার যারা ষড়যন্ত্রী তাদেরই তিনি তাঁর পার্শ্বচর করছেন।

অফুরন্ত আত্মবিশ্বাসে ভরপুর শেখ সাহেব খোঁজ নেওয়াও প্রয়োজন মনে করেননি, তাঁর জনপ্রিয়তার ব্যারোমিটার কতো দ্রুত নীচে নেমে যাচ্ছে। সকলের আশীর্ব্বাদের পাত্র, তিনি সকলের অভিশাপের বস্তু হয়ে উঠছেন কি না। তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা তাঁকে শ্রুতিসুখকর মিথ্যা দিয়ে কেবলই ভুলিয়েছে, আত্ম-স্তুতিগানে মুখর এক মোহনীয় মিথ্যা জগতে তিনি সুখে বাস করছিলেন। হঠাৎ মিথ্যার পর্দা ছিঁড়ে গেল, প্রলয়ের এক ঝাপটে তিনি মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। এত বড় একটা মহাপ্রাণ দেশসেবকের এই ভাবে ঘটলো শোচনীয় জীবনাবসান।

সারা পৃথিবীর সব ক্ষমতাসীন নেতৃবর্গের এ থেকে অনেক কিছু শেখা ও

চিন্তা করবার আছে। প্রথমত, কোটি কোটি দেশের মানুষের সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে নিজের হাতে পুঞ্জীভূত করা খুব বেশী দায়িত্বের কাজ; দোষারোপ করবার জন্যে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি রইলো না; কোনো কিছু মনের মতো না হলে কোথাও অসফলতা ঘটলে, জনজীবনে কোথাও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কিছু অনটন দেখা দিলে, সকলেই সেই ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ও একমাত্র শক্তিধরের দিকেই তর্জ্জনি নির্দ্দেশ করবে। মুখে না সাহসে কুলোলেও মনে মনে বলবে—উচ্চভাষে না বলতে পারলেও নীচু গলায় জনান্তিকে বলবে। অমাত্যবর্গ ও পদস্থ অ-পদস্থ কর্মচারী সকলেই, নিজেদের অক্ষমতা অকর্মণ্যতা বা দুর্নীতির সাফাই গাইবে —ইঙ্গিতে, কথায় নয়—যে, তাদের দোষ নেই, দোষ খোদ কর্ত্তার। যিনি সকলের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সকলকে ঠুঁটো বানিয়েছেন তাঁর। ফলে সকলের সর্ব স্তরের অন্যায় ও অপদার্থতার জন্য দায়িক হবেন তিনি। কাজেই সব ক্ষমতা নিজের হাতে নিলে কেবলই সাফল্যের পর সাফল্য অর্জন করে চলতে হয়। কারণ সেখানে অসফলতার সাফাইও নেই ক্ষমাও নেই। কিন্তু কেবলি টেক্কা মারবো, অতো টেক্কা কিম্বা তুরুপের তাস কোথায় পাওয়া যাবে?

দ্বিতীয়ত, নিজের দলের ছাড়া অন্য সব রকমের রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ নিষিদ্ধ করারও বিপদ আছে। বহু অবাঞ্ছিত, অসাধু ও দুষ্ট লোক ঐ এক দলে ভিড় করবে ও দলের নৈতিক চরিত্র নষ্ট করে দেবে। আর সৎ ভিন্নমতাবলম্বী রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন লোকেরা রাজনীতির পথ রুদ্ধ হওয়ায় গভীর অসন্তোষে ধূমায়িত হতে থাকবে। তাদের সেই রুদ্ধ রোষ জনজীবনকে কিছুটা দূষিত করবেই।

তৃতীয়ত, সংবাদপত্রের উপর ষোলআনা সেন্সরশিপ এবং সরকারী ছাড়া অন্য সব কাগজকে নিষিদ্ধ করে' দেওয়াও সদ্বিবেচনার কাজ নয়। সংবাদ পত্রগুলি গণতন্ত্রের সেফ্‌টি ভাল্‌ভ। লোকে খবরের কাগজে দুকথা বলতে পারলে ও কিছুটা গায়ের ঝাল মেটাতে পারলে, ঠাণ্ডা থাকে,—মনের পুঞ্জিত উত্তাপ বেড়িয়ে যাবার রাস্তার পায় বলে' বিস্ফোরণের আশঙ্কা কমে যায়। তা ছাড়া কেবল নিজের প্রশংসা শোনাও ভালো নয়। ওতে একটা বিপজ্জনক আত্মতৃপ্তি আসে। অপ্রীতিকর কিছুই কর্ণগোচর না হওয়ায় বিপদের পদধ্বনি শোনাও আর সম্ভব হয় না। ফলে বিপদ যখন আসে একেবারে হুড়মুড় করে' ঘাড়ের উপরে এসে পড়ে। বাঁচার আর উপায় থাকে না।

বেশী ক্ষমতা হাতে নেওয়ার লোভ সব রাজনীতিক নেতারই থাকে। কিন্তু তার বিপদ সম্বন্ধেও অবহিত থাকা ভালো।

বাংলা সাময়িকপত্রের সঙ্কটাবস্থা

আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে সাময়িকপত্রের স্থান খুবই গুরুত্বের। আজ নয়, আমাদের আধুনিক চেতনা উন্মেষের সূচনা থেকে। রামমোহন এবিষয়ে খুবই অবহিত ছিলেন এবং তিনি ফার্শী, বাংলা ও ইংরাজী এই তিন ভাষাতেই পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিতান্ত সময়াভাব সত্ত্বেও, উপন্যাস রচনার মহামূল্য সময় খরচ করে', 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা করে' গেছেন। রবীন্দ্রনাথও 'বালক' 'সপ্তাহ' 'ভারতী' 'সাধনা' প্রভৃতি নানা পত্রপত্রিকা সম্পাদনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন প্রথম জীবনে, এবং মধ্যজীবনে দ্বিতীয়-পর্য্যায় 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনার ভার নিয়ে সাময়িকপত্রের জগতে এক মহোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেন। পরবর্ত্তীকালে বাংলা দেশে একই সঙ্গে বহু প্রথম শ্রেণীর মাসিক-পত্র প্রকাশিত হয়েছে—প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, বসুমতী প্রভৃতি। এই সব সাময়িক পত্রিকায় আমাদের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক চেতনা যেমন প্রতিফলিত হতো, তেমনি দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির মানও উন্নমিত হতো তাদের সদাজাগ্রত বৈদগ্ধ্যের প্রেরণায়। তা ছাড়া প্রথমাবধি এই সাময়িকপত্রের মাধ্যমেই বাঙালীর সমাজজিজ্ঞাসা উচ্চারিত হয়েছে বারংবার; কী বাঞ্ছনীয় কী অবাঞ্ছনীয়, কী কার্য্য কী অকার্য্য, কী শ্লাঘনীয় কী নিন্দনীয়, কী গ্রাহ্য কী ত্যাজ্য, সব প্রশ্নের ধীর গম্ভীর বিচার সর্ব্বদা আবর্ত্তিত হয়েছে এরই প্রাঙ্গনে। বিদেশী শাসনের সমালোচনাও যথেষ্ট নির্ভীকতার সঙ্গে করা হতো। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পত্রিকা সম্পাদনার কালে এঁরা কেউই তাঁদের এই সামাজিক দায়িত্ব বিস্মৃত হননি, পালনেও পরাঙ্মুখ হননি কখনো। প্রবাসী ও 'মডার্ণরিভিয়ু' তো এক অতিগৌরবময় ভূমিকা পালন করে গেছে এদিক দিয়ে। বাঙালীর জাতীয় জীবনের মহত্তম অধ্যায়ের সঙ্গে এইসব পত্রপত্রিকার সম্পর্ক অতি নিবিড়। এবং এটাও লক্ষ্যণীয় যে, বাঙালীর পত্রপত্রিকা যখন থেকে তাদের এই, শুধু সাংস্কৃতিক নয়, সামাজিক দায়িত্ব বিস্মৃত হলো এবং পালনে পরাঙ্মুখ হলো তখন থেকেই শুধু-যে সাময়িক পত্রেরই মানের অবনতি হয়ে চললো তা-ই নয়, তার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবক্ষয় ও মানাপকর্ষও সুরু হলো।

এখন তো এদেশে অগুন্তি পত্রপত্রিকা বেরুচ্ছে, কিন্তু সেই সব মহারথী পত্রিকাগুলির ঐতিহ্য বহন করতে পারে এমন একটিও নেই। নেই, কারণ

প্রথমত, বহুল প্রচলিত পত্রিকাগুলি বিবেকহীন ব্যবসাদারদের কবলিত, এবং তাদের কুপ্রভাবে অমেরুদণ্ডী ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি আজ প্রায় সব পত্র-পত্রিকাকেই কলুষিত করেছে। দ্বিতীয়ত, দু-একটি আদর্শনিষ্ঠ দায়িত্ববান পত্রপত্রিকা যা আছে তা প্রায় একক প্রচেষ্টায় বহু কৃচ্ছ্রসাধনায় কোনোমতে চলছে ; তাদের সহায় সম্পদ সম্বল বলতে কিছুই নেই, আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়েই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে, একা, নিতান্ত একলা, চলতে হচ্ছে তাদের, ক্ষতলাঞ্ছিত পদে। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছেন, এদেশে ভালো কাজ করা বড় কঠিন। কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনা, হয় নিরাপদ দূরত্ব থেকে বাহবা দেয়, কিম্বা নিষ্করুণ প্রতিকূলতা করে। তাঁর সময় থেকে এখন অবস্থা আরও শোচনীয়। জাতীয় দায়িত্ববোধ এখন আর অবশিষ্ট নেই বললেই হয়। কিছুমাত্র ত্যাগ স্বীকারেও কারও আগ্রহ নেই। লাভক্ষতির ভগ্ন অংশ ভাগ নিয়ে সকলেই ব্যাপৃত।

এখন অবশ্য আমাদের স্বাধীন কল্যাণ-রাষ্ট্র (Welfare State) হয়েছে। কল্যাণ-প্রয়াস মাত্রই এখন সরকারের আনুকূল্য লাভ করে থাকে বলে' শুনি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে, বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে, সরকারের কল্যাণহস্ত কেন প্রসারিত দেখিনা ? দু-একটা বিজ্ঞাপন তাঁরা দেন, অস্বীকার করবো না। কিন্তু তার মূল্য খুব বেশী নয়। এবং সেখানেও গুণগত উৎকর্ষ বিচার করা হয় না ; মুড়ি মুড়কির বিচার নেই—আজেবাজে, অক্ষম লেখনী-কণ্ডুতির বাহন সব পত্রিকার সঙ্গে সামিল করে' তাদেরও 'মুদ্রা দুই চারি' দিয়ে বিদায় করা হয়। আমাদের প্রশ্ন, প্রায় ত্রিশ বৎসর হতে চললো এখনো এরাজ্যে সাংস্কৃতিক মন্ত্রীর পদ কেন সৃষ্ট হলো না। জাতীয় জীবনে বাঙালীর যে-অভ্যুন্নতি ঘটেছিল তা তার সাংস্কৃতিক অভ্যুন্নতির পরোক্ষ ফলস্বরূপ। সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের চেষ্টা না করে,' এ-উদ্যোগ সে-উদ্যোগ স্থাপন করে' সত্যিকার অভ্যুদয় ঘটানো যাবে না। বাঙালীর সঞ্জীবনী-মন্ত্র তার সাহিত্য-সংস্কৃতি চেতনায়, তার সর্ব্বতোগামী জিজ্ঞাসায় এবং দ্বৈমত্যের সাহসে। এরই প্রবর্দ্ধনে যারা নিয়োজিত, নিবেদিতপ্রাণ, তাদের সাহায্যের জন্য সরকারের সংস্কৃতি-মন্ত্রকের এগিয়ে আসা উচিত। কিন্তু সরকারের সংস্কৃতি-মন্ত্রক না থাকায় এই অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজটি এখনো অবহেলিত। জাতিগঠনের কাজে যারা অগ্রণী সৈনিক, জাতির চিত্ত-জাগৃতিসম্পাদনে নিরন্তর ব্যাপৃত, ত্যাগব্রতী এই পত্রিকাগুলিকে একে একে বিনষ্ট হতে দেওয়া খুবই ক্ষতিকর হচ্ছে। কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের এই ঔদাসীন্য ও অনবহিতি আমরা দুঃখজনক মনে করি।

২৭. ৯. ৭৫

CENTRAL LIBRARY

ম্যাগসেসে পুরস্কার

কাগজে দেখলাম (সকলেই দেখেছেন) আরেকজন ভারতীয় ম্যাগসেসে পুরস্কার পেলেন। দিল্লীর হিন্দুস্থান টাইম্‌স্ পত্রিকার সম্পাদক জর্জ্জ ভারগীজকে এবছর এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছেতঁ—ার বলিষ্ঠ ও দায়িত্বপূর্ণ সাংবাদিকতার জন্য। প্রত্যেক বছর ৫টি বিভাগে ম্যাগসেসে পুরস্কার দেওয়া হয়,—সাহিত্য ও সাংবাদিকতা, শিল্প সংস্কৃতি, সমাজসেবা, সরকারী অমাত্যের কর্তব্যনিষ্ঠা ও বিচক্ষণতা, এইসব ক্ষেত্রে। প্রত্যেকটি পুরস্কারের আর্থিক মূল্য প্রায় পঁচাত্তর হাজার টাকা।

গণতন্ত্রকে সুস্থ ও সবল রাখতে হলে একদিকে যেমন চাই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ তীক্ষ্ণধী বিচক্ষণ সরকারী অমাত্য, তেমনি অন্যদিকে চাই সত্যসন্ধ নির্ভীক দায়িত্ববান সাংবাদিক। একজন গণতন্ত্রকে সফল করবেন কাজের দ্বারা, অন্যজন সদাজাগ্রত প্রহরার দ্বারা—যাতে অন্যায় ও দুর্নীতির স্তূপে গণতন্ত্রের চাকা না বিকল হয়ে যায়। এ ছাড়াও একক বা সংস্থাগত প্রয়াস দ্বারা যারা নিরন্তর সমাজের মঙ্গল কর্ম্মে নিরত, গণতন্ত্রে তাঁদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। শুধু সরকারী উদ্যোগ নয়, সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনে প্রত্যেক নাগরিকের সচেতন প্রয়াস সঞ্চালিত না হলে গণতান্ত্রিক সমাজের কল্যাণ নাই। সমাজের প্রতি ব্যক্তির এই দায়িত্ববোধও গণতন্ত্রের একটি মৌল প্রয়োজন। এবং শিল্প সংস্কৃতি চিত্র সঙ্গীত নৃত্যেরও ভূমিকা গৌণ নয়। তারা যে শুধু জীবনে মাধুর্য্যেরই সঞ্চার করে তাই নয়, সাধনার দ্বারা সিদ্ধির ও উৎকর্ষের কোন্ স্তরে পৌছানো সম্ভব তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে' প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তারা অনুপ্রাণিত করে। গণতন্ত্রে ব্যক্তির বিকাশের জন্য এদের স্থানও সম্মানের।

ভারতরাষ্ট্রে এ-জাতীয় একটি পুরস্কার কেন প্রবর্ত্তিত হলো না, তাই ভাবি। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সংববর্দ্ধন ও সংরক্ষণ সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়া উচিত। সাহিত্যে শিল্পে শ্রেষ্ঠদের যে সম্মানিত করা হয় না তা নয়, কিন্তু ম্যাগসেসে পুরস্কারের তুলনায় তার আর্থিক মূল্য সামান্যই। তা ছাড়া সে সব ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যেই পরিচ্ছিন্ন। আন্তর্জাতিক সমাজে এমন কি ম্যাগসেসে পুরস্কারের মতো, এশীয় রাষ্ট্রমণ্ডলীর মধ্যেও তার পরিধি বিস্তৃত নয়। ফিলিপাইন্‌স্-এর মতো অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন একটি দেশের পক্ষে এ-জাতীয় চারটি পুরস্কারের প্রবর্তন খুবই গৌরবের কথা। এশিয়া-খণ্ডে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপচয়ে ফিলিপাইনস্-এর ভূমিকা এর দ্বারা স্মরণীয় হয়ে থাকবে, বিশ্বে মানবসংস্কৃতির পরিপোষণে নোবেল পুরস্কারের

ভূমিকার অনুরূপ।

প্রশ্ন জাগে, শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী ও অর্দ্ধ ভারগীজের নির্ভীক সত্যসন্ধ সাংবাদিকতার গণতান্ত্রিক ভূমিকা এদেশে তৎপূর্ব্বে স্বীকৃত হয়নি কেন? সুদূর ফিলিপাইন্‌স্‌-এ বসে' এই পুরস্কার কমিটি সন্ধানী আলো ফেলে দেখছিলেন এশিয়ার কোন্ প্রান্তে কোন্ গণতান্ত্রিক সৈনিক গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য ও সংস্থিতির জন্য বীরোচিত সংগ্রাম করে চলেছেন। তাই এঁরা পুরস্কৃত হলেন। কিন্তু এদেশেই এর পূর্ব্বে যদি এঁদের কাজের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হতো তা হলে আমাদের পক্ষে তা আরো আনন্দের হতো নিশ্চয়ই।

আমরা মনে করি পঃ বঙ্গ সরকার—সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁরা ইতিমধ্যেই চারটি পুরস্কার প্রবর্তন করেছেন—আদর্শ সাংবাদিকতার জন্যও তাঁরা অপর একটি পুরস্কার প্রচলিত করবেন। বিশেষ, যেসব ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচারে ও আলোচনায় ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশে একান্ত নিয়োজিত তাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠকে পুরস্কৃত করা তাঁদের কর্ত্তব্য। যদি এরূপ হয় যে, ফিলিপাইনস্ বা ঐরূপ কোনো দূর দেশ থেকে এ-প্রান্তের এরূপ পত্রপত্রিকা সম্মানিত হলো, এদিকে স্বদেশে তাদের উৎকর্ষ ও আদর্শনিষ্ঠা উপেক্ষিত ছিল, সেটা আমাদের দেশের পক্ষে পুনরায় অগৌরবের হবে।

গ্রন্থ-সমালোচনা

A Passage to England : **Nirad C. Chaudhuri : Orient Paper-books, 36 C, Connaught Place, New Delhi, 110001— Pp. 237 : Price : Rs 6/**

এ বইখানিই শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরীর সবচেয়ে উপাদেয় বই—অন্ততঃ ভারতীয় পাঠকদের পক্ষে। এতে তাঁর ভারত এবং যা কিছু ভারতীয় তার প্রতি বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতার উগ্রতা অনেক কম। কিন্তু তাই বলে' নীরদ বাবুর রচনা-চমৎকারিত্বের যে কিছু অপকর্ষ ঘটেছে তা নয়। বরং য়ুরোপীয় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির যে সুপরিসর ও সবিস্তার জ্ঞান তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য এখানে তার যথোচিত ও পর্য্যাপ্ত অবকাশ থাকায় বইখানি বিদগ্ধ পাঠকের পক্ষে উপভোগ্য হয়েছে। তা ছাড়া এ বইখানি তাঁর আনন্দের সন্তান—আনন্দময় অভিজ্ঞতার সুখরোমন্থন, কুপিত বায়ুর বিজৃম্ভন নয়। এ কারণেও বইখানি সুখপাঠ্য। পাঠক লেখকের আনন্দের দ্বারা সংক্রামিত না হয়ে পারেন না। লেখকের আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টি ও সুখমুগ্ধ হৃদয় তাকেও আচ্ছন্ন করে।

এবং এজন্যেই শ্রীচৌধুরীর স্বভাবসিদ্ধ, প্রায় মুদ্রাদোষে পর্য্যবসিত, স্বদেশ- ও স্বজাতি-অপ্রীতি, যা স্থানে অস্থানে এখানেও কিছু কিছু ফুটে বেরিয়েছে, তা অনেকাংশে ঐ আনন্দের মূল সুরের তলায় চাপা পড়ে গেছে। এবং সামগ্রিক খোশমেজাজী আবহাওয়ায় তাদের গুঁতোনী তেমন অসহ্য ঠেকে না।

বিলেতে তো অনেকেই যায়, কিন্তু এত আনন্দে তো কেউ রোমাঞ্চিত হয় না। অবশ্য রোমাঞ্চিত হবার ক্ষমতা সকলের থাকে না। তা ছাড়া শ্রীচৌধুরীর মতো মনেপ্রাণে ইংলণ্ডকে গভীর ভালবেসে, ভক্তিনম্র পূজারতি-পরায়ণচিত্তে ক'জন সে দেশে যান? এতো শুধু দেশভ্রমণ নয়। এ তাঁর চির-ঈপ্সিত দেশের সান্নিধ্যলাভ। এ তাঁর চিরস্বপ্নের বাস্তবীভবন। বাস্তবের সংস্পর্শে এলে স্বপ্ন প্রায়ই ভেঙ্গে যায় জানি। কিন্তু নীরদবাবুর ক্ষেত্রে এই চমৎকার ঘটেছে যে, বাস্তব তাঁর স্বপ্নকেও হার মানিয়েছে মনোহারিত্বে, আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করেনি, বরং আরো সজীব আরো শরীরী আরও সুদৃঢ় করেছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল গেয়েছিলেন, 'বিলেতদেশটা মাটির, সেটা সোনা রূপার নয়। নীরদবাবু দেখলেন যে, সেই মাটিই সোনা রূপার চেয়ে আশ্চর্য্য। আকাশে সূর্য্য চোখে দেখার মতো তেমন না উঠলেও এবং মেঘে রঙের সমারোহ চোখে না পড়লেও, সমস্ত পৃথিবীময় রূপের রঙের রসের যে সমারোহ তিনি দেখলেন তা ১১২ ডিগ্রি ফারেনহাইটের এই চিরদগ্ধ দেশে কখনো সম্ভব নয়। 'সূর্য-করোজ্জ্বল ধরণী'র বন্দনা রবীন্দ্রনাথ করেছেন সত্য, কিন্তু রূপের প্রকাশ যে সংবৃত-আলোক শীতমণ্ডলেই অপরূপ, সে-সত্য শ্রীচৌধুরীর আবিষ্কার। শুধু তাই নয়, এই উষ্ণ মণ্ডলে আমরা জানতাম না যে, বস্তুর বেধ আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না, তার জন্য প্রয়োজন ইংলণ্ডের অনতিউজ্জ্বল দিবালোক। আমাদের স্থাপত্যও সেই কারণে মহত্বলাভে যে বঞ্চিত তাও জানতাম না।

শ্রীচৌধুরী—ওদেশে গির্জ্জায় গিয়ে উপাসনায় যোগ দিয়ে ভক্তিতে, আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবাহে নিমজ্জিত হয়েছেন। এ দেশের দেবমন্দিরে কিন্তু এর বিপরীত মনোভাবই হয়েছে তাঁর। আমাদের ধর্ম মূলতঃ মন্দিরকেন্দ্রিক ও মূর্ত্তিপূজাকেন্দ্রিক নয়, এও তিনি বলেছেন; কিন্তু আমাদের ধর্ম্মটা যে কী তা কোথাও বলেন নি। আমাদের-যে ধর্মবোধ বা আধ্যাত্মিকতা কিছু আছে সে বিশ্বাসই তাঁর নেই।—আমরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি বলেই ঐহিকসর্ব্বস্ব; আমাদের ধর্মকর্ম্মও সেই ঐহিকেরই পূজা। কেবল বাসনা আর কামনা, দেহি-দেহি'র আবৃত্তি!

উঠতে বসতে ইংরেজদের গালাগালি দেওয়া আমাদের 'স্বদেশী' ব্যসন,

of the Nation। যন্ত্রবাহন সভ্যতার চূড়ায় পৌঁছেও ইংরেজদের গভীর সংস্কৃতি-চেতনা ও ঐতিহ্য-চেতনা দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছেন। এতটা তিনি প্রত্যাশা করেন নি। শেক্‌সপীয়রের নাটকের টিকেটের জন্য সারারাত ঠাণ্ডায় পথের উপর শুয়ে কাটানো, এবং অভিনয়কালীন দর্শকদের তন্ময়তা লক্ষ্য করে' তিনি অভিভূত হয়েছেন। কান্ট্রি-হাউস বা অভিজাতদের প্রাচীন সুরম্য প্রাসাদগুলি দেখার জন্য সর্ব্বস্তরের লোকের সশ্রদ্ধ আগ্রহ দেখেও অবাক হয়েছেন। ইংলণ্ড এখনো প্রাণে মনে প্রাচীন ইংলণ্ড, এখনো রেনেসাঁসের যুগেই বাস করছে, অনুভব করেছেন শ্রীচৌধুরী। ইংরেজরা তাদের ইতিহাসের মধ্যেই নিমজ্জিত হয়ে আছে এবং সে-ইতিহাস অর্বাচীন নয়।

ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতাই ইংলণ্ডকে মনে প্রাণে অপরিবর্ত্তিত রেখেছে, বাইরে যতোই সাজবদল হোক। এখানেই তার বৈশিষ্ট্য এবং এখানেই তার শক্তির উৎস।

এছাড়া যা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন লেখক তা হলো 'ওয়েলফেয়ার ষ্টেট' বা কল্যাণরাষ্ট্রের সার্থক রূপায়ন। 'কল্যাণরাষ্ট্র' সম্পর্কে লেখকের একটু ভয় ও সন্দেহই ছিল—আধুনিক সর্ব্বব্যাপী আমলাতন্ত্রের হৃদয়হীন কল্পনাহীন কোনো কেঠো অপসৃষ্টি দেখবেন এই আশঙ্কা ছিল। কিন্তু দেখলেন ওরা সত্যি সত্যিই কল্যাণকে সৃষ্টি করতে পেরেছে। দুবেলা খাওয়ার অভাব, রোগে চিকিৎসার অভাব, বার্দ্ধক্যে পরিচর্য্যার অভাব—এ তারা দূর করেছে। সর্ব্বস্তরে সুখ, সমৃদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য তারা পরিব্যাপ্ত করেছে। এ বড় আশ্চর্য্য করা। পার্লামেন্টে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছে, এরা যেন খেলা করছে—নিয়ম বেঁধে, তবে খেলা—উত্তাপ নেই, হৈ চৈ নেই ঔদ্ধত্য নেই, মস্ত কিছু করার আড়ম্বর নেই। কিন্তু সারা দেশে কাজ হয়ে চলেছে সংযতবাক্ নিপুণতায়, প্রায় নেপথ্যচারী অসাধারণ কর্মিষ্ঠতার সঙ্গে। তাই বিন্দু অপচয় নেই—যেমন ভূমির তেমনি মানুষের শ্রমের। সমাজের বদল হয়ে চলেছে। যন্ত্রের কল্যাণে কল্যাণরাষ্ট্রে চিরকেলে কৃষকের ঘটেছে প্রস্থান, তার স্থান নিয়েছে যন্ত্রবাহন কৃষি-শিল্প কর্মী। শিল্পশ্রমিকরা হয়ে উঠছে মধ্যবিত্ত,—উচ্চবিত্তরাও তাই। সাম্যের আদর্শ এখন বাস্তবে প্রায় পরিণত। তবু এই কল্যাণরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেছেন লেখক। একান্ত অভাবমুক্ত সমাজে মানুষের সৃষ্টিশীলতা কি স্তব্ধ হয়ে যাবে না?

মোটের উপর A Passage to England বইখানি সুখপাঠ্য। যদি শ্রীচৌধুরীর স্বদেশ-বিদূষণের উৎসাহ আরও একটু সংযত হতো, তা নিঃসন্দেহে আরও আনন্দদায়ক হতো ভারতীয় পাঠকের পক্ষে। তবে শ্রীচৌধুরীকে, তিনি-যা-তাই হিসেবে, নেওয়াই উচিত। অন্যরূপ হলে' শ্রীচৌধুরী হয়তো এত ভালো লিখতে পারতেন না। তাঁর চিত্তের মৌল প্রেরণাই হয়তো তাঁর স্বদেশ-বিদ্বেষ-সঞ্জাত।

CENTRAL LIBRARY

আর একটির দফারফা হ'ল!

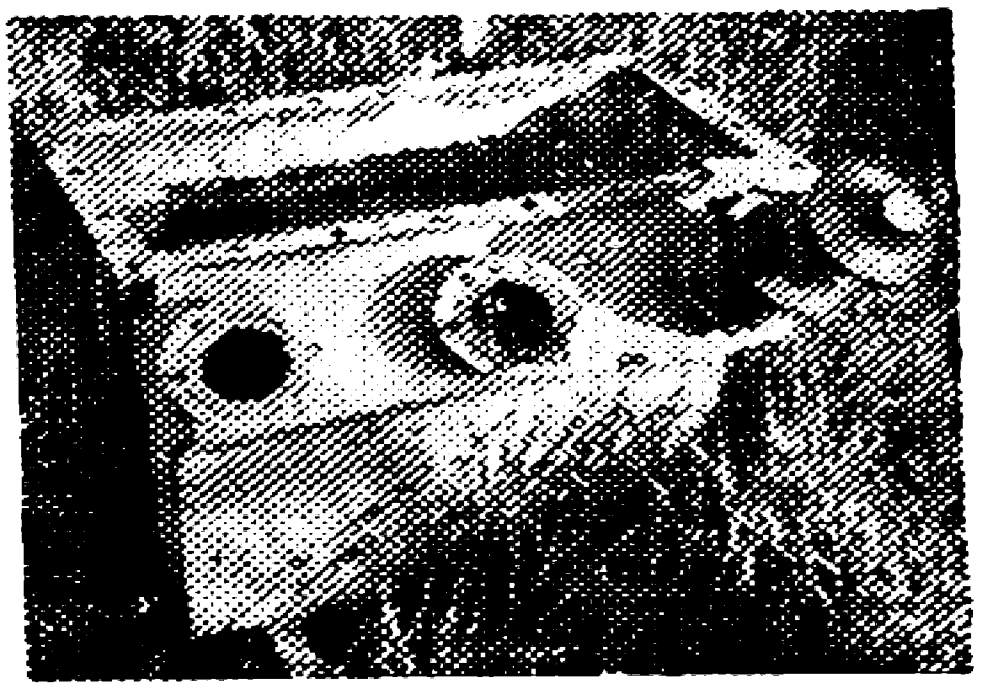

এধরনের কাজের জন্য দায়ী কারা?

নিশ্চয়ই কিছুসংখ্যক
সমাজবিরোধী দুর্বৃত্ত

লোড-শেডিংয়ের ফলে আপনার দুর্ভোগ যেখানে মাত্র কয়েক ঘণ্টার, সেখানে এ ধরনের উৎপাতের দরুন আপনার ভোগান্তি কয়েক সপ্তাহ ধরে চলতে পারে।

বিদ্যুৎ পর্ষদের যন্ত্রপাতি দেশ ও দশের সম্পদ। এই সম্পদ রক্ষায় সচেষ্ট হোন। নগদ পুরস্কার ছাড়াও উন্নত বিদ্যুৎব্যবস্থা চালু রাখতে সাহায্য করুন।

জাতীয় সম্পদ রক্ষায় সাহায্য করুন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

আবার উৎসবের ঋতু এল—
—উদ্বেল হ'বার দিন!
—উচ্ছল হ'বার দিন!
আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সর্বক্ষণ সেবায়

দক্ষিণ পূর্ব রেলপথ

medium

CENTRAL LIBRARY

Registration No. R. N. 18431/70
ALEKHYA VOL VI Nos. 1 & 2 Oct. 75

20 NOV 1975

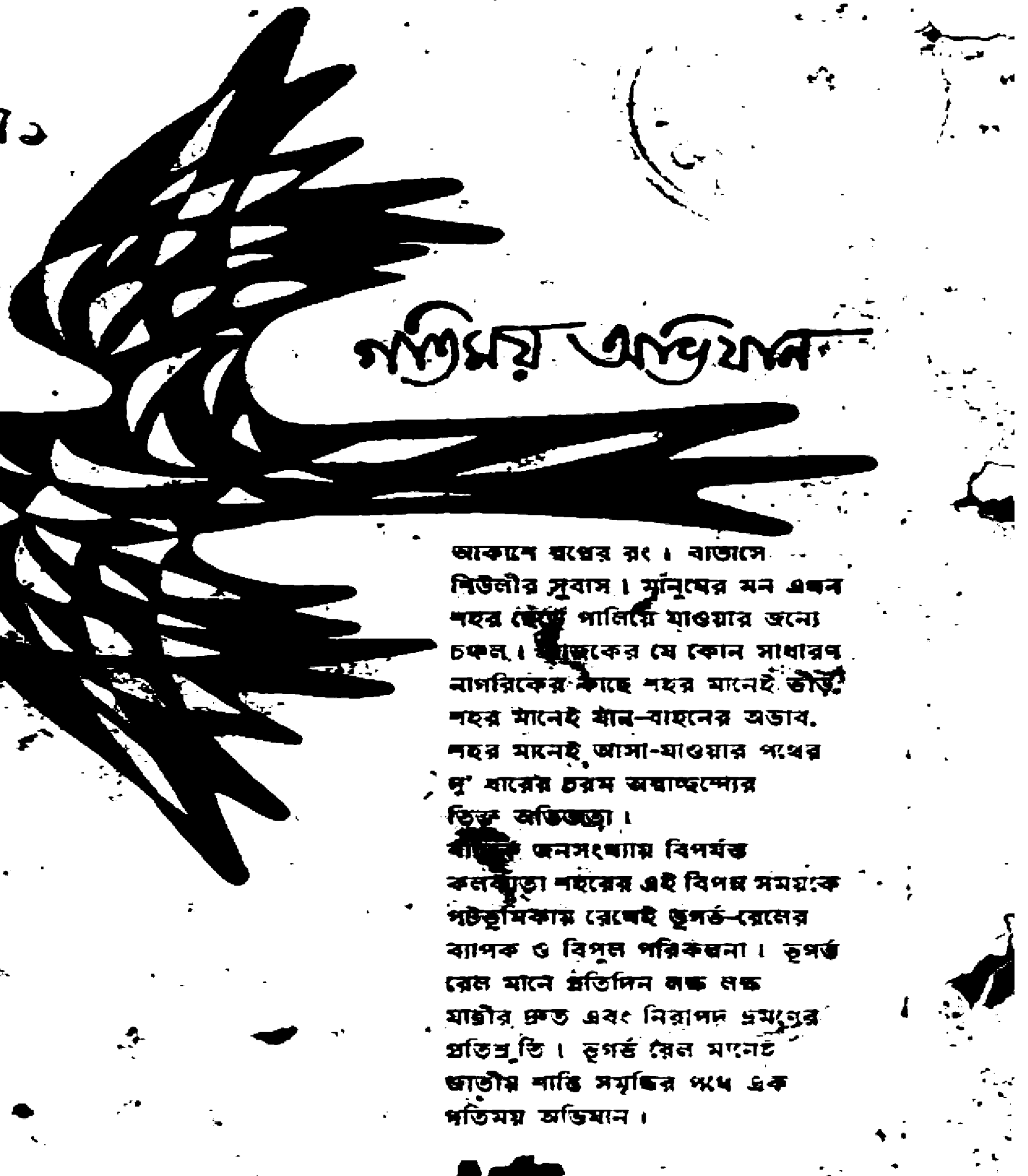

আকাশে রঙের রং। বাতাসে শিউলীর সুবাস। মানুষের মন এখন শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে চঞ্চল। আজকের যে কোন সাধারণ নাগরিকের কাছে শহর মানেই ভীড়, শহর মানেই যান-বাহনের অভাব, শহর মানেই আসা-যাওয়ার পথের দু' ধারের চরম অস্বাস্থ্যের তিক্ত অভিজ্ঞতা।

বাড়ন্ত জনসংখ্যায় বিপর্যস্ত কলকাতা শহরের এই বিপন্ন সময়কে পটভূমিকায় রেখেই ভূগর্ভ-রেলের ব্যাপক ও বিপুল পরিকল্পনা। ভূগর্ভ রেল মানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রীর দ্রুত এবং নিরাপদ ভ্রমণের প্রতিশ্রুতি। ভূগর্ভ রেল মানেই জাতীয় শান্তি সমৃদ্ধির পথে এক গতিময় অভিযান।

MP

কলকাতার মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট
প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

আলেখ্য শারদীয় মুখ সংখ্যা ১৩৮২ মূল্য তিন টাকা।
শ্রীকৃতীন্দ্র চন্দ্র ঘোষাল কর্তৃক ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত এবং ৫০, সন্তোষপুর এভিনিউ, কলিকাতা-৩২ হইতে প্রকাশিত।

CENTRAL LIBRARY

ঝংকার

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা • বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩

"A right cause never fails ; a true word never hurts ultimately"

—Mahatma Gand

মোহিতলালের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

(কবিশেখর কালিদাস রায়কে লিখিত)

বাংলা বানানে শৃঙ্খলা

ফকিরমোহন সেনাপতির আত্মজীবনী

সাহিত্য ও টোট্যালিটেরিয়ানিজ্‌ম্‌

পথে - বিপথে

সমাজচিন্তা ইত্যাদি

CENTRAL LIBRARY

আলেখ্য

সূচীপত্র

মোহিতলালের অপ্রকাশিত পত্রাবলী ॥ ৪৪১

পরিমল গোস্বামী স্মরণে ॥ সুনীল চট্টোপাধ্যায় ॥ ৪৬০

বাংলাবানানে শৃঙ্খলা ॥ নীলরতন সেন ॥ ৪৬৩

জন্ম দার্শনিক (কবিতা) ॥ অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় ॥ ৪৬৯

সাহিত্য ও টোট্যালিটেরিয়ানিজ্‌ম্‌ ॥ জর্জ অরওয়েল ॥ ৪৭০

পথে-বিপথে ॥ সাধনকুমার ঘোষ ॥ ৪৭৩

ফকীরমোহন সেনাপতির আত্মজীবন চরিত ॥ দিলীপকুমার বিশ্বাস ॥ ৪৮৯

অপরাজিত বিভূতিভূষণ ॥ চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় ॥ ৪৯৯

আঁধারের ওপারে (উপন্যাস) ॥ মৈনাক ॥ ৫০৬

সাহিত্য প্রসঙ্গ ॥ ৫২৪

সমাজচিন্তা ॥ ৫২৭

গ্রন্থ সমালোচনা ॥ ৫৩৩

সম্পাদক—ক্ষিতীন্দ্র চন্দ্র ঘোষাল

৫০, সন্তোষপুর এভিনিউ

কলিকাতা ৩২

ফোন : ৪২-১৫৬২

বার্ষিক চাঁদা-

সডাক নয় টাকা

নূতন ও পুরাতন সব আলেখ্যর জন্য

খোঁজ করুন—

শঙ্কর বুক ষ্টল

২১০/১ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

(গড়িয়াহাট জংশনের নিকট)

With the Compliments of

TATA STEEL

পুরাতন সংখ্যা আলেখ্য

এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে।

মূল্য ঃ সাধারণ সংখ্যা প্রতিকপি—দেড় টাকা
বিশেষ সংখ্যা ,, —তিন টাকা

বাঁধানো আলেখ্য-র সেট

১ম থেকে ৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রতি খণ্ড চোদ্দ টাকা

যোগাযোগ করুন—

প্রকাশক, আলেখ্য

৫০, সন্তোষপুর এভিনিউ, কলিকাতা-৩২

আলেখ্য-ষষ্ঠ বর্ষ

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

অপরাজিত বিভূতিভূষণ ॥ চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় ॥ ১৩৭, ৪৯৯

আঁধারের ওপারে (উপন্যাস) ॥ মৈনাক ॥ ৬৫,২১৫,৫০৬

আমার আত্মজীবনীর চুম্বক ॥ বারট্রাণ্ড রাসেল ॥ ৮৭

একের সমান ছয়, না ছয়ের সমান এক ॥ ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক ॥ ২০৮

কবিতা :—১,৪০-৪৫,১১০-১১২,২২৭,২২৮,৩৯১-৯৩,৪৬৯

গ্রন্থ সমালোচনা ॥ ১৬০,৪২৫,৫৩৩

থোরোর আইন অমান্যবাদ ॥ তীর্থরেণু দাস ॥ ২৪৯

পথে বিপথে ॥ সাধনকুমার ঘোষ ॥ ১১৩,২২৯,৪৭৩

পয়ার : কাব্য ও ছন্দ ॥ রামবহাল তেওয়ারী ॥ ১৮০

পরিমল গোস্বামী স্মরণে ॥ সুনীল চট্টোপাধ্যায় ॥ ৪৬০

পঞ্চভূতের আসর ॥ ২৩৭,৩৯৪

পালা বদল ॥ অন্নদাশঙ্কর রায় ॥ ১৩

পারস্য সাহিত্যের চিত্ররেখা ॥ পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য ॥ ৯৮

প্রসঙ্গ : শেষপ্রশ্ন ॥ রমেন্দ্র নারায়ণ সরকার ॥ ৩৮৬

ফকীরমোহন সেনাপতির আত্মজীবনচরিত ॥ দিলীপকুমার বিশ্বাস ॥ ১৯, ১৬৫,৪৮৯

বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত পত্রাবলী ॥ ৩

বাসী ফুলের মালা ॥ শিবচন্দ্র লাহিড়ী ॥ ২৯৭

বাংলা বানানে শৃঙ্খলা ॥ নীলরতন সেন ॥ ৪১৩

ভ্রমণে উপেক্ষিত ॥ হিরণ কুমার সান্যাল ॥ ১৪৫

মোহিতলাল স্মৃতিকথা ॥ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ॥ ৪৭,২০০

মোহিতলালের অপ্রকাশিত পত্রাবলী ॥ ৪৪১

রক্ষণশীল প্রগতিশীল শরৎচন্দ্র ॥ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ॥ ৩৬০

শিবনাথ শাস্ত্রীর অপ্রকাশিতর ডায়েরী প্রসঙ্গে ॥ বারিদ বরণ ঘোষ ॥ ৪৯

শরৎ শতবর্ষ জয়ন্তী ॥ ২৬৫-২৬৮

শরৎচন্দ্রের রচনা থেকে সংকলন ॥ ২৬৮-২৮০
শরৎচন্দ্র ॥ নারায়ণ চৌধুরী ॥ ২৮১
শরৎচন্দ্র ও উত্তরকাল ॥ হরপ্রসাদ মিত্র ॥ ২৯০
শরৎচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন ॥ ২৯০
শরৎচন্দ্রের অভয়া ॥ জ্যোতির্ময়ী দেবী ॥ ৩২২
শরৎচন্দ্র ও ব্রাহ্মসমাজ ॥ বারিদবরণ ঘোষ ॥ ৩২৪
শরৎচন্দ্র ও হিন্দু মুসলিম প্রশ্ন ॥ সুরজিৎ দাশগুপ্ত ॥ ৩৩৭
শরৎচন্দ্রের বিপ্রদাস ॥ গোপেশ চন্দ্র দত্ত ॥ ৩৪৬
শরৎচন্দ্র (১৮৭৩-১৯৩৮) দিলীপকুমার সান্যাল ॥ ৩৭৫
শরৎচন্দ্রের শিল্প কৌশল ॥ অমলেন্দু বসু ॥ ৪০৯
সংবাদপত্রের কতখানি স্বাধীনতা বাঞ্ছনীয় ॥ রয় জেঙ্কিন্‌স্‌ ॥ ৩২
সাহিত্য ও টোট্যালিটেরিয়ানিজ্‌ম্‌ ॥ জর্জ অরওয়েল ॥ ৪৭০
সমাজ চিত্র ॥ ১৪৯,২৫৪,৪১৯,৫২৭
সংস্কৃতি প্রসঙ্গ ॥ ১৫৭, ৪১৬,
সাহিত্যপ্রসঙ্গ ॥ ৫২৪
হজরত আমীর খসরু দেহলভী ॥ জগদীশ নারায়ণ সরকার ॥ ১০৫
হাল আমলের বাংলা কবিতায় ঈশ্বর ॥ বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১৯৫

৬ষ্ঠ বর্ষ,
৬ষ্ঠ সংখ্যা

আলেখ্য

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ
১৩৮৩

মোহিতলালের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

কবিশেখর কালিদাস রায়কে লিখিত

সম্পাদনা—শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

[মোহিতলালের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে 'শনিবারের চিঠি'র যে 'মোহিতলাল-সংখ্যা' প্রকাশিত হয় (ভাদ্র, ১৩৫৯) তাতে কবিশেখর কালিদাস রায় মোহিতলাল সম্পর্কে একটি তথ্যপুর্ণ স্মৃতিচারণা করেন। সে স্মৃতিচারণায় কবিশেখর মোহিতলালকে চল্লিশ বৎসরের বন্ধু বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুতপক্ষে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে ঢাকা যাবার বহু পূর্ব থেকেই কালিদাস রায় মোহিতলালের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম এবং সাহিত্য জীবনের সঙ্গী ছিলেন। প্রকৃতির দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হলেও সাহিত্যিক হিসেবে এক জায়গায় উভয়ের মিল ছিল—উভয়েই একাধারে অকৃত্রিম কবি এবং মনীষী সমালোচক। সাহিত্য উভয়ের নিকটই ছিল সাধনার বস্তু। এ সমস্ত কারণেই বোধহয় এ-দুজন স্মরণীয় কবি-সাহিত্যিকের সৌহার্দ্যের বন্ধন জীবনের শেষ কাল পর্যন্ত অটুট ছিল।

মোহিতলাল তাঁর সাহিত্য জীবনের অন্তরঙ্গ সুহৃৎ কবিশেখর কালিদাস রায়ের সঙ্গে জীবনের সকল অবস্থাতেই পত্র সংযোগ রক্ষা করে চলতেন। সে পত্রগুলির কোন কোন স্থানে ব্যক্তিপ্রসঙ্গ থাকলেও মুখ্যত মোহিতলালের সাহিত্য সম্পর্কীয় ধারণা ও প্রত্যয়ে পরিপূর্ণ। সে-হিসেবে পত্রগুলির সাহিত্যিক মূল্য যথেষ্ট। মোহিতলালের এ জাতীয় কয়েকখানি অপ্রকাশিত পত্র ইদানীং কবিশেখর কালিদাস রায়ের পুত্রেরা আমাকে দিয়েছেন। এবং তা-ই নয়, কবিশেখরের পুত্র কল্যাণীয় কবিকঙ্কন ও কবিরঞ্জন রায় এবং পুত্র-বধূ শ্রীমতী অঞ্জলিকা ও মঞ্জুলিকা রায় পত্রগুলিকে মূল থেকে কপি করে দিয়ে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। 'আলেখ্য' সম্পাদকের বন্ধুসম্মিত তাগিদে মোহিতলাল-কালিদাস রায়-অনুরাগীদের অবগতির জন্য পত্রগুলি ছাপতে দিলাম। প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ কার্যে কোন কোন ক্ষেত্রে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন সুসাহিত্যিক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত এবং ডক্টর

অমলেন্দু বসু। এঁদের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাতে মামুলি ধন্যবাদ দেবার প্রশ্ন ওঠেনা। এ পত্রগুলি যদি মোহিতলাল-কালিদাস রায় অনুরাগী তথা বিদগ্ধ পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়, ভবিষ্যতে এ ধরণের আরও পত্র প্রকাশ করার চেষ্টা করবো।]

(১নং চিঠি)

৮, হাটখোলা রোড
ওয়ারি পোঃ ঢাকা
১৮।৭।২৮

ভাই কালিদাস বাবু,

আপনার চিঠি পেতে দেরী হয়েছে—কাল আমাকে সুশীল বাবু চিঠিখানি দিলেন[১], তার কারণ, আমার কাজ ছিলনা বলে' মাঝে কয়দিন University তে যাইনি। এই জন্যেই উত্তর দিতে দেরী হ'ল।

চাকরীর ক্ষেত্রে অর্থাৎ জীবন যুদ্ধে আপনি আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন বলে লজ্জিত হয়েছেন কেন? আমিও ত' সে দোষে দোষী! দেশী বা বিলিতী প্রথা কি তা' জানিনে কিন্তু এটা জানি যে হৃদয়ের প্রথা অনুসারে আমারই আপনার কাছে লজ্জা নিবেদন করা উচিত ছিল। আমি জয়ী হওয়ায় আপনার যে ক্ষতি হ'ল আমার ঠিক সেই ক্ষতি নিবারণ হয়েছে।[২] যেখানে প্রাণ নিয়ে টানাটানি সেখানে কেউ কারো মুখ চাইতে পারিনে—এই খানেই দেহ ধারণ করার সব চেয়ে গ্লানি। যদি বিশ্বাস করা সম্ভব হয়, তবে অনুগ্রহ করে এইটুকু বিশ্বাস করবেন যে আমার ভিতর দৈন্যপীড়িত জীবন সংগ্রামে জর্জরিত মানুষ ছাড়া আর একজন যিনি আছেন তিনি আজও পর্য্যন্ত আপনার কথা ভেবে খুব কষ্ট পাচ্ছেন। ইচ্ছে ছিল আসবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করব, কিছু শেষের দিকে এতই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে সেটা আর হয়ে উঠল না।

আপনার যোগ্যতা সম্বন্ধে কারো মনে এতটুকু সন্দেহ নেই, সুশীল বাবুও তা স্বীকার করেন। যদি আমি accept না করতাম তবে এ চাকরী আপনারই হ'ত। কার necessity বেশী জানিনে, তবে আপনার ভাগ্য যে অধিকতর মন্দ তা বলতেই হবে।

আজন্ম বাণীসেবার পুরস্কার বলে আমি এই সৌভাগ্য স্বীকার করিনে। যদি বাণীর যথার্থ সেবা করে থাকি তবে তার পুরস্কার নেই—না থাকাই বিশ্ববিধাতার নিয়ম। কৌপীন ও তরুতল বাণীসেবকের একমাত্র গতি। ঢাকায় আসতে আমার একটু প্রাণের ইচ্ছা ছিল না। বাণীসেবার সমাধি

হিসেবেই আমি এই চাকরী নিয়েছি[৩] আর পারলাম না—পরিবার ও সন্তানদের দুঃখ আর সহ্য করতে পারলাম না। নিজের স্বাস্থ্যও একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে —এমন করে আর বেশীদিন বাঁচতাম না। অসহায় স্ত্রীপুত্রের মুখ চেয়ে, বাণীর সম্মোহন দৃষ্টি উপেক্ষা করেই এখানে এসেছি। আর একটা কারণ, আমি এর জন্যে বিশেষ চেষ্টা করিনি—it was in a way thrust upon me. আমি অদৃষ্টবাদী, তাই কোনও চিন্তা না করে চোখ বুঁজে ভেসে পড়েছি। আমার মনের অবস্থা আপনাকে জানালাম।

ঢাকায় যদি এরপর কোনও post খালি হয়, বা নূতন সৃষ্টি হয়, তবে সে আপনার—এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

এইবার আপনার কাজের কথার উত্তর দিই। একখানি মাসিকপত্র আপনার পরিচালনায় প্রকাশিত হবে শুনে আহ্লাদ হ'ল।[৪] সাহিত্যের উপযুক্ত সমালোচনার অভাব আছে, আশাকরি সেই দিকটায় খুব জোর দেবেন, এবং খুব অপক্ষপাতী হবার আগ্রহ দেখাবেন না—একটা খুব বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট নীতি আশ্রয় করবেন। আমার লেখার সম্বন্ধে এইটুকু বলে রাখি যে, উপস্থিত আমি একটু বিব্রত আছি, নতুন কাজ আয়ত্ত করে নিতে এখনও সময় লাগবে। তারপর, মনের অবস্থা ঠিক লেখার অনুকূল নয়। কবিতা ত' লিখতে বোধহয় পারবই না—গদ্য রচনা যদি হয়ে ওঠে আপনার কাগজে নিশ্চয় পাঠাব। 'শনিবারের চিঠি'র জন্যে এখনও খাটতে হচ্ছে—ওরা ছাড়ে না, Leading article গুলো প্রায় আমাকেই যোগাতে হয়। তারই সময় পাচ্ছিনে। তবু চেষ্টা করব। কিন্তু খুব ভরসা রাখবেন না। এর পরে যদি লেখার অভ্যাস ফিরে আসে, তবে আপনার কাগজের জন্যে যা পারি করব।

ঢাকায় এসে চারুবাবুর বাড়ীতে ৩।৪ দিন সপরিবারে কাটিয়েছি। এত আদর যত্ন এত উদার আতিথেয়তা আর কোথাও দেখিনি। চারুবাবু সত্যই খুব মহৎ প্রকৃতির লোক। এখন উপস্থিত এই বাসায় জুলাই মাসটা আছি। পরে চারুবাবুদের পাড়ায় একখানি বাংলো পাবার আশা আছে।[৫]

এখানে সাহিত্যের আবহাওয়ার কোনও বিশেষ লক্ষণ এ পর্য্যন্ত দেখিনি। বড় নির্জ্জন নিঃসঙ্গ অবস্থায় আছি। মনে হয় জীবন সমুদ্রের প্রায় সবটাই পাড়ি দিয়েছি—বাকি আর বেশি নেই। সমুদ্র ও আকাশের মোহানায় শীঘ্রই গড়িয়ে পড়ব—ভাঁটার টানে অস্তাচলের অন্ধকারে পূর্ণ বিস্মৃতির মধ্যে শান্তি লাভ করতে পারলেই আমার শেষ সাধ পূর্ণ হয়। বড় শ্রান্ত বড় অবসন্ন হয়েছি ভাই! আমার মধ্যে আর কিছু নেই।

'মরুশিখা'র সমালোচনা আমিই করেছিলাম—ঠিক হয়েছে কিনা জানিনে, আমি নিজে honestly যা ভেবেছি তাই লিখেছি, যতীন্দ্রবাবুর প্রতি অবিচার করা হয়নিত ? নিজে কবিতা লিখি বলেই কাব্য সমালোচনা করতে বাধ বাধ ঠেকে।[৩] যতীন্দ্রবাবুর কবিতা খুব ধীর গভীর ও সংযত সমালোচনার উপযুক্ত। তিনি যে শক্তিমান লেখক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কাজীর সংবাদ কিছু কিছু পেয়েছি। ঘটনাটা অতিশয় সাধারণ। একটি মেয়েকে গান শেখাতে গিয়ে তার এই লাঞ্ছনা হয়েছে। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ সামাজিক। কোনও ব্যক্তিগত কারণ নেই বলেই মনে হয়। আলোচনাটা অপ্রিয় বলে' সবিস্তারে করলাম না। কাজী এখান থেকে চলে গেছেন, সেই মেয়েটিও নাকি এখানে নেই।

আশাকরি আপনি সপরিবারে কুশলে আছেন। আমার ভালবাসা জানাই। মধ্যে মধ্যে পত্র দিলে আনন্দিত হব। ইতি

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১নং চিঠি (১৮।৭।২৮-এ লিখিত)

(১) সুশীল বাবু—ডক্টর সুশীলকুমার দে, এম. এ., পি. আর. এস., ডি-লিট (লণ্ডন)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ। এঁরই আনুকূল্যে মোহিতলাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। 'শনিবারের চিঠি'র সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত লেখক হিসেবে জীবনচর্যায় ভিন্নমুখী এই দুই মনীষীর মধ্যে যে সৌহার্দ গড়ে ওঠে জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত তা' অক্ষুণ্ণ ছিল।

(২) প্রসঙ্গটি মোহিতলালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদপ্রাপ্তি সংক্রান্ত। এ পদের জন্য মোহিতলালের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহিত্যিক বন্ধু কবিশেখর কালিদাস রায়। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করে আকাঙ্ক্ষিত পদ লাভ করলেও (১৯২৮) বন্ধুর ব্যর্থতায় মোহিতলাল আন্তরিক পীড়া অনুভব করেন। এটা নিঃসন্দেহে মোহিতলালের অকৃত্রিম বন্ধু প্রীতিরসে পূর্ণ উদার অন্তরের পরিচায়ক।

(৩) কলকাতার সাহিত্য সমাজ থেকে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় মোহিত-লালের এ নৈরাশ্যজনক অন্তরানুভূতি নিতান্তই সাময়িক। বস্তুতপক্ষে ঢাকায়

অধ্যাপক জীবনের সুপ্রচুর অবকাশের মধ্যে মোহিতলাল বাণীসেবার যে সুযোগ পেয়েছিলেন সে সুযোগই তাঁকে পরবর্তীকালে সমালোচক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করেছিল।

(৪) উল্লেখিত মাসিকপত্র—'রসচক্রে'র মুখপত্র 'বসুধারা'। এ সাহিত্যপত্র সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য পরে দ্রষ্টব্য।

(৫) অধ্যাপকের চাকরী নিয়ে ঢাকায় এসে মোহিতলাল প্রথমে সপরিবারে অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসায় ওঠেন (১৯২৮) এবং তাঁর উদার আতিথ্যে মুগ্ধ হন। কিন্তু উভয়ের অন্তঃপ্রকৃতি, দৃষ্টিভঙ্গী এবং সাহিত্যিক আদর্শ ভিন্নতর হওয়ায় শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে এ হার্দ্য সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকে নি।

(৬) সমকালীন কাব্যজগতে সুর-স্বাতন্ত্রের জন্য যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্য কবিতা মোহিতলালের নিকট ছিল পরম শ্রদ্ধা ও আদরের বস্তু। 'মরুশিখা'র সমালোচনা প্রকাশ করে' মোহিতলাল যতীন্দ্রকাব্যের সুরস্বাতন্ত্র্যের প্রতি পাঠক সমাজের যখন দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যতীন্দ্রকাব্যের সমালোচনা বাংলা সাহিত্যে তখন ছিল বিরলদৃষ্ট। এ ঘটনা নিঃসন্দেহে সমালোচক হিসেবে মোহিতলালের দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। সমকালীন কাব্যজগতে সুর-স্বাতন্ত্র্যের জন্য এ কবি বাংলা কাব্যে স্থায়ী আসন লাভ করবেন—সজোরে মোহিতলাল এ কথা ছাত্রদের নিকটেও ঘোষণা করতেন।

(২নং চিঠি)

38 Nilkhet Road
Ramna, Dacca.
23. 2. 29:

ভাই কালিদাস বাবু,

আপনার চিঠি অনেকদিন হ'ল পেয়েছি, এ পর্য্যন্ত উত্তর দিতে না পারায় বড় লজ্জিত আছি। "বসুধারা" নিয়মমত পাচ্ছি এ জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।[১]

আপনি চৈত্র মাসের জন্য একটা কবিতা চেয়েছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত একটিও কবিতা লিখে উঠতে পারিনি। মাঝে কিছুদিন জ্বরে পড়েছিলাম, প্রায় ১৪।১৫ দিন খুব অসুস্থ ছিলাম, এখন ক্রমে সেরে উঠছি। কলেজের কাজ ও অন্য অনেক ঝঞ্ঝাটে সময়ও পাইনে : আর, সময় পেলেও ঢাকার মানসিক আবহাওয়া কাব্যচর্চ্চার অনুকূল নয় বলে মনে হয়। এখানে এসে পর্য্যন্ত আমি একটাও মনের মত কবিতা লিখতে পারিনি ; আপনাদের তাগিদে যা দু'একটা লিখেছি তাতে মন উঠে না। এ জন্য কবিতা লেখাটা উপস্থিত

CENTRAL LIBRARY

কিছুকাল মুলতুবী রাখাই ঠিক করেছি। একটু আমেজ না এলে আমি এক ছত্রও লিখতে পারিনে। তবু আপনার অনুরোধ রক্ষা করবার চেষ্টা করব—কি হবে জানিনে। আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে।

"বসুধারার" সম্বন্ধে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করে আপনি আমার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন—কিন্তু আমি এমনই বর্ব্বর যে একটা ভালো কথা এ পর্য্যন্ত লিখলাম না। আমার মনে হয় আপনার কাগজ আপনি সাধ্যমত ভালো করেই সম্পাদন করছেন। আজ কালকার দিনে একটা মনগড়া আদর্শ নিয়ে দূরে বসে সমালোচনা করা অন্যায়—চাই ত অনেক জিনিষ, কিন্তু পাওয়া যায় কোথায়? তবে 'বসুধারা'র প্রবন্ধ, সমালোচনা ও মন্তব্যাদি স্কুলমাষ্টারী ধরনের হচ্ছে। কবি-সম্পাদকের কাব্যরসরসিকতার ছাপ কিছু কম। সাহিত্যের চণ্ডীমণ্ডপ বেশ জমেছে বটে, কিন্তু গানের বৈঠক বসে নি; বাগানে অতসী, করবী ফুটছে বটে, কিন্তু অশোক, চাঁপা বা গোলাপ চামেলি নেই। কেমন একটু রুক্ষ শুষ্ক ভাব! আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনা যেটুকু হয়—তা বড় যেন মামুলি, সেকেলে ধরনের। এ বিষয়ে আমার ধারণা একটু স্বতন্ত্র। প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব—এ সব খুব ভালো জিনিষ, এ সবের বিশিষ্ট মূল্য আছে; কিন্তু এখন সবচেয়ে দরকার হয়ে পড়েছে জীবন্ত সাহিত্যের রস সন্ধান। তার জন্যে Modern Literature ও Modern Study of Literature-এর আদর্শ ও পথ নির্দ্দেশ করতে হবে। সাহিত্যিক রসবোধটাই দেশ থেকে যেন উঠে গেছে, সেইটিকে আবার জাগাতে হবে। সাহিত্য-বিচারের ধারা বদলানো চাই—যে আদর্শ আধুনিক সাহিত্যের উপযোগী সেই আদর্শজ্ঞান আমাদের দেশে এখনো জাগেনি।[২] অথচ গত ৫০।৬০ বৎসর ধরে' যে বাংলাসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে অলক্ষ্যে সেই আদর্শই ফুটে উঠেছে। এ সম্বন্ধে আমি কিছু কিছু আলোচনা ইতিপূর্বে করেছি—সে আলোচনা সুস্পষ্ট বা সুসম্পূর্ণ হ'তে পারেনি অনেক কারণে। আমি 'প্রবাসী'তে 'কাব্যকথা' নাম দিয়ে যে Theory of Poetry গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলাম তা অর্দ্ধ পথেই অসমাপ্ত হয়ে গেছে।[৩] সম্প্রতি 'শনিবারের চিঠি'তে সেই কাজ একটু একটু আরম্ভ করেছি, কতদূর হয়ে উঠবে জানিনে। আজ দশ বৎসর আমি এই বিষয়ে সাধ্যমত আলোচনা ও চিন্তা করছি। এ পথে আর কাউকে অগ্রসর হতে দেখলে আমার মনের ভার অনেক কমে যাবে। সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে য়ুরোপে ও আমেরিকায় কিছু কাল ধরে যে জিজ্ঞাসার সূত্রপাত হয়েছে এবং সে সম্বন্ধে যে সব অপূর্ব গ্রন্থ লেখা হয়েছে, কবি ও কাব্য-

সমালোচনায় যে মনীষা ও রসবিচারের শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে তা' দেখলে চমৎকৃত হতে হয় ; তার সঙ্গে আমাদের দেশের সাহিত্য সমালোচনার আদর্শ ও পদ্ধতি তুলনা করলে লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করে !* 'বসুধারা'র ক্ষুদ্র কলেবরে সমাজতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বের, এমন কি শাস্ত্র সংহিতার যে রকম আলোচনা হচ্ছে—তা'তে ওর গল্প ও কবিতা নিতান্তই out of place বলে মনে হয়। কাগজখানাতে 'নস্যদানী' (?) ও 'দাড়ির' বহরই বেশি করে চোখে পড়ে। তবে ওর পিছনে যে একটা আদর্শ আছে এবং যত্নও যথেষ্ট আছে এটাও বুঝতে পারা যায়। এ জন্যে আমার মত ব্যক্তির মনের মত না হ'লেও, আমি আপনার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার প্রশংসা করি।

'মানসী'র সমালোচনা রীতির সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা' সকলেই স্বীকার করবেন। কিন্তু ওর কি কোনও 'locus standii' আছে ? কোন্ কাগজের আছে ? দিলীপকুমারের মত লেখক যে দেশের মাসিক সাহিত্যে, 'সবুজ-পত্র' থেকে 'কালিকলম' পর্য্যন্ত, একজন কবি ও সমালোচক বলে গণ্য হয়েছে —সেখানে সম্পাদক থেকে আরম্ভ করে লেখক ও পাঠকের বুদ্ধি ও বিদ্যার পরিচয় ত' পড়েই রয়েছে। আমি এসব ব্যাপার কখনও seriously নিইনে। "শনিবারের চিঠি"ই এ বিষয়ে আমার মতে সর্বোৎকৃষ্ট পত্রিকা। অবশ্য, 'চিঠি'র সকল লেখার সকল ভঙ্গীর আমি সমর্থন করিনে। কিন্তু তার জন্যে 'চিঠি'কে আমি এতটুকুও আমার সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত করিনে—চিঠি'র বারো আনা লেখা খুব সঙ্গত—তা হলেই যথেষ্ট। ভুলচুক হবেই। তার জন্যে বিরূপ হলে চলবে না। 'চিঠি'র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ গালি গালাজের ভিতরে যে Spirit টা প্রকাশ পায়, তাতে healthiness ও sanity আছে—রূঢ়তা আছে, কিন্তু imbecility, morbidness, বা stupidity নেই—এই attitude-টার প্রয়োজন এ সময়ে এত বেশী এবং আর কোনওখানে এর লক্ষণ নেই বলে, আমি ওর সঙ্গে মনে প্রাণে identified হয়েছি। এ সম্বন্ধে অনেক criticism আমি শুনেছি—চিঠির কাজ ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে আমি জানি ; কিন্তু কোনও যুক্তিতেই 'চিঠি'র বিরুদ্ধে Convinced হতে পারিনি। 'চিঠি' যে 'অকাজ' করছে তা'ও ভালো করে whole heartedly করছে—যদি কেউ কোনো 'সুকাজ' তেমনি ভাবে করতে পারে তবেই চিঠির উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে। যখন সাহিত্যের আদর্শনিষ্ঠা বা আদর্শজ্ঞান কোনখানে নেই, চারিদিকে Coterie ও clique, তার সঙ্গে ছোটবড় মহাপুরুষ পূজা সমান আগ্রহে চলেছে —অনাচার ক্রমশই বাড়ছে, তখন চোখবুঁজে কোনো রকমের সাত্ত্বিক আদর্শ

বা অহিংসা ধর্মের সাধনা করা যে নিষ্ফল তা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছি। সাহিত্যের অপদেবতাগুলোকে আগে দূর করে দিতে হবে এবং কোনো মহাপুরুষকে আদর্শ না করে' (তিনি যত বড় কবিই হোন) সাহিত্যের শাশ্বত আদর্শকে উদ্ধার করে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে—অতি কঠিন, নির্ম্মম নির্ভীক সত্যবাদের আশ্রয় নিতে হবে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অবস্থা দেখে এইটে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে।[৫]

'শনিবারের চিঠি' আপনাকে গাল দিয়েছে এতে আপনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন—সেটা স্বাভাবিক কিন্তু আপনি যে ভাবে 'তা' গ্রহণ করেছেন তাতে আপনিই জয়ী হয়েছেন। যেখানে আদর্শের বিরোধ সেখানে এরকম ঘটবেই, তবে চিঠির ভঙ্গিটা কটু ও কঠোর, তাই. লাগে বেশী। কিন্তু এতে আপনার সত্যকার মর্য্যাদার হানি হবে না। কিন্তু এই সম্পর্কে একটা কথা বলি, আপনি কি 'শনিবারের চিঠি'র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও গালিই পড়েন—প্রতিবারেই যেটুকু Serious আলোচনা থাকে তা যে আপনি পড়েন—আপনার চিঠিতে অথবা 'বসুধারা'য় নানা আলোচনা ও সমালোচনার মধ্যে তার ত' কোনও প্রমাণ পাইনে। অবশ্য তাতে আমি আশ্চর্য্য হইনি। কারণ আদর্শ এত বিভিন্ন যে. সে বিষয়ে কিছু লিখতে হলেই আপনাকে বিরুদ্ধ কথা বলতে হবে—তাতে আপনি নিতান্তই কুণ্ঠিত। নতুবা আমার মনে হয় 'শনিবারের 'চিঠি'র first Article আধুনিক সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে একমাত্র না হ'লেও—একটা বিশিষ্ট Contribution।[৬] আমার মত যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহ'লে বলব যে ঐ সকল articles এর মতবাদ সম্পূর্ণ গ্রাহ্য না হ'লেও, সাহিত্যবিচারে ঐ রূপ নীতি অনুসরণযোগ্য—দৃষ্টি যত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হয় ততই ভালো, অবশ্য তার মূল্য নির্ভর করবে লেখকের বিদ্যাবুদ্ধি ও রসবোধের উপর।

আজ এই পর্য্যন্ত। 'বসুধারা' সম্বন্ধে যা বলেছি তাতে নিরুদ্যম হবার কোনো কারণ নেই। আপনার একটা আদর্শ আছে, সেই আদর্শ এবং কার্য্যক্ষেত্রে নানা বাধা বিঘ্ন, এই দুয়ের সামঞ্জস্য করে আপনাকে চলতে হচ্ছে, কাজেই আমার সমালোচনা ঠিক হ'তে পারে না। প্রত্যেকের নিজ আদর্শমত চলাই উচিত, তাতে মতভেদ হওয়াও ভালো।[৭] এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে সময় ও সুযোগ হলে আপনার সঙ্গে পত্রালাপ করব।

আশাকরি সপরিবারে কুশলে আছেন। আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। ইতি

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

পুঃ আপনার চিঠিতে যে ঠিকানা থাকে সেটা সংক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। ঐ রকম ঠিকানা লিখলে পৌঁছবে ত? এ বিষয়ে চিন্তা দূর করুন।

মোহিতলাল

২নং চিঠি (২৩।২।২৯-এ লিখিত)

॥ প্রাসঙ্গিক তথ্য ॥

১। বসুধারা: 'রসচক্রে'র মুখপত্র। 'রসচক্র' বিখ্যাত সাহিত্যিক সংস্থা, যার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন কবিশেখর কালিদাস রায় এবং রাধেশ রায়। সভাপতি ছিলেন প্রথমে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। এ সংস্থার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কুমুদচন্দ্র রায় চৌধুরী, বিশ্বপতি চৌধুরী, নৃটবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং নন্দগোপাল সেনগুপ্ত।

২। মোহিতলাল ছিলেন পাশ্চাত্ত্য সৃষ্টিধর্মী এবং সমালোচনামূলক সাহিত্যের মনোযোগী পাঠক। পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা সাহিত্যের গভীর অধ্যয়নের ফলে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের অন্তর্নিহিত দৈন্য তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা বিশেষ করে ইংরেজী সাহিত্য সমালোচনার সমুচ্চ আদর্শে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যকে গড়ে তুলবার জন্য একটা আন্তরিক তাগিদ তিনি অনুভব করছিলেন ঢাকায় অধ্যাপক জীবন শুরু করবার আগে থেকে। ঢাকায় অধ্যাপক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার পর এ দুরূহ কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন।

৩। ঢাকায় অধ্যাপক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই কলকাতায় সংগ্রামী জীবনে মোহিতলাল 'প্রবাসী'তে 'কাব্য কথা' নামে সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কীয় তাঁর সুচিন্তিত মতামতকে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেন। তারপরে 'শনিবারের চিঠি'তেও এ বিষয়ে মূল্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেন। এ সমস্ত আলোচনায় মোহিতলাল সাহিত্যবিচারকে প্রাচীন আলংকারিক পদ্ধতি কিংবা উচ্ছ্বাসপূর্ণ রসগ্রাহী আলোচনার প্রবণতা মুক্ত করে' বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণাত্মক (Analytic ও Synthetic) বিজ্ঞানসম্মত সাহিত্যবিচার পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পান। পরবর্তী কালে মোহিতলাল নিজেও এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আশ্রয়ে সমালোচনা কর্মে ব্রতী হয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সমালোচক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

৪। সাহিত্য জীবনের প্রারম্ভ থেকেই মোহিতলাল ছিলেন বহুপাঠী। ঢাকায় অধ্যাপক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর তাঁর অধ্যয়নের পরিধি আরও

বিস্তৃতি লাভ করে। সমকালীন য়ুরো-আমেরিকার উচ্চ মানের সমালোচনা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার পর বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের দৈন্য তাঁর মনে গভীর পীড়া দিতে থাকে। ফলে তাঁর অতিপ্রিয় কাব্যরচনা ত্যাগ করে' তিনি বাংলা সমালোচনার মান উন্নয়ন কর্মে তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। মোহিতলালের সাহিত্যিক জীবনের বিবর্তনের দলিল হিসাবে এ পত্রখানি উল্লেখযোগ্য।

৫। মোহিতলাল সাহিত্যকর্মে গতানুগতিক ভাবধারা একদম বরদাস্ত করতে পারতেন না। তিনি ছিলেন স্রষ্টার স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতি পরম শ্রদ্ধান্বিত, এবং সাহিত্যে মহাপুরুষ-পূজার প্রতি একান্তভাবে বীতশ্রদ্ধ। সমকালীন কবি সমাজে রবীন্দ্রনাথের অন্ধ অনুকরণ এবং রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনায় বিচারহীন ভক্তির যে অতিশয়িত উচ্ছ্বাস এ সময় পরিলক্ষিত হচ্ছিল মোহিতলাল এখানে তার প্রতি ইঙ্গিত করছেন। বাংলা সাহিত্যকে দুর্বলতা ও গ্লানিমুক্ত করবার উদ্দেশ্যে মোহিতলাল ক্রমশই সাহিত্যের ক্লাসিক আদর্শ সন্ধানে মনোযোগী হয়ে ওঠেন।

৬। এ সময়কার 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত যে প্রথম প্রবন্ধের কথা মোহিতলাল উল্লেখ করেছেন সে প্রবন্ধ সাধারণত তিনি নিজেই রচনা করতেন। সে প্রবন্ধগুলিতে চিন্তার স্বাতন্ত্র্য ও পরিণত বিচারবুদ্ধির পরিচয় থাকতো বলে' সেগুলি "চিঠি"র মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিল।

৭। মোহিতলাল নিজে যেমন সাহিত্য ভাবনায় স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মতের পক্ষপাতী ছিলেন তেমন অপরের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মতকে শ্রদ্ধা করতেন— এখানে তার প্রতি ইঙ্গিত।

(৩নং চিঠি)

38. Nilkhet Road
Ramna
Dacca. 22. 4. 1932

ভাই কালিদাস বাবু,

বহুদিন পরে আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইতে পারিলাম না। 'শনিবারের চিঠি' আপনাকে আক্রমণ করায় আপনি বড়ই দুঃখ পাইয়াছেন, পাইবারই কথা। কারণ, প্রথমতঃ আপনি নিরীহ, নির্দ্দোষ, দ্বিতীয়তঃ আপনি বন্ধুজন। আমিও লজ্জা পাই এই জন্য যে যদিও সজনীর মতিগতি এবং লেখনী চালনার উপর আমার কোনও কর্তৃত্ব নাই তথাপি সকলেই মনে করেন উহার পিছনে আমার প্ররোচনা আছে। কিন্তু এটা যে কত বড় ভুল, তাহা আমি

বলিলেও কি কেহ বুঝিবে ? আমার সঙ্গে 'চিঠি'র সম্পর্ক—মাসে মাসে কিছু লেখা পাঠানো, সজনী আর কোনও বিষয়ে আমার পরামর্শ লয় না, কিছু জানায় না ; শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন, সজনী আমাকে ক্বচিৎ কখনও পত্র লিখিয়া থাকে, তাহাও পোস্টকার্ডে দুই চারি ছত্র, তাহা লেখা পাঠাবার তাগাদা। এ ছাড়া, আমার সঙ্গে চিঠির সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। 'চিঠি'র পরিচালনা ও সম্পাদন প্রভৃতির ওপরে নজর রাখিবার কোনও সুযোগ আমি পাই না—সজনীও সে সম্বন্ধে অবহিত নয় ; অনেক বলিয়া, অনুযোগ ও ভৎর্সনা করিয়াও তাহার এই দায়িত্বহীন খামখেয়ালির আমি কোনও প্রতীকার করিতে পারি নাই ; উপস্থিত এমন হইয়াছে যে আমার সঙ্গে পত্র ব্যবহার আদৌ নাই। 'চিঠি'র প্রকাশ ও সম্পাদন কার্য্যে এমন একটা haphazard অনিয়ম—অবহেলা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সজনীর নিজের লেখা ও পরের লেখা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে এমন শৈথিল্য প্রকাশ পাইতেছে যে, আমি 'চিঠি'র সম্বন্ধে অতিশয় নিরাশ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছি ;—নিতান্ত মমতার বশে এখনও লেখা না পাঠাইয়া পারিতেছি না। গতবারে কেবলমাত্র প্রথম প্রবন্ধটিই কোনও রকমে লিখিয়াছিলাম ; এবারে এখনও কিছু লিখিতে মন সরিতেছে না। 'চিঠি'র সম্বন্ধে আমি যে নিজে কত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছি এবং উহার সম্পাদন রীতি যে আমার আদৌ মনোমত নয়—সে সম্বন্ধে আমার দায়িত্বও যে কত অল্প উহাই আপনাকে জানাইলাম। 'চিঠি'তে আমি লিখি বলিয়া তাহার সকল লেখা যে আমার মনোনীত বা আমার জ্ঞাতসারে সন্নিবেশিত হয় তাহা যেন কেহ না মনে করেন। প্রতি মাসের 'চিঠি'র লেখাগুলির সম্বন্ধে বাহিরের পাঠক মণ্ডলী যেমন পূর্ব্বাহ্নে কিছুই জানিতে পারেন না, আমার অবস্থাও তদ্রূপ।[১]

চৈত্র সংখ্যায় আপনার সম্বন্ধে যে কঠোর মন্তব্য আছে তাহার অর্থ আমিও ভালো বুঝি নাই, তাহাতে আমিও দুঃখিত হইয়াছি। কলিকাতার সাহিত্য-সমাজ সম্বন্ধে আমার আর কোনও ধারণা বা পরিচয় নাই ; অধিকাংশ পত্রিকার নাম জানি না, লেখকের ত কথাই নাই। গত চারি বৎসর যাবৎ আমি নির্ব্বাসনে আছি।[২] সজনীও এ সম্বন্ধে আমাকে কখনও ওয়াকিবহাল রাখিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই—আমার শত অনুরোধ সত্ত্বেও। 'পুষ্পপাত্র', 'অঞ্জলি' প্রভৃতি পত্রিকা আমি কখনও চক্ষেও দেখি নাই। সজনী তাহার নিজের অভিজ্ঞতা অনুসারে এই সব সাময়িক ও ব্যক্তিগত সাহিত্য সমস্যার মীমাংসা করে, সে সম্বন্ধে আমার কোনও মতামতের অপেক্ষা রাখে না ; কারণ, আমি সে সম্বন্ধে নিতান্তই অজ্ঞ। কাজেই 'চিঠি'তে সে যাহা লেখে তাহাই আমার

পক্ষে—News। বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হওয়া ছাড়া আমার আর কোনও গত্যন্তর থাকে না। বর্ত্তমান ব্যাপারটি সম্বন্ধে আমার অপরাধ এই যে আমি করুণাবাবুর কাব্যসম্বন্ধে 'উপাসনা'র সেই মন্তব্য পড়িয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম, এবং আমার স্বভাব অনুযায়ী তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।[৩] 'রসচক্র' যে তাহার পিছনে আছে, এমন সন্দেহ আমার ছিল; তার কারণ, "উপাসনা" ও 'রসচক্র' এই দু'য়ে মিলিয়া একটা Coterie গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল। বিশ্বাসের একটা কারণ এই যে, করুণাবাবুর সম্বন্ধে শ্রদ্ধার অভাব এবং কবিবিশেষের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধার কিছু কিছু প্রমাণ আমি 'উপাসনা'র বহুদিন হইতেই লক্ষ্য করিয়াছিলাম। করুণাবাবুর কবিতায় কোনও ভাব-চিন্তার গৌরব নাই, এমন কি তাঁহার ছন্দজ্ঞানও উত্তম নহে—এমন কথা বোধহয় আপনার কথায় ও লেখায় আমি আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। ইহা যে দোষের তাহা আমি মনে করি না—কাব্যসম্বন্ধে সকলের রুচি ও আদর্শ এক হইতে পারে না; আপনার মত কবি ও রসিকের যে একটা স্বতন্ত্র মত থাকিবে ইহাই সঙ্গত। কিন্তু যেখানে ব্যক্তি ছাড়িয়া একটা দল গড়িয়া ওঠে; সেখানে bonafide সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে। বিশেষ, করুণাবাবুর ছন্দজ্ঞান সম্বন্ধে ঐরূপ মন্তব্য আরও সন্দেহের কারণ হইয়া ওঠে। 'উপাসনা'র সঙ্গে আপনার বর্ত্তমান সম্বন্ধ যেমনই হৌক, উহা যে আপনার ও আপনার বন্ধুসাহিত্যিক গোষ্ঠীর মুখপত্র স্বরূপ বহুদিন যাবৎ সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবেন না। ঐ 'উপাসনা'য় কোনও কোনও কবিকে (বর্ত্তমানে যতীন্দ্র সেনগুপ্ত) আকাশপ্রদীপের মত ঊর্দ্ধে তুলিয়া অপর কোনও কোনও কবির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হইয়াছে। আমি নিজে যতীন্দ্র সেনগুপ্তের বা কিরণধনের কবিতা appreciate করি, তাহার প্রমাণ আমার বন্ধুমণ্ডলী দিবেন। আমার নিজের ব্যক্তিগত রুচির পক্ষপাত কবি ও কাব্য সম্বন্ধে আছে, কিন্তু তাই বলিয়া যাহার যেটুকু শক্তি তাহা কখনও অস্বীকার করি নাই। আমি করুণানিধানকে খুব বড় দরের কবি বলিয়া কখনও ঘোষণা করি নাই। কিন্তু কাব্য সম্বন্ধে আমার আদর্শ উচ্চ বলিয়া (যে আদর্শের অভিমানে আমি রবীন্দ্রনাথের প্রতিও অন্ধ ভক্তির বিরোধী) এবং বর্ত্তমানে সাহিত্যের দুর্গতি দেখিয়া, আমি Coterie মনোভাবের একান্ত বিরোধী। উহাতে আরও অনিষ্ট বাড়িবে। সমালোচনার ক্ষেত্রে আমি কঠিন অপক্ষপাতের সাধনা করিয়াছি। কাব্যের আদর্শ আরও বৃহৎ ও উদার হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া এবং আমাদের কাব্য-সাহিত্য এখনও

অতিশয় দীন ও অপরিপুষ্ট বলিয়া, আমি অত্যধিক রবীন্দ্র-প্রীতিও অনিষ্টকর বলিয়া মনে করি। অপক্ষপাত এবং আত্মরুচিনিরপেক্ষ সমালোচনা যতদিন না সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে ততদিন এ সাহিত্যের কল্যাণ নাই। আজ রবীন্দ্রনাথকে লইয়া সাহিত্যিক মহলে যে দশা-পাওয়ার দৃশ্য দেখিতেছি তাহাতে বিস্মিত না হইলেও শঙ্কিত হইয়াছি—এ যেন একটা ঘূর্ণীনাচ লাগিয়া গিয়াছে—এ যেন "শান্তিপুর ডুবুডুবু, নদে ভেসে যায়"—গৌর গৌর বলিয়া সকলে ভিমি খাইবার যোগাড়। এরা এক রবীন্দ্রনাথকে পাইয়া মনে করিতেছে—বিশ্বের কাব্য সম্পদও তুচ্ছ, ইহারা সর্ব্বযুগ ও সর্ব্বভাষার কাব্য-সাহিত্যকে যেন হারাইয়া দিয়াছে। এ যে কি লজ্জা, কি পরিহাসের ব্যাপার তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিতেছে?[৩] আমাদের বাঙ্গালীসুলভ গ্রাম্য মনোবৃত্তিই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে—অপর সকল দেশে (ইউরোপে) সাহিত্যের আদর্শ যে কত বড় এবং সমালোচনা যে কি গভীর তাহা মনে করিলে এবং তাহার সহিত এই কূপমণ্ডূক সমাজের আত্মপ্রসাদের উল্লাস তুলনা করিলে বড়ই লজ্জা পাই। যেখানে অন্ধভক্তি আছে সেখানেই গুরুর চেলাদের রাজত্ব; তাই ছোট যাহারা তাহাদের পরস্পরের প্রতি এত ঈর্ষ্যা—এত দলাদলি। যাক্—যাহা বলিতে-ছিলাম। করুণানিধানকে লইয়া যে বিবাদ এখনও চলিয়াছে এবং তাহাতে আপনাকে টানিয়া আনিয়া যেরূপ লাঞ্ছনা করিতেছে তাহা আমার একান্তই অনভিপ্রেত জানিবেন। আপনি যে অতি নিরীহ শান্ত প্রকৃতির লোক—আপনার যে কোনও অভিমান নাই, আপনি যে সত্যই নির্ব্বিরোধ তাহা আমি জানি—বিশ্বাস করি। আপনার যদি কোনও দোষ থাকে তবে তাহা এই সর্ব্বজনে সমান প্রীতি। আপনি যে আঘাত পাইবেন—এবং সে আঘাত যে কত বেশী তাহা বুঝিতে পারি। আপনার পত্র পড়িয়া আমি সত্যই বড় দুঃখ পাইয়াছি। সজনীর সঙ্গে উপস্থিত আমার পত্রালাপ নাই—সুযোগ হইলেই তাহাকে আমি বিশেষ করিয়া বলিয়া দিব। আপনার মত বন্ধুজন-কে যে এমন করিয়া নিগৃহীত করে তাহাতে তাহার শুধুই হৃদয়হীনতা নয়—বুদ্ধিহীনতা প্রকাশ পাইয়াছে।[৫] তার দিগবিদিক জ্ঞান নাই—যখন যাহা খেয়াল হয় তখন তাহাই লেখে, শেষে ভুল বুঝিতে পারিলে হতভম্ব হইয়া থাকে। তার চরিত্র বড়ই বিচিত্র—অথবা 'চরিত্র' বলিয়া কোনও বস্তুই যেন তাহার প্রকৃতির মধ্যে নাই। এত যে গালি দেয়, তবু তার মনে কোনও তিক্ততা নাই—ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। আপনি তাহাকেও কিছু বলিতে পারেন না? আমিও বলিব।[৬]

আমার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা আদৌ ভাল নয়; দিন দিন যেন মরিয়া যাইতেছি, মনে হয় আয়ুঃ শেষ হইয়া আসিতেছে। কবিতা বিরহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন এজন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমার সম্বন্ধে আপনাদের একটা ভুল ধারণা আছে। আমার শারীরিক অবস্থা ও যেমন খারাপ—সাংসারিক অবস্থা তাহার তুলনায় একটু ভালো নয়, দারিদ্র্য বা অস্বচ্ছলতা পূর্ব্ববৎ আছে; কেবল পরিশ্রম পূর্ব্বের তুলনায় কম। কাজেই—'ন মানিনী সংসহতেঽন্য সঙ্গমং'—এই ইঙ্গিত আমার সম্বন্ধে খাটেনা। আমার অবস্থা আরও শোচনীয় জানিবেন। অর্থাভাবের জন্যই আমি ছুটিতেও কোনওখানে যাইতে পারি না; চিরনির্ব্বাসনে জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। স্বাস্থ্যও একেবারে ভঙ্গ হইয়াছে। এই শেষ বয়সে সংসারভারাক্রান্ত হইয়া এবং ক্রমাগত একটির পর একটি শিশুর আগমনে আমি আরও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। উপস্থিত দুই কন্যা ও চারি পুত্র—পুত্রগুলি সকলেই শিশু। কন্যা বড়টির বয়স এগারো, ছোটটির ছয়। তার পরেই পর পর চারিটি পুত্র। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ একটা সমস্যা হইয়াই আছে; তার উপর হঠাৎ মৃত্যু হইলে কি হইবে সেই ভাবনায় আকুল হইয়াছি। অতএব আমার সম্বন্ধে আপনারা বন্ধুজন যাহা মনে করিয়া সুখী হ'ন, তাহাও সত্য নহে। আমার জীবনে আর কোনও সুখ নাই। বাঁচিয়া আছি মাত্র—মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। উপস্থিত কেবল অন্নকষ্টই দূর হইয়াছে—আর কোনও সুখ নাই ভাই! আমার প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন লউন।

আপনার
মোহিতলাল

॥ প্রাসঙ্গিক তথ্য ॥

৩নং চিঠি (২২।৪।১৯৩২-এ লিখিত)

১। 'শনিবারের চিঠি এবং সজনীকান্ত দাস-এর সঙ্গে মোহিতলালের সম্পর্কের বিস্তৃত বিবরণ-এর জন্য দ্রষ্টব্য মোহিতলাল লিখিত 'শনিবারের চিঠি ও আমি' নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ। এ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধটি আজাহারুদ্দীন খান কর্তৃক সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হয় 'বিংশ শতাব্দী নামক সাহিত্য মাসিকের চতুর্থ বর্ষের শারদীয়া সংখ্যায়।

২। সাহিত্যে ক্লাসিক আদর্শের উপাসক' হলেও সমকালীন সাহিত্যের উত্থান-পতনের প্রতি মোহিতলালের দৃষ্টি ছিল সতর্ক এবং মনোযোগ ছিল সদা-জাগ্রত। সমকালীন জীবন্ত সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

CENTRAL LIBRARY

ঢাকায় প্রবাস সাহিত্যকর্মী মোহিতলালের নিকট নির্বাসনের সামিল। অনেক সময় মোহিতলাল আমার নিকটও এ 'নির্বাসন'-জনিত মানসিক বিক্ষোভ প্রকাশ করতেন। লঘুসুরে তাঁকে বলতে শুনেছি, ঢাকায় বাসকালে তাঁর কলম চলতে চায় না, অথচ কলকাতায় গেলে কলম রেসের ঘোড়ার মত দৌড়াতে থাকে।

৩। 'উপাসনা' সাহিত্য মাসিকপত্র। সম্পাদক ছিলেন কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। এ সাহিত্যপত্রে ১৯৩১-৩২ সনে সুসাহিত্যিক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত সুকবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শতনরী'র সমালোচনা করেন। সে সমালোচনায় করুণানিধানের কাব্যরীতি সম্পর্কে কিছু বিরূপ মন্তব্য ছিল। সে মন্তব্য করুণানিধানের কাব্য প্রতিভার প্রতি সশ্রদ্ধ মোহিতলালের অন্তরে বিক্ষোভ সঞ্চার করে, এবং তীব্র ভাষায় তিনি সে সমালোচনার প্রতিবাদ করেন।

৪। সমালোচক হিসেবে মোহিতলাল কবি-সমালোচক ম্যাথু আর্ণল্ডের নিরাসক্ত সমালোচনার আদর্শ দ্বারা ('disinterested endeavour to learn and propagate the best') বিশেষ ভাবে প্রভাবিত ছিলেন। ঢাকায় অধ্যাপক জীবনে স্থিতিলাভ করবার পর সে আদর্শ তাঁর বিচারশীল মনের ওপর আরও গভীরমূল প্রভাব বিস্তার করে। কবিশেখর কালিদাস রায়ের নিকট এ চিঠি লিখিত হবার তিন বৎসর পরে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন মোহিত-লালের ছাত্র হই তখন তিনি সমালোচনার এ আদর্শ-প্রেরণার কথা সজোরে আমার মনে সংক্রামিত করবার চেষ্টা করতেন।

৫। কবিশেখরের স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব ও কবি-প্রতিভার প্রতি মোহিতলাল কত সশ্রদ্ধ ছিলেন 'শনিবারের চিঠি'র আলোচ্য নির্মম সমালোচনায় তাঁর মর্মপীড়া তার প্রমাণ।

৬। একনিষ্ঠ ও আন্তরিক কোন সাহিত্যসেবকের প্রতি 'শনিবারের চিঠি'র তথা সজনীকান্ত দাস-এর আক্রমনাত্মক উল্লাসে মোহিতলাল তাঁর পরম প্রীতিভাজন সজনীকান্তের প্রতি ক্রমশই বিরূপ হয়ে ওঠেন। অবশেষে 'শনিবারের চিঠি'র একটি বিশেষ সংখ্যাকে উপলক্ষ করে সজনীকান্তের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ স্থায়ী রূপ লাভ করে। এ সম্পর্কে পরবর্তী চিঠির পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৪নং চিঠি) Bagnan p.o.
16. 1. 46

সুহৃদ্বরেষু,

সেদিন আপনার ওখানে নন্দীভৃঙ্গীসহ অনেক উৎপাত করিয়া আসিয়াছি—পরে শ্রীমান রাধেশের গৃহে আমার প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া দিয়া অনেককে চমকিত ও ত্রস্ত এবং হয়ত' উদ্বেজিত করিয়াছি। আমার সান্নিধ্য "ষড়েতে ঐতরঃ"—মধ্যে একটি ; একে প্রকৃতির মধ্যেই একটা উৎকেন্দ্রিক বাষ্পবেগ আছে, তার উপর, তথাকথিত সামাজিক 'ভদ্রতা' ও 'ভব্যতা' আর ভাল লাগে না—কখনও লাগিত না, এখন blood pressure বাড়াইয়া দেয়। আমি আজীবন একটি কক্ষভ্রষ্ট কুগ্রহ রূপে বাংলার শিক্ষিত-সজ্জনগণের বিরাগ ও ভীতিস্থল হইয়া রহিলাম, তার উপর সাহিত্যিক—আত্মপ্রচার ও ব্যবসায়—দুই-ই আমাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলে। তাই সেদিন, করুণানিধানকে একটু দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল—বাউল বা পাগল যে দেশে আর নাই ! আমি সেই চিরশিশুটিকে আবার দেখিলাম—কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, কেবল ইহাই মনে হইল যে এইবার ভগবান সস্নেহে তাঁহার বুকে মাথায় হাত বুলাইয়া ঘুম পাড়াইয়া দিবেন। আর আমার কি হইল ? আমি বিস্ফোরকের মত কোন দিন ফাটিয়া যাইব। যদি করুণানিধানের মত হইতাম ! যদি মস্তিষ্কে এত অধিক তৈল সঞ্চয় না হইত, সজ্ঞানতার এই মশাল তাহাতে অনুক্ষণ না জ্বলিত ![১] —আপনি বেশ আছেন ! সংসার, সমাজ, কাব্য, কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই—বাহাদুর আপনি ! সেদিন 'রবিবাসর' কেমন জমিয়াছিল ? পরস্পরের পৃষ্ঠকণ্ডুয়ন কেমন হইয়াছিল ? শ্রী-লাঞ্ছন রসিক দিগ্‌গজ উপস্থিত ছিলেন ? পাড়ায় যে বন্যবরাহের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য কেহ করিলেন কি ?[২]

আমার সঙ্গে যে দুইটি অনুচর ছিল, তাহাদের একটি যে তারাচরণ আপনি জানেন [৩], অপরটি অপরিচিত। ইহাদের সম্বন্ধে ইহাই মনে রাখিবেন—আমার মত ব্যক্তিও তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছে। এ আকর্ষণ সুখকর নয়, অতিশয় কষ্টকর। আমি ইহাদিগকে মিষ্টকথা বলিনা, বরং অতিশয় দুষ্টকথা বলিয়া থাকি, তত্রাপি ইহারা আমার সেবায় নিরস্ত হয় না। তারাচরণকে আপনি স্নেহ করেন, কিন্তু পাগল বলিয়া তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হন, সে পাগলই বটে, এমন পাগল যদি আজিকার যুবক সমাজে আরও অধিক সংখ্যায় বাড়িয়া যাইত ! আপনি সম্ভবত তাহার ভিতরের দিকটি দেখেন নাই—আমিও তাহার সাংসারিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কম শঙ্কিত নই ; কিন্তু এ সব জীবন পূজার ফুলের

মতই উৎসর্গীকৃত, দুঃখ করিয়া কি হইবে ? অপরটির সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে এই খানেই—দুই বৎসরের পরিচয়—সত্য ও সুন্দরের প্রতি যে জন্মগত নিষ্ঠা—জন্মান্তরীণ বলাও যাইতে পারে—উহার মধ্যে তাহা আছে ; অবস্থার প্রতিকূলতায় হয়ত' তাহা ফুটিয়া উঠিতে পারিবেনা, কিন্তু প্রবীণ বৈদ্যের মত আমি উহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়াছি, অনেক পরীক্ষাও করিয়াছি। তাহাতে খুশী হইয়াছি। কিন্তু উহাদের সব চেয়ে প্রশংসার কথা এই যে আমার মত দুর্জ্জনের সেবায় ক্লান্তি বোধ করেনা—কোন পুরস্কার, কোন লাভ নাই—যে লাভকে বাজারের হিসাবে কষিয়া লওয়া যায়।

সেদিন আপনার সঙ্গে সারাদিন কাটানোর পর আমি রাত্রে ভূমীনের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলাম ; আরেকটি অতিশয়—সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ, সম্পূর্ণ ভিন্নস্তরের, অপূর্ব্ব তাহার চরিত্র ! ইহারা কেহই normal নয়, এই জন্যই বোধহয় ইহাদিগকে আমার এত ভাল লাগে। যাক্, ভূমীন অত্যন্ত Shy—তার আত্মসম্মান বোধ অতিশয় প্রখর—খুব বনেদীঘরের ছেলে বলিয়াই তাহার স্বভাবে বিনয় এবং আত্মসচেতনতা দুইই সমান মাত্রায় আছে। সে অতিশয় "বিবিক্ত সেবী"—কোথাও যায় না ; আমাকে সে ভক্তি করে সম্পূর্ণ নিজের দিক দিয়া। এই ছেলেটির সঙ্গে আরও পরিচয় হইলে আপনি নিশ্চয় সুখী হইবেন। সেদিন বেলা ৫টা পর্য্যন্ত ভূমীনের ঘরে ছিলাম—খুব অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম, সে আমাকে সকালে যাইতে দেয় নাই—মায়ের মত সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিল। কলিকাতায় গেলে, কেবল উহার ঘরে, অথবা আমার এক বালাবন্ধুর গৃহে আমি রাত্রিবাস করি—অনেক আত্মীয় ও বন্ধু আছেন, আমি আর কোথাও যাইনা। কেন—তাহা আপনি বুঝিতে পারিবেন।

এখন দুই একটা কাজের কথা বলি। করুণানিধানের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে যে কবিতাটি লিখিয়াছি তাহা শীঘ্র কোথাও মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক ; আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল, এখন দেখিতেছি তাহা সফল হইবেনা ; আমার নিজের কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু ঐ সম্বর্দ্ধনার গৌরব বৃদ্ধির জন্য উহার প্রচার কর্ত্তব্য। আমি সাহিত্য সমাজের কেহ নই—সাময়িক সাহিত্যের আসরে যে-টুকু কর্ত্তৃত্ব ছিল তাহা হারাইয়াছি—"শিক্ষিত সমাজের" বরণীয় এবং বহুল প্রচারযুক্ত যে পত্রিকাকে আমি বাহন করিয়াছিলাম এবং যার জন্য অন্যত্র কাহারও সহিত সম্বন্ধ মাত্র ছিলনা, সেই পত্রিকা হইতে আমি বহিষ্কৃত হইয়াছি, তাহা জানেন[৪], আর কোন পত্রিকায় এখনও স্থান সংগ্রহ করিতে পারি নাই—আমার মত ব্যক্তির পক্ষে তাহা সহজও নয়, এখন এইরূপ একটি

দায়ে পড়িয়া বড়ই নিরুপায় বোধ করিতেছি। যেখানে সেখানে—ঐ কবিতা প্রকাশিত হইলে চলিবে না; অন্ততঃ এমন পত্রিকায় হওয়া চাই, যাহার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা দুইই আছে। আপনি এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য এবং আপনার সাধ্য, তাহা শীঘ্র করিবেন।

আগামী রবিবার সকালে দশটার পর আমার রেডিও-কর্ম্ম আছে। এবার আপনার কবিতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 'কথা' এবং কিঞ্চিৎ আবৃত্তি—১৫ মিনিটের মধ্যে, যতটুকু হয়, তাহাই আমার প্রোগ্রাম। ৩।৪টি কবিতা তাহাও সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠ করিব স্থির করিয়াছি। তাহাতে আপনার রচনার সকল দিক দেখানো যাইবে না—কেবল কবিত্বের পরিচয় দেওয়া যাইবে। আপনার সব বইগুলিই আছে—আপনি নূতন করিয়া আরও কয়খানি দিয়াছেন। কিন্তু "ব্রজবেণু" নাই। তাহাতে উপস্থিত কোন অসুবিধা হইবে না। কুমুদরঞ্জনের মত, আপনার কবিতারও একটি রীতিমত critical সংকলন হওয়া বড়ই আবশ্যক, আমার মত নির্ম্মম ব্যক্তি ছাড়া আর কেহ তাহা পারিবে না; কিন্তু আপনাদের মত অতিশয় স্পর্শকাতর কবি সেরূপ অস্ত্রোপচারের যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিবেন কি? আমি আপনার 'বৈকালী' কাব্যখানি আবার পড়িলাম—উহাকে রীতিমত ঝাড়িয়া আছড়াইয়া যে কাব্যশস্য উদ্ধার করিয়াছি তাহা আপনার মনঃপূত হইবে না, কিন্তু তাহাতেই আপনার কবিতার শ্রী সকলের দৃষ্টিগোচর হইবে—রসিক সমাজে আপনার কাব্যলক্ষ্মীর অবগুণ্ঠন মোচন হইবে। কবিরা—আপনাদের মত কবিরা, নিজেরাই নিজের শত্রু, অথচ অভিমান ও অভিযোগের অন্ত নাই। এই কয়দিনে শুধু আপনার কবিতায় নয়—আপনার কথাবার্ত্তা এবং আপনার অন্যান্য লেখা প্রভৃতি হইতে আপনার কবি জীবনের পরিচয়টি খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়াছি; আপনার পক্ষে কি ছিল-কি হইতে পারিত এবং কতখানি কি কারণে নষ্ট হইয়াছে—আপনার কবি জীবনের সেই tragedy আমি উত্তমরূপে জানিয়াছি—Psycho-analysis-এর মত বিশ্লেষণ করিয়া নিঃসংশয় হইয়াছি। আপনার কবি-প্রতিভা অল্প ছিল না, কিন্তু কর্মদোষে বা ভাগ্যদোষে তাহা নষ্ট হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই; যাহা লইয়া জন্মিয়াছিলেন, তাহা আপনি রক্ষা করিতে পারেন নাই; ইহাই পরিতাপের বিষয়; নতুবা আপনার প্রতিভা—বিশিষ্ট প্রতিভাই বটে; সেই শক্তি শেষ পর্য্যন্ত আপনার মধ্যে রুদ্ধশ্বাস হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে; বিধাতা আপনাকে একটি শক্তিই দিয়াছিলেন, সে শক্তি আপনার জীবনে পর্য্যন্ত হইয়াছে—'করম বিপাকে' আপনি আত্মহত্যা করিয়াছেন;

আক্ষেপ অভিমান বৃথা ; এ সম্বন্ধে সাক্ষাতে সবিস্তারে বলিব, অথবা যদি অবসর পাই, পত্রে আলোচনা করিব। এখন একটি সুবুদ্ধির কাজ করিবেন কি ? আপনার কবিতার একটি যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত সংকলন আমাকে করিতে দিবেন কি ? আমার নিজের শ্রাদ্ধ কে করে তার ঠিক নাই—আমি যত প্রাচীন ও নবীনের উদ্ধার ব্রতে যেন বদ্ধ হইয়া রহিলাম ! তবু কেহই আমাকে একটা ধন্যবাদ ও দিবে না।

আজ এই পর্য্যন্ত। আবার কবে দেখা হইবে জানি না। করুণা-সম্বন্ধীয় কবিতাটির একটা ভাল ব্যবস্থা শীঘ্র করিবেন। আশাকরি সপরিবারে কুশলে আছেন। আমার ভালবাসা জানিবেন। ইতি

আপনার
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

প্রাসঙ্গিক তথ্য

৪নং চিঠি (১৬/১/৪৬ তারিখে বাগনান থেকে লিখিত)

১। মোহিতলাল সাহিত্যকর্মে আত্যন্তিক বুদ্ধিচর্চার (Intellect) প্রকাশের চাইতে প্রাণের সহজ অভিব্যক্তিকে অধিকতর মূল্য দিতেন। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের মুখপত্র 'বাসন্তিকা'য় প্রকাশিত মোহিতলালের 'সাহিত্যের শিরঃপীড়া' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২। সম্ভবত ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিজের প্রতি ইঙ্গিত।

৩। অধ্যাপক তারাচরণ বসু। ইনি মোহিতলালের কবিপ্রতিভার প্রতি ছিলেন পরম শ্রদ্ধান্বিত। ছায়ার মত তিনি মোহিতলালের অনুগমন করতেন। ইনি সুপণ্ডিত ছিলেন। মোহিতলালের 'স্মরগরলে'র ব্যাখ্যা এঁর বৈদগ্ধ্যের পরিচায়ক। এঁর সরলতা ও আন্তরিকতার প্রতি মোহিতলাল ছিলেন পরম স্নেহপরায়ণ এবং পাণ্ডিত্যের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত। আজাহারুদ্দীন খান সংকলিত এবং ডক্টর ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত 'মোহিতলালের পত্রগুচ্ছে' এঁর নিকট লিখিত মোহিতলালের কতগুলি মূল্যবান পত্র সংকলিত হয়েছে। অকালে ইনি পরলোক গমন করেন।

৪। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পর্ক ত্যাগের প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 'বহিষ্কৃত হইয়াছি'—এটা মোহিতলালের অভিমানের কথা। আসলে মোহিতলাল একটা ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক

ছিন্ন করেন। ঘটনাটা এই। ১৯৩১ সনে দেশব্যাপী যখন রবীন্দ্র জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়, তখন 'শনিবারের চিঠি' একটি বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যা প্রকাশ করে। সে সংখ্যায় শুধু রবীন্দ্রনাথকে নয়, রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকেও বিকৃত তথ্যের সাহায্যে কুৎসিতভাবে আক্রমণ করা হয়। সাহিত্যিক আদর্শের দিক থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে মোহিতলাল রবীন্দ্র-বিরোধিতা করলেও রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রতিভার প্রতি তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ শ্রদ্ধাপরায়ণ। সার্বভৌম কবি এবং তাঁর পিতৃদেবকে কুৎসিত আক্রমণ করে বিকৃত রুচির পরিচয় দেওয়ায় মোহিতলাল এত ক্ষুব্ধ ও আহত হন যে তিনি তাঁর অতি-প্রিয় সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে শেষবারের জন্য সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন। এই প্রিয়সম্পর্ক ত্যাগ তাঁর অন্তরে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল তার ইঙ্গিত রয়েছে এই মন্তব্যে।

৫। কবিবন্ধু কালিদাস রায়ের কবি-প্রতিভার বিশিষ্টতা সম্পর্কে মোহিতলাল নিঃসংশয় ছিলেন। তবে অনুকূল পরিবেশের অভাবে সে প্রতিভার প্রত্যাশিত বিকাশ হয়নি বলেই মোহিতলালের ধারণা জন্মেছিল। কবিবন্ধুর কাব্যের প্রকৃত মূল্যায়ন করবার ইচ্ছা মোহিতলালের ছিল। সময় সুযোগের অভাবে বোধ হয় সেটি আর ঘটে ওঠেনি।

পরিমল গোস্বামী স্মরণে

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

ফরিদপুর জেলার একটি গণ্ডগ্রাম রতনদিয়া। কিন্তু একালের দুই জন বিশিষ্ট ব্যক্তির স্মৃতি এই গ্রামের সঙ্গে বিজড়িত। একজন, মানময়ী গার্লস্ স্কুলের লেখক রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। অপরজন সদ্য পরলোকগত পরিমল গোস্বামী। একজনকে আমি দেখিনি। অপর জনকে দেখেছি বললে কম বলা হবে। দীর্ঘকাল তাঁকে জানবার সুযোগ আমার হয়েছিল। আমরা একই গ্রামের এবং মোটামুটি একই কালের মানুষ। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, পরিমল গোস্বামী আমার বাবার আবাল্য সুহৃদ ছিলেন। এই সৌহার্দ্য দুইটি পরিবারের শাখা প্রশাখায় বিস্তার লাভ করেছিল। পরিমলবাবুর বোন,

আমাদের সরলা পিসিমা, আমার পিসিমার সখী ছিলেন। তাঁর ছোট বোন মঞ্জু (পরে সরোজ আচার্যের স্ত্রী) আমার সঙ্গে এক শ্রেণীতে (এক স্কুলে নয়) পড়তেন। শীতের সকালে আমরা তাঁদের বারান্দায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে' তাঁর দাদা, আমার লহরীকাকার কাছে, নতুন এ্যালজেবরা শিখেছি। পরিমল-বাবুর বড় ছেলে শতদল, আমার চেয়ে এক বছরের ছোট। আমরা বাল্য-বন্ধু। ছোট ছেলে হিমানীশ, স্কুলে আমার ভাইয়ের সঙ্গে পড়ত। দুই মেয়ে, লিলি আর দীপু। সেদিন সকালে নিমতলায় দেখা হল। কথায় কথায় লিলি বলল, আপনি এক সময় আমাদের খুব স্নেহ করতেন মেজদা।

পরিমল গোস্বামীর পিতা, বিহারীলাল যতদিন জীবিত ছিলেন, তত দিন পরিমলবাবুর স্ত্রী, আমাদের কাকিমা, ছেলেমেয়েদের নিয়ে গ্রামের বাড়িতে থাকতেন। তাঁদের সঙ্গে যতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল, প্রায় আজীবন কলকাতাবাসী পরিমলবাবুর সঙ্গে, ততটা ছিল না। তিনি বছরে এক আধবার বাড়ি আসতেন, প্রায়ই পূজোর সময়। পাঁচ-সাত দিন থাকতেন। আবার কলকাতায় ফিরে যেতেন। তিনি যে কয়দিন গ্রামে থাকতেন গ্রামটি যেন একটি নূতন আভিজাত্য লাভ করত। আমরা দূর থেকে সেই দৃশ্য দেখতাম।

গ্রামে, আমি তাঁর খুব নিকট সাহচর্যে এসেছি, মনে হয় না। বরং পিতৃবন্ধু হিসেবে তিনি যখন একা কিংবা অপরবন্ধু বনফুলের সঙ্গে বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন সময়ে আমাদের বাসায় এসেছেন, থেকেছেন, তখন তিনি আমাদের অনেক কাছে এসেছেন। আমাদের লেখার খাতায় একের পর এক পেনসিল স্কেচ করে তিনি প্রথম আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করেন। তখনই শুনেছিলাম, তিনি কিছুকাল আর্ট স্কুলে শিক্ষালাভ করেছিলেন। পরবর্তী-কালে ফোটোগ্রাফিতে তাঁর বিরল কৃতিত্বের সূচনা, মনে হয়, এই ভাবেই হয়েছিল। আমরা তাঁকে লেখক হিসেবে জানবার আগে উত্তম ফোটো-গ্রাফার হিসেবে জেনেছিলাম। আমাদের বাড়ির বিবর্ণ দেওয়ালে এই শিল্পে তাঁর স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানসমূহ এখনও নিশ্চিহ্ন হয়নি। এই শিল্পকে তিনি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কাজে লাগাতেও চেয়েছিলেন। একদা ৭২ হ্যারিসন রোড-এ তাঁর একটি স্টুডিও ছিল। ১৯২৮ এ, যখন কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তখন আমাদের পরিবারের কয়েকজন সেই ঠিকানায় দিন কয়েক অতিথি হয়েছিলাম। ফোটোগ্রাফি ভিন্ন আরও একটি বিদ্যা তিনি সে সময় আয়ত্ত করেছিলেন। সে টি সর্ট হ্যাণ্ড। আমাদের বাল্যবয়সের

খাতাগুলিতে তার চিহ্নও ইতস্তত ছড়ানো ছিল।

সেই স্টুডিও কবে কী ভাবে উঠে গেল জানিনা। তবে এটুকু জানি কোনও কিছুতেই দমে যাবার মানুষ তিনি ছিলেন না। কিছুদিন পরে তিনি ফরিদপুরের লালমিঞা এবং রাজবাড়ির জমিদারপুত্র সৌরীন্দ্র গুহর সঙ্গে নতুন একটি ইনসিওরেন্স কোমপানি চালু করেন। যতদূর মনে পড়ে, এর নাম ছিল আর্য ইনসিওরান্স।

পরিমল গোস্বামীর কর্ম জীবনের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল তা থেকে মনে হয় তিনি ঠাকুর বাড়ির আদি ঘরাণার মানুষ ছিলেন, এবং দীর্ঘদিন সাহিত্য তাঁর জীবনের অনিবার্য বিষয় ছিলনা। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সম্প্রীতি, তিনি পৈত্রিকসূত্রে লাভ করেছিলেন। পিতা বিহারীলালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্র বিনিময় হত। পরিমলবাবু কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনে তাঁর নিত্য যাতায়াত ছিল। সেখানকার অনেক অনুষ্ঠানের স্মৃতি, তাঁর বিভিন্ন রচনায় ছড়িয়ে আছে।

ব্যক্তিগতাবে যিনি রবীন্দ্র সংস্কৃতির এত নিকটে ছিলেন, সেই তিনি তাঁর লেখায় চিরকাল রোমান্টিকতা থেকে দূরে থেকে গেলেন। এ থেকে তাঁর মানসিক গঠনের আভাস পাওয়া যায়। তাঁর মন ছিল প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিকের। ফোটোগ্রাফি বিষয়ক দুখানি বই এবং বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন রচনায় তার বিশেষ পরিচয় পাই।

তাঁর মৃত্যুর পর সংবাদ পত্রে দেখেছি, তিনি ৩৫টি বইয়ের লেখক ছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই 'বুদবুদ'। এটি একটি গল্প-গ্রন্থ। একাধিক কারণে বইটির নামকরণ আমার কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। প্রথমত, এই নাম সাহিত্যে তাঁর সীমাবদ্ধ উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্যোতক। দ্বিতীয়ত, তাঁর সব রচনাই বুদবুদের মত মৃদু। কী ব্যঙ্গ রচনায়, কী বিদ্রূপ বর্ষণে, তিনি যদি বা শানিত; কখনও উচ্চকণ্ঠ নন। ছোটবেলায় যখন তাঁকে দেখেছি, আচারে আচরণে তখন তাঁকে ব্রাহ্ম মনে হত। এখন মনে হয় তাঁর সমগ্র রচনায় এই চরিত্র-লক্ষণ বিধৃত।

সারাজীবন পরিমলবাবু কত রকমের কাজ করেছেন। তাঁকে বুঝতে গেলে যেমন এ কথা মনে রাখা উচিত, তেমনি অন্যদিকে তিনি যা করতে পারতেন, অথচ করেন নি, সেকথাও ভোলা উচিত নয়। প্রতিষ্ঠিত লেখক, নিজে দীর্ঘকাল সম্পাদক, অথচ এই উপন্যাস প্লাবিত দেশে তিনি একটিও উপন্যাস লেখেন নি। দুই খণ্ড 'স্মৃতি চিত্রণে,' 'যখন সম্পাদক ছিলাম';

'যাঁদের দেখেছি', 'পত্রস্মৃতি' ইত্যাদি গ্রন্থে তিনি অকৃপণ ভাবে অন্যের আলেখ্য এঁকেছেন অথচ আত্মজীবনী রচনা করেন নি। আজ সাংবাদিক মাত্রই যখন বহুদেশদর্শী, তখন কুড়ি বছর সাংবাদিক থাকা সত্ত্বেও, তিনি নিজের ছেলেকে ইউরোপে পাঠিয়েছেন, অথচ নিজে ভারতের বাইরে কোথাও যান নি। তাঁর চরিত্রের এই সহজ প্রতিরোধ ক্ষমতা একদিকে যেমন তাঁর মানসিক আভিজাত্যের রক্ষক হয়েছিল তেমনি অপরদিকে তাঁর চির-ভগ্ন শরীরের অভ্যন্তরে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করেছিল। না হলে সামান্য স্বাস্থ্যে, সামান্যতর আহারে, শুধুমাত্র ওষুধের দাক্ষিণ্যে প্রায় আশি বছরের সক্রিয় জীবন যাপনের দৃষ্টান্ত তিনি রেখে যেতে পারতেন না।

বাংলা বানানে শৃঙ্খলা

নীলরতন সেন

প্রসঙ্গটি পুরাতন এবং বহু আলোচিত। তবু পুনরালোচনার এবং আশু কার্যকরী কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

মৌখিক এবং লিখিত দুটিরূপ রয়েছে এমন সব ভাষার ক্ষেত্রেই প্রশ্ন ওঠে, এদের লিপিরূপ এবং উচ্চারণের মধ্যে কতটা সামঞ্জস্য থাকে? বোধহয় লিপি-সমন্বিত সব ভাষাতেই প্রথম দিকে উচ্চারণে ও বানানে যোগ ঘনিষ্ঠ থাকে। ক্রম পরিবর্তনশীল উচ্চারণের প্রভাবে ধীরে ধীরে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান বাড়তে থাকে। তখন মাঝে মাঝে বানান সরলীকরণের প্রয়োজন দেখা দেয়। ইংলণ্ডের পুরানো এবং আধুনিক ইংরেজি বানানের পার্থক্য, বা ইংলণ্ডের ও আমেরিকার আধুনিক ইংরেজি বানানে পার্থক্যের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে। তুরস্ক বা চীনে যে ভাষার বানান ও লিপিতে বৈপ্লবিক আমূল পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে সে-প্রসঙ্গ এখানে টানছি না।

ভারতীয় ভাষাগুলিতেও বার বার এমন সরলীকরণ ঘটেছে। বৈদিক যুগের এবং মধ্যযুগের সংস্কৃত ভাষার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।—সংস্কৃত-জাত পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ এবং আধুনিক আর্যভাষাগুলির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনধারা লক্ষ করা যেতে পারে। সংস্কৃতের তুলনায় পালি প্রাকৃত অপভ্রংশের বানানে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছিল।

নবজাত বাংলায় যে সরলতর বানান প্রচলিত হয়েছিল তার কিছু নমুনা চর্যাগীতে রয়েছে। পঞ্চদশ শতক থেকে সে ভাষা আবার সংস্কৃতের সংস্পর্শে এসে অনেকটা জটিল হয়ে উঠেছিল তারও নমুনা চৈতন্যচরিতামৃতে, কৃত্তিবাসী রামায়ণে, কাশীদাসী মহাভারতে বা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে মিলছে। পাশাপাশি লৌকিক মঙ্গলকাব্যগুলিতে, গীতিকা ও কবিগান জাতীয় রচনায় শিথিল, সরলতর বানানের অজস্র নমুনা ছড়িয়ে আছে। অষ্টাদশ শতকের সর্বাপেক্ষা প্রতিভাবান সংস্কৃতজ্ঞ আলঙ্কারিক কবি ভারতচন্দ্র বাংলা বানানের (এবং 'যাবনী মিশাল' ভাষার) যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড তৈরী করে দিলেন সেটাই মোটামুটি ভাবে উনবিংশ শতকের সাহিত্যসেবীরা মেনে নিলেন। পাশাপাশি সহজতর বানানের এবং কথা উচ্চারণের প্রচলন চেষ্টা না হয়েছে এমন নয়। কালীপ্রসন্ন (হুতোমপ্যাঁচার নক্সা), প্যারীচাঁদ (আলালের ঘরের দুলাল) বা মধুসূদন (প্রহসন দুটিতে) ছিলেন এই ধারার পথিকৃৎ। তবে সেটা শিষ্ট-ভাষার মর্যাদা পায়নি। বিদ্যাসাগর, ভূদেব, অক্ষয়-দেবেন্দ্র, বঙ্কিম, বাংলা ভাষা ও বানানের যে রাজপথ তৈরী করে দিলেন সে পথে রবীন্দ্রনাথকেও দীর্ঘকাল চলতে হয়েছে। এই পোষাকীয় তিনি সামান্য কিছুটা কাটিয়ে উঠেছিলেন প্রথমে ব্যক্তিগত চিঠি ও ডায়েরীধর্মী লেখায়, আরও পরে, বীরবলী চলিত ভাষা-আন্দোলনের যুগে রচিত সাহিত্যকর্মে। শেষ জীবনে তিনি চলিত-ভাষাকেই গদ্য সাহিত্যের মুখ্য বাহন করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে একটি স্ট্যাণ্ডার্ড চলিত ভাষা প্রবর্তিত হবার ফলে উচ্চারণ ও বানানের পার্থক্য আরও প্রকটভাবে ধরা পড়ল। উৎসাহী তরুণ লেখকদের হাতে 'বানানে স্বেচ্ছাচার' প্রবীণদের উৎকণ্ঠিত করে তুলল। এই পরিবেশে ১৯৩৫-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বানান সংস্কারের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হল। ১৯৩৬-এ তাঁরা সামান্য কিছু সরলীকরণের সুপারিশ করলেন। কিন্তু সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্যের ফলে অধিকাংশ সমস্যাকেই তাঁরা শেষ পর্যন্ত পাশ কাটিয়ে গেলেন। এবারে যাঁরা বাংলা ভাষাকে বানান ও প্রকাশ ক্ষমতার দিক থেকে আরও সরল, গণশিক্ষার উপযোগী করে তুলবার উদ্দেশ্যে আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছেন তাঁরা কতটা সফলকাম হতে পারেন সেটি এখন দেখবার বিষয়।

বাংলা বানানে যে সব জটিলতার ফলে নতুন শিক্ষার্থীরা পদে পদে অসুবিধা ভোগ করেন তার মুখ্য কয়েকটি এখানে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমঃ স্বরধ্বনি প্রসঙ্গ।

(১) সংস্কৃত দীর্ঘ আ বাংলায় বস্তুত লোপ পেয়েছে। এখন বাংলায় যে হ্রস্ব আ উচ্চারিত হয় সেটা আসলে সংস্কৃত বিবৃত (open) অ। আর বাংলা উচ্চারণে যে 'অ' বর্ণ এসেছে সেটা বিবৃত-সংবৃতের মাঝামাঝি উচ্চারণ; জায়গাবিশেষে প্রায় বর্তুলায়িত (rounded)। যেমন চল, গরু, পড়ল—এসব শব্দের উচ্চারণ হল চলো, গোরু, পোড়লো। বিকল্প বানান রূপে এগুলি মেনে নেওয়া যেতে পারে।

(২) বাংলা উচ্চারণে ই/ঈ এবং উ/ঊ—এর হ্রস্ব দীর্ঘ ব্যবধান ঘুচে গেছে। বানানে সে ব্যবধান ঘুচিয়ে কেবলমাত্র ই-কার এবং উ-কার রাখা যেতে পারে। পাখি, উনিশ, ধুলা—এসব বানান বাংলায় চালু হয়েছে। তাছাড়া, (জটা) জুট থেকে ঝুঁটি, যূথী থেকে জুঁই, পীঠ থেকে পিড়ি, নূতন থেকে নতুন—এসব তদ্ভবরূপ যখন প্রচলিত হয়েছে, তখন অন্যান্য দীর্ঘ ঈ, ঊ যুক্ত শব্দ উচ্চরানানুগ হ্রস্ব ই, উ যুক্ত বানানে লিখলে ক্ষতির কারণ ঘটবে না। নতুন বানানে শব্দগুলি তদ্ভব (বা অর্ধতৎসম) ভাবা যেতে পারে।

(৩) আমরা লিখি এক, দেখ, এগার,—কিন্তু পড়ি অ্যাক, দ্যাখ, অ্যাগারো। এই অ্যা—স্বরের জন্য একটি বর্ণ লিপি বাংলায় দরকার। রবীন্দ্রনাথ অ্যা-কার বোঝাতে মাত্রাযুক্ত এ-কার (ে) চালু করেছিলেন। আমরাও এই চিহ্নটি বাঁদিক থেকে ডানদিকে উল্টোভাবে রাখতে চাই। লিপি-সংস্কার প্রসঙ্গে পরে এ-বিষয়ে বলা যাবে।

(৪) আমরা লিখি ঋণ, ঋতু, ঋষি,—পড়ি রিন্, রিতু, রিশি। যেমনটি পড়ি বিকল্প বানানে তেমনটিই লেখা যেতে পারে। তবে ঋ-কার চিহ্নটি (ৃ) রাখা যেতে পারে। ব্যঞ্জনের সঙ্গে ঋ-কারের অস্তিত্ব বাংলা উচ্চারণে কিছুটা রয়েছে মনে হয়।

(৫) সংস্কৃত বর্ণমালা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ এবং ঔ যুগ্মস্বর দুটি বাংলায় আমরা পেয়েছি। বাংলা উচ্চারণে অনেকগুলি যুগ্মস্বর রয়েছে তার-জন্যে পৃথক বর্ণমালা নেই। এ-দুটিও বর্জন করে চলা যায় না কি? 'বৌ'কে বউ, 'কৈ' কে কই আমরা লিখতে অভ্যস্ত। 'যৌবন' কে জৌবন, 'ভৈরব' কে ভইরব লেখা অভ্যাস করা যেতে পারে।

এবারে ব্যঞ্জনধ্বনি প্রসঙ্গ।

(৬) সংস্কৃত বর্ণমালায় উচ্চারণের তারতম্য অনুসারে মূর্ধন্য ণ এবং দন্ত্য ন এর প্রচলন রয়েছে। বাংলায় এই দুই ণ/ন-এর উচ্চারণে বিপর্যয় ঘটে গেছে।

—একটি তালব্য ন এর কেমন আবির্ভাব ঘটেছে প্রবোধচন্দ্র সেন একবার তার চমৎকার আলোচনা করেছিলেন। চর্যাগীতে এবং মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য কাব্যে দুই ণ/ন-এর বানানগত হেরফেরের অসংখ্য দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। 'বানান' শব্দটির সংস্কৃতানুগ পুরোনো রূপ হল 'বাণান'। রবীন্দ্রনাথই 'বানান' রূপটি চালু করেছিলেন। কান, বামুন, সোনা—এসব তদ্ভব শব্দে যদি মূর্ধণ্য ণ-এর পরিবর্তে দন্ত্য-ন বানান প্রচলিত হতে পারে বাংলা সমস্ত শব্দেই একটি 'ন' বর্ণ চালু করলে ক্ষতি কোথায়?

(৭) বাংলায় বর্গীয় জ এবং অন্তঃস্থ য-এর উচ্চারণে পার্থক্য নেই। যেখানে 'য' এর 'ইয়' উচ্চারণ হয় তারজন্যে 'য়' বর্ণটি রয়েছে। 'কার্য' থেকে 'কাজ' 'যূথিকা' থেকে 'জুঁই' 'যুগল' থেকে জোড়া যদি লেখা যেতে পারে, যাওয়া, যজ্ঞ, যুবতী, যন্ত্র জাতীয় শব্দকে জাওয়া, জজ্ঞ, জুবতি, জন্ত্র—বিকল্প বানানে লিখলে অসুবিধা ঘটার কথা নয়। যাঁরা সংস্কৃতমূল বানানের দোহাই পাড়েন তাঁরা লক্ষ করবেন, কালিদাস সংস্কৃত শব্দের প্রাকৃত রূপান্তরে যৌবনম্ কে 'জোব্বণং,' 'আর্য্যা' কে 'অজ্জা,' 'যাবৎ' কে 'জাব' বানানে ব্যবহার করেছেন। বাংলার তুলনায় প্রাকৃত তো সংস্কৃতের আরও কাছে ছিল।

বাংলায় আরবী পারসী এবং ইউরোপীয় কিছু শব্দ প্রবেশ করার ফলে ইংরেজি 'was' শব্দের জ (z) উচ্চারণ উপযোগী একটি বর্ণের প্রয়োজন রয়েছে। রাজশেখর বসু ইংরেজি z বর্ণটি দিয়ে (zান্তি) এই উচ্চারণ বুঝিয়েছিলেন। বানান সংস্কার কমিটি জ. বা জ /বর্ণটি চালু করতে চেয়েছিলেন। সেটিই প্রচলিত হওয়া দরকার।

(৮) 'য' বর্ণটির প্রয়োজন শেষ হলেও 'য়' বর্ণটির কার্যকারিতা রয়েছে। চর্যাগীতে 'কায়া' শব্দটি 'কাআ' বানানে লিখিত হয়েছে। কিন্তু 'কায়া' আর 'কাআ' উভয় উচ্চারণে পার্থক্য রয়েছে।

(৯) তালব্য শ, মূর্ধন্য ষ, এবং দন্ত্য স—বাংলায় এ তিন বর্ণের উচ্চারণে বিপর্যয় ঘটেছে। বস্তুত বাংলা উচ্চারণে তালব্য শ এবং দন্ত্য স দিয়েই নতুন বানানে কাজ চালানো যেতে পারে। সভা, বিষয়, শোক প্রভৃতি শব্দ তালব্য শ দিয়ে লেখা চলে। তেমনি আবার আশ্রয়, স্তব, স্মৃতি জাতীয় যুগ্ম বর্ণের শব্দ বা সিনেমা, সোফা, স্যার জাতীয় বিদেশীমূল শব্দ দন্ত্য স দিয়ে লেখা যেতে পারে।

(১০) অন্তঃস্থ ব এবং বর্গীয়-ব বাংলায় মিলে গেছে। উচ্চারণে এবং লিপিতে কোনও পার্থক্য নেই। ইদানীং অবশ্য কিছু লেখক বিদেশীমূল

কোনও কোনও শব্দের ক্ষেত্রে 'ব' বর্ণ দিয়ে অন্তঃস্থ ব-এর উচ্চারণ বোঝাতে চাইছেন। তবে তার খুব প্রয়োজন আছে কি? এতদিন যেমন 'ওয়া' দিয়ে কাজ চলছিল তাই চালানো যেতে পারে। যেমন, আওয়াজ, সওয়ার, হাওয়া ইত্যাদি।

(১১) বাংলায় অনেকগুলি যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ রয়েছে। তার কয়েকটির লিপিরূপ বেশ জটিল। সেগুলি যথাসম্ভব উচ্চারণানুগ অযুক্ত বর্ণে লিখলে যথেষ্ট সুবিধা হতে পারে। যেমন 'অক্ষর' কে অক্‌খর, 'জ্ঞান' কে গ্যাঁন্, 'পদ্ম' কে পদ্‌দ, 'শ্মশান' কে শশান, 'বাক্স' কে বাক্‌স, 'বাঞ্ছা' কে বান্‌ছা লিখলে প্রথম প্রথম চোখে কিছুটা অস্বস্তি লাগতে পারে,—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুফলই পাওয়া যাবে। বাংলা সংবাদপত্রগুলি এ-কাজে ইতি মধ্যে অনেকটা এগিয়ে গেছেন। বাকী কাজ এখন আর তেমন কষ্টকর হবেনা মনে হয়।

(১২) আচার্য সুনীতিকুমার 'বাংলা' না লিখে 'বাঙ্গালা' লেখেন। কেউ লেখেন 'বাঙ্গলা'; কেউ 'বাঙলা'। পূর্বোক্ত বানান সংস্কার কমিটি বাংলা/বাঙলা, রং/রঙ—বিকল্প বানানের সুপারিশ করেন। আর স্বরাশ্রিত হলে ঙ বানানে লিখতে বলেন। যেমন, বাংলা বা বাঙলা দুই চলবে, তবে 'বাঙালী' বা 'ভাঙন' লিখতে হবে। আমাদের প্রশ্ন, 'ঙ' দিয়ে যদি স্বরাশ্রিত ও স্বরাশ্রয়বিহীন দুরকম শব্দই লেখা চলে তাহলে আর 'ং' বর্ণটির কি দরকার। পুরোনো বাংলা পুথিতে শব্দের মাঝের অনুস্বার মাত্রার উপরে বিন্দু চিহ্ন দিয়ে দেখানো হত। যেমন 'সংকোচ,' লংঘন ইত্যাদি। চন্দ্রবিন্দু চিহ্নও একইভাবে দেওয়া হত। নাগরীতে এ-রীতি চালু আছে। বাংলায় পুনঃপ্রবর্তন করলে কেমন হয়? যেখানে ঙ দিয়ে কাজ চলে ভাল, যেখানে অসুবিধা দেখা দেবে বিন্দু চিহ্নিত অনুস্বার ব্যবহার করা যেতে পারে। ঞ বর্ণটি বাংলায় সম্পূর্ণই বর্জন করা যেতে পারে।

(১৩) শব্দ শেষের বিসর্গ সাধারণত পরবর্তী শব্দে সন্ধিসূত্রে নতুন যুগ্মবর্ণের রূপ নেয়। যেমন, তেজস্কর, আয়ুর্বেদ, ছন্দোগুরু ইত্যাদি। সংস্কৃত বানানের অভ্যাসবশত শব্দশেষে বিসর্গ রক্ষিত হলেও বাংলায় অনেকসময় তার উচ্চারণ লুপ্ত হয়েছে। যেমন, পিতঃ, ক্রমশঃ, বশতঃ ইত্যাদি। এসব বিসর্গ বর্জন করাই ভাল। সন্ধির বেলাতেও, যে সব শব্দ বহুল প্রচলিত সেখানে বিসর্গের পরিবর্তিত অস্তিত্ব আর মোছা সম্ভব নয়। যেমন পরিষ্কার, দুর্বুদ্ধি, নিষ্ফল ইত্যাদি। তবে মনোময়, ছন্দোগুরু, যশোলাভ ইত্যাদি শব্দ মনময়, ছন্দগুরু, যশলাভ বানানে লেখা চলতে পারে।

(১৪) পূর্বোক্ত বানান সংস্কার কমিটি সংশয়স্থলে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহারের সুপারিশ করেছেন। নতুন শিক্ষার্থীর কাছে সবটাই তো সংশয়পূর্ণ। সুতরাং অকারান্ত বর্ণ থেকে হসন্ত বর্ণ পৃথকভাবে চিহ্নিত করার প্রয়োজন রয়েছে। ইংরেজিতে 'স্মল' ও 'ক্যাপিটাল' দু রকমের হরফ থাকে। বাংলাতেও সেটা চালু করলে মন্দ হয় না। ছোট হরফ হসন্তজ্ঞাপক, বড়ো হরফ অকারান্ত-জ্ঞাপক, অন্য স্বরচিহ্নতো পৃথক ভাবেই দেওয়া হয়। যেমন হরফ, বাঞ্ছা, রক্ত শব্দগুলি হরফ, বানছা, রকত এমন বানানে লেখা যেতে পারে। বিকল্প কোনও পদ্ধতির কথাও বিশেষজ্ঞেরা ভাবতে পারেন। তবে অকারান্ত বর্ণ থেকে হসন্ত বর্ণের পৃথক উচ্চারণ বোঝানোর প্রয়োজন রয়েছে সেটা ভুললে চলবে না। নীচে '্' চিহ্ন দ্রুত লিখলে ব্যবহার সম্ভব নয়। ছাপার টাইপেও শুনেছি ওটা রক্ষা করা কষ্টকর।

একসঙ্গে এতগুলি বানান সংস্কার ঘটানো কামাল আতাতুর্ক বা মাও সে তুং-এর মতো শক্তিমান ব্যক্তির দ্বারা হয়তে সম্ভবপর। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা গণসংযোগ সংস্থার কর্মকর্তারা পেরে উঠবেন মনে হয় না। আমাদের, অর্থাৎ শিক্ষিত সমাজের পুরোনো সংস্কারাচ্ছন্ন মন পদে পদে বিদ্রোহ করবে।সুধীজনেরা এসব ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেন। সুতরাং নব সংস্কারপন্থীরা যদি আপাতত হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের বিভেদ ঘোচাতে পারেন, দুই ণ/ন, তিন শ/ষ/স-এর পুনর্বিন্যাস করতে পারেন এবং অতি জটিল যুক্তাক্ষরগুলি (জ্ঞ,ঞ্জ,ক্ষ) পরিহার করতে পারেন সেটাই যথেষ্ট ধরতে হবে। গণশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিকল্প হিসাবেও যদি এই নতুন বানানে কিছু প্রাথমিক বই মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়, গণ সংযোগের কর্মীরা এই নতুন বানানে পল্লীতে পল্লীতে নব শিক্ষার্থীদের বাংলা শেখাতে আরম্ভ করেন, যথেষ্ট সুফল পাওয়া যাবে মনে হয়। ১৯৩৬-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সকল বিকল্প বানান সংস্কারের প্রস্তাব রেখেছিলেন তার অনেকটা এতদিনে কার্যকরী হয়েছে। এবারে সেগুলি আর বিকল্প না রেখে বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।—সেই সঙ্গে আমাদের নতুন প্রস্তাবগুলি বিকল্প ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।*

অনুলেখ : লিপি সংস্কার :

বানান সংস্কারের সঙ্গে লিপি সংস্কারের প্রশ্নটিও জড়িত রয়েছে। মুখ্য

* [৮ই মে কলিকাতাস্থ রামকৃষ্ণ ইন্‌স্‌টিট্যুট অফ কালচারে আয়োজিত সেমিনারে পঠিত ও আলোচিত।]

দুটি সংস্কার এখুনি দরকার। (১) হসন্ত বর্ণের জন্য পৃথক বর্ণলিপি প্রবর্তন। (দ্রঃ ১৪ নং আলোচনা) (২) যেসব স্বর-চিহ্ন ব্যঞ্জনের বাঁদিকে দেওয়া হয় সেগুলি ডানদিকে অপসারণ। এতে নবশিক্ষার্থীরা যেমন এ-ভাষা শিখতে সুবিধাবোধ করবে, তেমনি টাইপ রাইটারের ব্যবহারও সহজ হবে।

কবিতা

জন্ম দার্শনিক

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ,
জন্ম মৃত্যুর টানাপোড়েনে বোনা
তোমার জীবন,
জামদানি শালের মতন
আশ্চর্য বৈচিত্র্যময় ;
শিশুরবি নিষ্ক্রান্ত বিশ্ব পরিক্রমায়,
প্রত্যুষের সোনা রোদে
সোনালী জরির পুষ্প
সবুজ পত্রের বন্ধনে
ঝলমল করে,
শ্যামলতা যৌবনের প্রতীক।
মধ্যাহ্ন সূর্যের শৌর্য্য
কাণ্ডে আর শাখা প্রশাখায়
রূপা হয়ে ঝরে,
তারুণ্যের রূপান্তর হয়,
বনস্পতি প্রৌঢ়তায় তখনও সুন্দর।
তারপর নীড়ে ফেরে পাখি,
সায়াহ্নের অন্ধকারে
নেমে আসে মৃত্যুর কৃষ্ণতা,
উদয় অস্ত জন্ম মৃত্যু একাসনে বসে,
জন্মেই যে মৃত্যুর চিন্তা করেছিলে ;
কবি, তুমি জন্মদার্শনিক ॥

সাহিত্য ও টোট্যালিটেরিয়ানিজ্‌ম্‌*

জর্জ অরওয়েল

আমি আমার প্রথম রেডিও-ভাষণের সুরুতেই বলেছিলাম যে, এ যুগটা বিচারশীল যুগ নয়। এটা পক্ষাবলম্বিতার যুগ—নির্ব্বেদের নয়। এ যুগে যে-গ্রন্থের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তুমি সহমত নও তার মধ্যে গুণ খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য হবে। রাজনীতি—খুব সাধারণ ও নির্বিশেষ অর্থেই রাজনীতি—কর্ত্তৃক সাহিত্য এখন এমন সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত, সচরাচর সেরূপ কখনোই ঘটে না। ফলে, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যে বিরোধ চিরদিনের তার সম্বন্ধে আমরা সহসা সচেতন হয় উঠেছি। তাই যখন একালে অকপট সত্য ও নিরপেক্ষ সাহিত্যসমালোচনার দুরূহতার কথা চিন্তা করি তখনই বুঝতে পারি আগামী দিনের সাহিত্যের উপরে কোন্‌ ভয়ঙ্কর বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

যে-যুগে আমরা বাস করছি সেখান থেকে আত্মস্বাতন্ত্র্যবান ব্যক্তি ক্রমেই লোপ পাচ্ছেন। কিম্বা কথাটা আরেকটু ঘুরিয়ে বলাই সঙ্গত হয়তো,—যে-যুগে ব্যক্তি মানুষ 'আমি আত্মস্বতন্ত্র' এরূপ ভ্রান্তি থেকে ক্রমে মোহমুক্ত হচ্ছে। এখন ব্যাপার হলো এই যে, সাহিত্য সম্পর্কে যখনই আমরা কিছু বলি—বিশেষ করে' সমালোচনার বিষয়ে কিছু বলি—তখন কিন্তু আমরা আত্মস্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অস্তিত্বকে স্বতোসিদ্ধের মতোই মেনে নিই। সমস্ত আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্য—গত চারশো বছরের সাহিত্যের কথা বলছি—একটি প্রত্যয়ের উপর গঠিত। সে-প্রত্যয় চিন্তার সততার। অথবা বলতে পারি, শেক্সপীয়রের "তোমার নিজের কাছে তুমি সত্য থাকবে" এই নীতির উপরে। কোনও লেখকের কাছেই আমাদের যা প্রাথমিক দাবী, তা হলো, তিনি মিথ্যা কথা বলবেন না—তিনি নিজে যা যথার্থ বিশ্বাস করেন, অনুভব করেন, তা-ই বলবেন। কোনো শিল্পকর্ম সম্বন্ধে জঘন্যতম নিন্দাই হলো,

---

* Orwell-এর "Literature and Totalitarianism প্রবন্ধের অনুবাদ। অনুবাদক—তীর্থরেণু দাস। 'টোট্যালিটেরিয়ানিজ্‌ম্‌' কথাটির সঙ্গে যাঁরা সম্যক্‌ পরিচিত ন'ন তাঁদের জন্য বলি, এর দ্বারা একদলীয় শাসন ও রাষ্ট্রের সর্বনিয়ন্তৃত্ব বোঝায়।—সম্পাদক

সেটি নিষ্কপট নয়। এবং এটা সৃজনধর্মী সাহিত্য অপেক্ষা সমালোচনাকর্ম সম্বন্ধে আরো বেশী সত্য। কারণ সৃজনধর্মী সাহিত্যে তবু কিছুটা ভান, ভঙ্গিমা, এমন কি কিছুটা, যাকে সোজা ভাষায় বলে ছলনা, তাও তেমন আপত্তিকর নয়—অন্ততঃ, যতক্ষণ লেখককে মূলতঃ কাপট্যহীন বলে' আমরা বিশ্বাস করি ততক্ষণ। আধুনিক সাহিত্য আসলে ব্যক্তিমানসের সৃষ্টি। একটি মানুষ কী ভাবছে, অনুভব করছে—এ তারই সত্য রূপায়ণ—অন্যথায় এর কোনোই মূল্য নেই।

কথাটা আমরা স্বতঃসিদ্ধের মতো মেনে নিই বটে কিন্তু তত্ত্বটি ভাষায় নিবদ্ধ করতে গেলেই টের পাই, সাহিত্য এখন কোন্ বিপদের সম্মুখীন। কারণ এ যুগটা টোট্যালিটেরিয়ান রাষ্ট্রের যুগ, যা ব্যক্তি মানুষকে কোনোই স্বাধীনতা ভোগ করতে দিতে রাজী নয়—হয়তো অক্ষমই। টোট্যালিটেরিয়ান তন্ত্রের উল্লেখমাত্রেই সাধারণতঃ রাশিয়া, জার্মানী, ইটালীর কথাই* আমাদের মনে পড়ে। কিন্তু আমার মনে হয়, এ সম্ভাবনা স্বীকার করাই সঙ্গত, যে এ-দুর্লক্ষণ বিশ্বব্যাপী হতে চলেছে। এ-তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, অনিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্রের দিন প্রায় শেষ হ'লো, এবং একের পর এক দেশ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থ-নীতির ব্যবস্থা গ্রহণ করছে—যা-কে রুচি ভেদে সমাজতন্ত্রই বলুন বা রাষ্ট্রিক ধনতন্ত্রই বলুন। এর ফলে ব্যক্তিমানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা—তার ইচ্ছা-মতো কাজ করার, পছন্দ মতো বৃত্তি বেছে নেওয়ার, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যদৃচ্ছ ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা—শেষ হতে চললো। কিন্তু খুব সাম্প্রতিক কালেও এর তাৎপর্য্যটা ঠিক ধরা পড়েনি। এটা ভালো করে' বোঝা যায়নি যে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিলোপের সঙ্গে চিত্তের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতাও বিপন্ন হবে। সমাজতন্ত্রবাদ-কে সাধারণতঃ লোকে মনে করতো একপ্রকার সুনীতিশাসিত উদারনৈতিকতা যেখানে রাষ্ট্র তোমার অর্থনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করবে, দারিদ্র বেকারী ইত্যাদির ভয় থেকে মুক্ত রাখবে,—কিন্তু তোমার মনোজীবনে হস্তক্ষেপ করতে যাবে না। শিল্প-সাহিত্য উদারনৈতিক যুগে যেমন বিকাশ প্রাপ্ত হয়েছে তেমনই হবে, বরং আগের চেয়ে বেশীই হবে, যেহেতু শিল্পী এখন অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হবে।

*প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৯৪১—তখন জার্মানীতে নাৎসী শাসন ও ইটালীতে ফ্যাসিষ্ট শাসন বলবৎ ছিল। রাশিয়াতে সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট শাসন তো ছিলই। এ তিনটিই টোট্যালিটেরিয়ান-ধর্মী।—সম্পাদক

কিন্তু এ-পর্য্যন্ত যে-যে প্রমাণ আমরা পেয়েছি তা থেকে না স্বীকার করে' উপায় নেই যে, আমাদের ঐসব ধারণা অলীক প্রতিপন্ন হয়েছে। টোট্যা-লিটেরিয়ান রাষ্ট্রে চিন্তার স্বাধীনতার এমন মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে যে আগের কোনো যুগে কেউ তা কল্পনাও করেনি। এবং মনে রাখতে হবে যে এই চিন্তার নিয়ন্ত্রণ কেবল অভাবাত্মক বা negative নয়, ভাবাত্মক বা positiveও বটে। এ-যে কোনো বিশেষ ধরণের চিন্তার প্রকাশকেই—এমন কি ভাবনাকেও—নিষিদ্ধ করে তা-ই নয়, এই নির্দেশও দেয়, কী তোমাকে ভাবতে হবে। এ তোমার মনের জন্য বিশেষ ভাবজগৎ তৈরী করে দেয়, তোমার চিত্তের ভাবাবেগগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে। এবং এ যেমন তোমার জীবনচর্য্যা ও আচরণবিধি নির্দিষ্ট করে' দেয় তেমনি তোমাকে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তোমাকে একটি কৃত্রিম জগতে আবদ্ধ করে, যেখানে তুলনা বিচারের কোনো নিরিখই তোমার সামনে আর নেই। এবং টোট্যালিটেরিয়ান রাষ্ট্রের সর্বদাই লক্ষ্য যে, জনগণের শুধু কাজকর্মই নয় তাদের মনোবৃত্তিও নিয়ন্ত্রিত করবে।

এখন এই পরিপ্রেক্ষিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, সাহিত্য কি এরূপ আবহাওয়ায় বাঁচতে পারে—পারা সম্ভব? আমি বলবো, এর সোজা উত্তর, না, পারে না। এবং যদি টোট্যালিটেরিয়ানিজ্‌ম্ সর্বব্যাপী ও চিরস্থায়ী হয়ে ওঠে তবে সাহিত্য বলে' যা এতদিন আমরা জেনে এসেছি তার অবসান হবে। এবং একথা ভাবাও খুবই ভুল হবে—যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কিছু বুঝি যুক্তি আছে—যে, যার অবসান হবে তা কেবল রেনেসাঁ-উত্তর য়ুরোপীয় সাহিত্য, আর কিছু নয়।

টোট্যালিটেরিয়ানিজ্‌ম্ এবং অতীতের—য়ুরোপের অথবা প্রাচ্যদেশীয়—ধর্মীয় গোঁড়ামির মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ হলো যে, অতীতের গোঁড়ামির স্বভাবটা পরিবর্তনশীল ছিল না, অন্ততঃ দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল তো নয়ই। যেমন মধ্যযুগের য়ুরোপে চার্চ্চ বা খৃষ্টীয় যাজক সম্প্রদায়, নির্দেশ দিত জনসাধারণ কী বিশ্বাস করবে, কী করবে না। কিন্তু লোকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঐসব বিশ্বাসগুলো নিয়েই থাকতে পারতো। চার্চ্চ তাদের এটা বলতো না যে, সোমবারে তোমরা এইরকম বিশ্বাস করবে এবং মঙ্গলবারে ওইরকম। আজকের দিনেও গোঁড়া খৃষ্টান হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান সম্বন্ধে এটা সত্য। একদিক দিয়ে তাদের চিন্তার পরিমণ্ডলটা গণ্ডীবদ্ধ নিশ্চয়ই, কিন্তু সে তার সমস্ত জীবনটাই ওই গণ্ডীর মধ্যে

[পরবর্ত্তী অংশ ৫২২ পৃষ্ঠায় দেখুন]

পথে বিপথে

সাধনকুমার ঘোষ

[সাত]

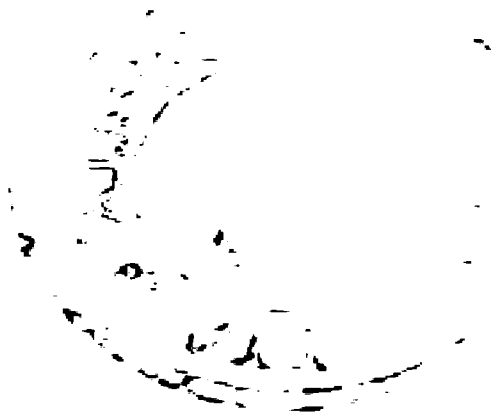

দার্জিলিঙে কয়েকটি স্থান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার সূর্য্যকরোজ্জ্বল রূপ দু'চোখ ভরে দেখা যায়। নর্থ পয়েন্টের সেণ্ট জোসেফ্‌স কলেজ তার একটি। এই কলেজে আমি কিছুদিন, অর্থাৎ একটা গ্রীষ্মের ছুটি, অধ্যাপনা করেছিলাম—পরলোকগত ফাদার ব্রায়ানের আনুকূল্যে। কলেজেই থাকার জন্য আমায় একটি cubicle দেওয়া হয়েছিল, আহারাদির ব্যবস্থাও কলেজেই। তখন ইংরাজীর প্রধান অধ্যাপক ফাদার ব্রায়ানই ছিলেন। রেক্টর ছিলেন ফাদার ষ্ট্যানফোর্ড। ইনি ছিলেন ক্যানাডার অধিবাসী ও বিশিষ্ট সাহিত্যরসিক। ক্যানাডার এককালীন বিখ্যাত কবি রবার্ট সার্ভিসের (Robert W. Service) অনেক কবিতা তিনি অনর্গল আবৃত্তি করতে পারতেন। প্রসিদ্ধ ক্যানাডীয়ান সাহিত্যিক ষ্টিফেন লীকক-এর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল।

নর্থ পয়েন্টের অবজারভেটরী ও আবহাওয়া বিভাগ দুয়েরই খুব নাম ডাক ছিল। বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলায় উচ্চতম আদালত তাদের আবহাওয়া রিপোর্টকে বিশেষ প্রামাণ্য বলে স্বীকার করেন। কলেজটির অবস্থান বার্চহিলের নীচে—অতি মনোরম পরিবেশে। অনতিদূরে লেবং রেসকোর্স ও পর্ব্বতারোহণ শিক্ষায়তন। আমার কয়েকবার দার্জিলিং ভ্রমণের মধ্যে একবার এভারেষ্ট-বিজয়ী তেনজিং-এর সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয়েছিল। তেনজিং-এর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরে আমার মনে হলো, "তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ" একথা খুব কম কীর্ত্তিমানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রসঙ্গত এও বলি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত ক্যালকাটা রোডের (যেখানে বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পৌত্রী মিউটিনির গল্প বলেছিলেন) নাম পরিবর্ত্তন করে' যে তেনজিং রোড করা হয়েছে তাতেও আমি সুখী নই। নাম পরিবর্ত্তনের আমি একেবারেই পক্ষপাতী নই। তা ছাড়া এভারেষ্ট-বিজয়ীকে সম্মান কি কার্ট রোডের নাম পরিবর্ত্তন করে দেওয়া যেত না?

অন্য যে কয়টি স্থান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভা উপভোগ করা যায় তার মধ্যে প্ল্যান্টার্স ক্লাবের সানুদেশ, যা এককালে 'জলপাইগুড়ি স্পার'

নামে খ্যাত ছিল, নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। অন্য দু'টির একটি রাজভবনের দক্ষিণে হ্যাপি ভ্যালী টী এষ্টেটের ঠিক উপরের থাকে ; আর অন্যটি জলাপাহাড়ের উপরে সেণ্ট পল্‌স্ স্কুল। আরও দুটি স্পটও আছে—সে দুটি কফিরুম বা টি-রুম। তার মধ্যে একটি কেন্টোর ; অন্যটির স্বতন্ত্র উল্লেখ করবো।

দার্জিলিঙের বহুনিন্দিত ও বহু প্রশংসিত ম্যাল (Mall)-এর প্রসিদ্ধি কিন্তু ফগের জন্যে, তুষারমৌলির জন্যে নয়। দার্জিলিঙের ফগ কেবল এক রহস্য-লোকেরই আভাষ দেয় না, মাঝে মাঝে আমরাও যে সম্ভবতঃ স্বপ্ন দিয়ে গড়া (We are such stuff as dreams are made on) একথাও মনে করিয়ে দেয়। লণ্ডনের পী-সূপ (Peasoup) আর লণ্ডন পার্টিকুলার (London particular)-এর সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। দার্জিলিঙের ফগ দার্জিলিঙেরই বৈশিষ্ট্য এবং গৌরব। ভারতবর্ষের অন্যান্য শৈলনগরীর মধ্যে এক মাত্র কোদাইক্যানালেই ফগ্-এর সাক্ষাৎ মেলে, তবে দার্জিলিঙের তুলনায় সে ফগ্ অকিঞ্চিৎকর। ডালহৌসীর মতোই কোদাইক্যানালের বৈশিষ্ট্য তার পরিবেশ এবং প্রশান্তি। দার্জিলিঙে এই দ্বিতীয়টির অভাব খুব তীব্রভাবে অনুভব করা যায় এবং তাই সম্পূর্ণ catharsis সম্ভব হয় না। সম্ভবতঃ সীজন্ বাদ দিয়ে এলে হয়, কিন্তু রঞ্জনের 'শীতে উপেক্ষিতা' পড়েও আমি শীতকালে দার্জিলিঙে আসার কোনো উৎসাহ বোধ করিনি।

রঞ্জনের 'শীতে উপেক্ষিতা'র উল্লেখে মনে পড়লো কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভা উপভোগের অন্যতম, এবং অনেকের মতে শ্রেষ্ঠ স্থান দার্জিলিঙের প্রখ্যাত রেস্তোরাঁ-cum-কফিরুম Pliva-কে। অবশ্য প্লিভার নাম এখন পরিবর্ত্তিত হয়েছে—বর্ত্তমান নাম গ্লেনারে (Glenaray)। প্লিভা এবং গ্লেনারে দুই নামেই আমি এখানকার উৎকৃষ্ট স্যাণ্ডউইচ্, সসেজ্ রোল, ও ততোধিক উৎকৃষ্ট কফির সহযোগে কাঞ্চনজঙ্ঘার মহিমা কতো অসংখ্য দিন উপলব্ধি করেছি। এক একটি দিন নিটোল মুক্তার মতো স্মৃতির মঞ্জুষায় জমা হয়ে আছে।

জলাপাহাড়ের পথে মাঝে মাঝে দেখা হতো অধ্যাপক সুশোভন সরকারের সঙ্গে। তিনি সপরিবারে প্রাতর্ভ্রমণ করতেন, তবে Mall সম্বন্ধে তাঁর অনীহা ছিল প্রচণ্ড।

দার্জিলিঙে আমি একবার স্যানাটোরিয়ামে ছিলাম। তা ছাড়া (এবং কলেজের চাকরি ছাড়া) প্রায় প্রত্যেকবারই (সেও সাত-আটবার হবে) Champaign Villa নামে একটি chummery-তে থাকতাম। বাড়ীটি

স্থাপি ভ্যালী টী এষ্টেটের ঠিক উপরে এবং প্রকৃত পক্ষে একটি সরকারী গেষ্ট-হাউস। এক সময়ে আমার একাধিক আত্মীয় ও বন্ধু রাইটার্স বিল্ডিং-এ কাজ করতেন। তাঁদেরই সুবাদে আমি এই অত্যন্ত আরামদায়ক বাড়ীটিতে, অতি স্বল্প ব্যয়ে, দার্জিলিঙে ছুটি কাটাতুম। যখন অতিথি সংখ্যা খুবই বেশী হতো তখনো কোনোদিন আমার কামরায় দ্বিতীয় ব্যক্তি আসে নি। আসবাবপত্র আধুনিক এবং সুন্দর বিছানা ও দুখানা বিলাতী কম্বল। বলা বাহুল্য, এ ছাড়া সংলগ্ন শাওয়ার বাথ এবং প্রতিদিন দু' বালতি গরম জল। আমি কিন্তু গরম জলের প্রয়োজন কখনো অনুভব করিনি। এই অনভ্যস্ত বিলাস আমি কতো সামান্য অর্থের বিনিময়ে পেয়েছি তা শুনলে অনেকেই ঈর্ষান্বিত হবেন। তাই টাকার অঙ্কটা উল্লেখ করবো না।

দার্জিলিঙের বাঁধাকপির—বিশেষতঃ সবুজ বাঁধাকপির—একটি বিশেষ স্বাদ আছে, যা কলকাতায় কখনো পাইনি। রাত্রে মাংস প্রাত্যহিক ছিল এবং যদিও তা সিমলার দুম্বা-কারির সঙ্গে তুলনীয় নয়, তবু, যথেষ্ট উপাদেয় হতো। সৌরীন মিত্র নামে একজন বোর্ডার ছিলেন, রান্না সম্বন্ধে তাঁর খুব উৎসাহ ছিল। ইনি ছিলেন রাজ্যপালের অন্যতম P.A.। তিনি একদিন গাজর, বাট ও কড়াইশুঁটির সংমিশ্রণে মাংস রান্না করিয়েছিলেন। বস্তুটি স্টুও হয়নি, কারিও নয়,—হয়েছিল অমৃত।

আমার দার্জিলিং ভ্রমণ প্রায় সবই প্রাক্-ফারাক্কা যুগে। একবার মাত্র আমি অবিভক্ত ভারতে সে-যুগের অভিজাত ট্রেন দার্জিলিং মেইলে গিয়েছি, যে-ট্রেনের আকর্ষণ—বিভূতিভূষণ তাঁর "ডাকগাড়ী" গল্পে কিছুটা পাঠকের মনে সঞ্চারিত করেছেন। আমার অধিকাংশ যাত্রাই নর্থবেঙ্গল একসপ্রেসে, যখন ট্রেনটি সক্রিগলি ঘাট অবধি যেত। সক্রিগলি থেকে ওপারে মনিহারিঘাট যেতে হতো ষ্টীমারে। তারপর মিটার গেজের গাড়ীতে পরদিন ভোরে পৌঁছানো যেত শিলিগুড়ি। এবং তার পর রুচি অনুযায়ী ট্যাক্সি অথবা খেলনা-রেলে দার্জিলিং যাত্রা। আমি কদাচিৎ ট্যাক্সি নিয়েছি। রেলপথ—সিমলা ও উটির মতোই—দার্জিলিঙের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। পার্ব্বত্য পরিবেশ আরম্ভ হয় তিনধরিয়ার পর থেকে, তবে কার্শিয়াং পার না হলে মেঘ-মুলুকের আভাষ পাওয়া যায় না। দার্জিলিঙে ফগ্ আর রোদের লুকো-চুরি খেলা দেখা যায়। কিন্তু ঘুম আর সোনাদায় ফগ্ পরিবেশেরই অংশ এবং প্রায় স্থায়ী অধিবাসী। ফগ্ শূন্য ঘুম এতবারের মধ্যে বোধহয় একবার মাত্রই দেখেছি। তবে সৌভাগ্যক্রমে সেদিনই গিয়েছিলাম বৌদ্ধমঠটি দেখতে।

ঘুমে যাঁরা যান তাঁরা প্রথমেই কেন্ডেন্টারের Piggery সন্দর্শনে যান। শূকরগুলির সুপুষ্ট আকার ও বিচিত্র নামকরণ (প্রায়শঃই সিনেমা তারকাদের অনুসরণে) কৌতুকের সৃষ্টি করে। ঘুমের বৌদ্ধমঠে গেলেই কিন্তু মনে হবে অন্য একটি সভ্যতার ইঙ্গিত পাচ্ছি। অবশ্য দার্জিলিঙের মহাকালের মন্দিরেও ভূত-তাড়ানি পতাকা ও ফেষ্টুনের দেখা মেলে, কিন্তু ঘুমে মেলে সিকিমের ইঙ্গিত, যেমন সিকিমে মেলে তিব্বতের। দালাই লামা অনেকদিন মুসৌরী ও ধর্ম্মশালায় (কাংড়া উপত্যকায়) কাটালেও ও-দুটি স্থানের উপর তাঁর প্রভাব উল্লেখযোগ্য নয়। দালাইলামার স্বাভাবিক পরিবেশ হলো কালিম্পং। কিন্তু যেকারণে কালিম্পং-এ এককালে গ্রীসের প্রিন্স পিটারের গতিবিধি স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন ছিল না, বোধহয় সেই কারণেই দালাইলামাকে সীমান্তের এত নিকটে রাখতে কর্তৃপক্ষ ভরসা পাননি।

Rummer Godden-এর নাম সবাই জানেন। তিনি এবং তাঁর ভগ্নী Sou Godden বেশ কিছুদিন ভারতবর্ষে ছিলেন। তাঁদের ভারতপ্রীতি সুবিদিত, যেমন সুবিদিত—সিনেমার কল্যাণে—Rummer Godden-এর The River বইখানি। তাঁর দুখানি বইয়ের পটভূমি দার্জিলিং অঞ্চল। তার মধ্যে Rungli-Rungliot স্মৃতিচারণের পর্য্যায়ে পড়ে। Black Narcissus কিন্তু খাঁটি উপন্যাস এবং বিশ্ববিখ্যাত লেখক আর্থার কেসলারের (Arther Koestler) মতে, এই শতকের প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসগুলির অন্যতম। তাঁর মতে Rummer Godden-এর Black Narcissus এবং The Lady and the Unicorn (এটির পটভূমি বিগতদিনের ফিরিঙ্গি অধ্যুসিত কলকাতা) E.M. Forster-এর Passage to India-র সঙ্গে তুলনীয়, সমপর্য্যায়ের এবং সমকক্ষ। ইঙ্গভারতীয় সম্পর্ক এবং পরিবেশের প্রভাব,—সম্ভবতঃ সমালোচক এ-দুটির মানদণ্ডেই বিচার করেছেন। তবে Rummer Godden-এর বই দুখানির উৎকর্ষ সম্পূর্ণ স্বীকার করেও এ-ও বলবো যে, শুধু ঐদুটিরই উল্লেখে এডওয়ার্ড টমসনের (Edward Thompson) An Indian Day-র প্রতি একটু অবিচার হয়েছে। স্বয়ং ফষ্টারই আমার কাছে স্বীকার করেছেন যে, তাঁর সঙ্গে টমসনের যথেষ্ট মিল আছে যা অমনোযোগী পাঠকের কাছে ধরা পড়ে না।

সে যাক্, Black Narcissus নিঃসন্দেহে একটি স্মরণীয় রচনা। সুন্দর পরিবেশেও যে সুন্দরের আয়ু সীমিত, সুন্দর মাত্রেই যে ক্ষণিকের অতিথি এই কথাই Black Narcissus পড়ার পর বারে বারে মনে পড়ে। উপন্যাসটির পটভূমিকা মোপু—দার্জিলিঙের উত্তরে ও আরও উচ্চে একটি কাল্পনিক

পাহাড়ী রাজ্য। তবে নামটুকুই কাল্পনিক, পারিপার্শ্বিকের বর্ণনায় দার্জিলিং অঞ্চলের সহিত লেখিকার একাত্মবোধ অত্যন্ত স্পষ্ট। মোপুর পুরাতন রাজ-প্রাসাদ এককালে একটি প্রকাণ্ড হারেম ছিল। যুগ পরিবর্তন অবশ্য হয়েছে, কিন্তু লেখিকা ইঙ্গিত করেছেন যে, সবকিছুকে পরিবর্তনের আওতায় আনা যায় না। মোপুর এককালের বিলাস নিকেতনকে কনভেন্টে পরিণত করার চেষ্টা কি করে' ব্যর্থ হলো এটিই কাহিনীর আপাত বিষয়বস্তু। Passage to India-র সঙ্গে মিল আছে। মনে হয় লেখিকাও প্রতিষ্ঠান অথবা ইন্‌স্টিট্যুশনে অবিশ্বাসী।

Black Narcissus-এর পরিণতিটি বড় করুণ। কনভেণ্টটি যে পরিত্যক্ত হলো তাতে পাঠকমাত্রেই বেদনা অনুভব করবেন। পাহাড়ী নদী, পাহাড়ী পাখীর কলকাকলী, অর্কিড ও ফার্ণের সমারোহ—সর্বোপরি রাজার (যাঁকে সর্বদা 'জেনারেল' বলা হয়েছে) অকুণ্ঠ দান ও সাহায্য—এমন পরিবেশেও কয়েকটি পাহাড়ী শিশু ও বালক বালিকাকে নতুন জীবনের সন্ধান দেওয়া গেলনা! অতীত গ্লানির স্মৃতির কি এতই ক্ষমতা! অনেকগুলি ব্যর্থ কামনা ও আনুষ্ঠানিক ব্যর্থতার স্মৃতিতে মন ভরে যায়। Black Narcissus-এর পাঠক-পাঠিকা নিজের অজ্ঞাতসারে বহুবার দেখা কাঞ্চনজঙ্ঘার জন্য আকুলতা বোধ করবেন এবং অন্ততঃ একজন পাঠক স্মরণ করবে ওখানকার বড় বড় হলুদ রঙের প্রজাপতিগুলিকে। অমন প্রজাপতি সমতলভূমিতে দেখা যায় না। উপন্যাসটি হার্ডির কবিতার মতো করুণ।

দার্জিলিঙের মালের সম্বন্ধে কারও কারও অনীহা থাকলেও আমি ওখানে প্রত্যহই বসতাম। একখানি ইংরাজী কবিতার বই বা রম্যরচনা নিয়ে 'Step Aside' এর ঠিক উপরের থাকে একটি বেঞ্চ বলতে গেলে আমার জন্য নির্দিষ্টই ছিল—অন্ততঃ আমার তাই মনে হতো। 'Step Aside' পরলোকগত স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের বাসভবন ছিল। এখানেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর অন্তিম দিনগুলি কাটিয়েছিলেন, তাঁর শেষ নিঃশ্বাসও পড়ে এই বাড়ীতেই। বর্তমানে বাড়ীটি জাতীয় সম্পত্তি। আমি বসে বসে দু-চার পাতা পড়তাম আর কখনো মহাকালের মন্দিরের দিকে, কখনো জলাপাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। নেপালী কবি ভানুভক্তের মূর্তিটি তার প্রাপ্যমর্যাদা পায় না বলে' আমার মনে হয়েছে। আর ব্যাণ্ডষ্ট্যাণ্ড আর পনিষ্ট্যাণ্ডগুলির দিকে যখনই চোখ পড়তো অতীত দিনের কথা মনে পড়তো। যে-পনিষ্ট্যাণ্ডে এখন চারপাঁচটির বেশী পনি থাকে না সেখানে এই শতকের তৃতীয় দশকে

চল্লিশ পঞ্চাশটি থাকতো। এবং ব্যাণ্ড এখন নীরব—অন্ততঃ আমার সময়ে তাই দেখেছি। আজকাল নাকি ট্যুরিষ্ট আকর্ষণের অনেকবিধ চেষ্টা হচ্ছে। ফলাফলের কথা বলতে পারিনা—তবে দার্জিলিঙে ট্যুরিষ্ট লজের সংখ্যা, ব্যবস্থা ও দক্ষিণা যে নিঃসন্দেহে ট্যুরিষ্ট আকর্ষণের খুব অনুকূল নয়—তা বলতেই হবে।

দার্জিলিঙের ম্যালে বসে' আমি অনেক বই শেষ করেছি। A. E. Housman, Rupert Brooke এবং Sturge Moore-এর Collected Poems (এগুলি অবশ্য আমি সব হিল-ষ্টেশনেই পড়ি), Max Beerbohm-এর And Even Now, Somerset Maugham-এর The Gentleman in the Parlour এবং Michael Lloyd-এর Apuleian Summer—এই কয়টির নাম মনে পড়ছে। Bertrand Russell-এর Portraits From Memory তখন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল, সেগুলিও সাগ্রহে পড়েছি। প্রসঙ্গতঃ বলি, রাসেল ও অরওয়েলকে আমি এশতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক মনে করি, যেমন মনে করি, ভিন্ন ক্ষেত্রে, বেলক্ ও এইচ্ এম, টললিনসনকে। বেলক্ সম্বন্ধে আমার মত রুপার্ট ব্রুক বেঁচে থাকলে তিনিও সমর্থন করতেন। কিন্তু তিনি আর শতাব্দীর কতটুকুই বা দেখেছিলেন।—পড়তে পড়তে ক্লান্তি এলে চা বা কফির সন্ধানে Park Restaurant-এ যেতাম। আর একটি মিষ্টান্ন ভাণ্ডার-cum-রেস্তোরাঁ ছিল ম্যালের সংলগ্ন, তার নাম Tripty। পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান রায় এটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শুনেছি, এবং এর ম্যাগনাম-সাইজ সিঙ্গারা তাঁর নাকি বিশেষ প্রিয় ছিল। পার্করেস্তোরাঁ ও তৃপ্তি কোনোটাই আজকের দার্জিলিঙে নেই। Sic Transit ভ্রাম্যমাণ মাত্রেরই অভিজ্ঞতা।

ম্যালে অনেক পরিচিত ও অপরিচিত লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। তার মধ্যে দুজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একজন স্বনামখ্যাত সাংবাদিক শ্রীযুক্ত অমল হোম, অপরজন ম্যালের কাছেই, Step Aside যাওয়ার পথের মোড়ে প্রথম বাড়ী Wigwam-এর স্বত্বাধিকারী, বিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ চৌধুরী। অমিয়নাথ স্যর আশুতোষ চৌধুরীর ভ্রাতা এবং ভারতের প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ জে. এন. চৌধুরীর পিতা। এঁর দ্বিতীয় পুত্র ব্রিগাডিয়ার দিলীপ চৌধুরী বিশপ্স্ কলেজ স্কুলে আমার সহপাঠী ছিল। অমিয়নাথ চৌধুরী কেবল যে প্রথম শ্রেণীর ব্যারিষ্টারই ছিলেন তাই নয়; সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, প্রত্যেক বিষয়েই তাঁর নিবিড় পরিচয় ছিল। তখন তিনি

আইন ব্যবসায় থেকে অবসর নিয়েছেন। আমার সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল হয় ম্যালে বসে আমাকে বই পড়তে দেখে। তাঁর নিজেরও ওটা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাস।

দার্জিলিং উত্তর ভারতের হিল ষ্টেশনগুলির তুলনায় অনেক সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত হলেও আমার অনেক মধুর স্মৃতি এই অর্কিড-ফার্ণ ও ফগ্-সমৃদ্ধ শৈলনগরীর সঙ্গে জড়িত। প্রথম স্মৃতিটি দর্শনের নয়, প্রতীক্ষা ও আকুলতার। এই আকুলতা আমি বোধ করি মনীন্দ্রলাল বসুর "দার্জিলিং-এ" গল্পটি পড়ে। আগেই বলেছি যে, মনীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা' উপন্যাস "প্রবাসী"তে পড়ে হাজারিবাগে যাওয়ার কী আকুলতা আমি বোধ করেছিলাম।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, ভ্রাম্যমাণ হিসাবে আমাকে ভাগ্যবানই বলা চলে ; কারণ এক তাজমহল ও উলার হ্রদ ছাড়া সব প্রত্যাশিত স্থান ও নিসর্গ শোভা সব সময়েই আমাকে কল্পনার অধিক আনন্দ দিয়েছে। তাজমহল সম্বন্ধে আমার ধারণা ঠিক অল্ডস হাক্সলির অনুরূপ না হলেও আমার মনে হয়েছে ওতে আবেগের অভাব আছে। আগ্রা আমি আর পাঁচজনের মতোই উপভোগ করেছি এবং বিভিন্ন সময়ে এমন কি জ্যোৎস্না রাতেও তাজ দেখেছি। ভাল লাগেনি একথা বলবো না, তবে কখনো রবীন্দ্রনাথের 'তাজমহল' আবৃত্তি করতে উৎসাহ পাইনি। সম্ভবতঃ এটা আমার ত্রুটি, অন্ততঃ Inperfect Sympathy তো বটেই,—হয়তো বর্তমান যমুনার শ্রীহীনতাও খানিকটা দায়ী। হয়ত যখন যমুনার মেঘকজ্জল জলে আগ্রা দুর্গ ও তাজের ছায়া পড়ত, ভবনশিখীরা করত নৃত্য, তখন তাজ সন্দর্শনে রোমাঞ্চ হতো। কিন্তু তাই বা বলি কী করে? এক এটোয়া ও এলাহাবাদ ছাড়া যমুনা তো সর্বত্রই স্মৃতি মাত্র। এলাহাবাদের যমুনা দেখলে মনে হয় বটে চিরন্তন গোপবালা বিনোদিনী তার প্রিয়-প্রতীক্ষার স্থান নির্বাচনে ভুল করেনি। কিন্তু অন্যত্র? মথুরা-বৃন্দাবনে ত যমুনা আগ্রার চেয়েও শীর্ণা। কিন্তু সেখানে স্মৃতি ও কল্পনা এমন ভাবে সহযোগিতা করে যে, বৈষ্ণব কবিতা নিজের অজ্ঞাতসারেই মনে ভিড় করে আসে। অন্য প্রায় সর্বত্রই আমার অভিজ্ঞতা আমার প্রত্যাশাকে অতিক্রম করেছে, যেমন অক্সফোর্ডে জ্যোৎস্না-স্নাত মডলেন ব্রিজ (এখানে আমি Andrew Lang আবৃত্তি করি) ও টম কোয়াড (এখানে ও অক্সফোর্ডের প্রায় সর্বত্রই আমি আপন মনে Scholar Gipsy ও Thyrsis আবৃত্তি করি)। ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেক ডিষ্ট্রিকট্স্ আমাকে অভিভূত করে এবং স্কটল্যাণ্ডের Trossachs, Loch Lomond, Loch

Katrine ইত্যাদি লেকগুলি সৌন্দর্য্যে আমাকে স্তব্ধ করে' দেয়। সিলভার বার্চ্চ বেষ্টিত ইয়ারো নদী (He passed where Newark's stately tower, Looks out from Yarrow's birchen bower) দেখে আমি প্রৌঢ় বয়সেও চোখের জল সম্বরণ করতে পারিনি। বুঝলাম কেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ দীর্ঘদিন—এগারো বছর ত বটেই—ইয়ারোর জন্য প্রতীক্ষা করেছিলেন। প্রেম ও বেদনার স্মৃতি কোথাও কোথাও অক্ষয় হয়ে থাকে, অন্যত্র থাকেনা।

আমি গ্যাংটক যাই, সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদার অনেক অনেক আগে। ফেলুদা এ্যাণ্ড কোম্পানী যেমন অবলীলা ক্রমে শিলিগুড়ি থেকে ট্যাক্সি পেয়ে গেলেন সেটা আমাদের সময়ে অচিন্তনীয় ছিল। বস্তুতঃ দুইটি দুর্গম রাস্তার মধ্যে শিলিগুড়ি-গ্যাংটক রোড ছিল দুর্গমতর এবং সাধারণ ট্যাক্সিও যেমন শিলিগুড়ি তেমনি দার্জিলিঙে খুবই দুর্লভ ছিল। ভ্রমণকারীদের নির্ভরস্থল ছিল জিপ অথবা ষ্টেশন ওয়াগন। আমরা ছিলাম সাতজন, তাই একটা ষ্টেশন ওয়াগনে মোটের উপর আরামেই যেতে পেরেছিলাম। সঙ্গীরা ছিলেন আইনব্যবসায়ী। একজন সিকিমের এক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্যে একটি পরিচয়-পত্র এনেছিলেন। তখনকার সিকিম ছিল প্রায়-বিদেশ। ভারত-সিকিম সীমানা রংপোয় আমাদের একটি "পাশ" দেখাতে হতো। এবং এখনকার মতো বিলাসবহুল হোটেল দূরস্থান, তখন সেখানে কোনো হোটেলই ছিল না।

আমাদের থাকবার জন্যে দুটি কামরা পেয়েছিলাম। খাটের সংখ্যা ছিল কম, দুজনের ভূমিশয্যা নিতে হলো অগত্যা।

দার্জিলিং-গ্যাংটক পথের সৌন্দর্য্য সিমলা মানালির সঙ্গে তুলনীয়। সারা পথে তীব্র খরস্রোতা তিস্তার অতিঘনিষ্ঠ সখ্যতা বিপদমিশ্রিত রোমান্সের অনুভূতি এনেছে বারংবার।

গ্যাংটকে আমাদের সময়ে রাজপথ ছিল একটিই—সঙ্গত কারণেই তাকে বলা হতো প্যালেস রোড। তখন হিন্দী-চীনী ভাই-ভাইয়ের যুগ তাই নাথু-লা যাওয়ার কোনো বাধা ছিলনা (ভারত চীন সীমানা নাথু-লা গিরিবর্ত্ম) —কিন্তু নাথু-লা আমাদের যাওয়া হয়নি। আমাদের কেবল পরিচিত কাঞ্চনজঙ্ঘাকে আর একবার দেখে চলে' আসতে হলো। গ্যাংটকে কুয়াশা কম হওয়ার জন্য কাঞ্চনজঙ্ঘাকে নিকটতর বোধ হয়। গ্যাংটকের বৌদ্ধ মঠটিতে ঢুকে ঘুমের মঠটির কথা মনে হলো। ঘুমের মতোই দেয়ালে দেয়ালে

বুদ্ধের জীবনী থেকে নানা ঘটনার ছবি। সেই রকমেরই লালকাঠের দরজা, সারি সারি প্রদীপ জ্বালা, সেই রকমই ধূপের গন্ধ—। বুদ্ধ মূর্ত্তি ছাড়া অন্য মূর্ত্তি ও দেখলাম,—বোধ করি সারিপুত্র, মোগ্‌গলায়নের বা ঐ গোছের বুদ্ধের প্রিয় শিষ্যদের হবে।

গ্যাংটকে আমাদের আহারাদির ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ নিরামিষ। দুপুরে প্রচুর ঘি-সংযুক্ত অড়হর ডাল ও ভাত, সঙ্গে দুটি সব্‌জী—একটি আলু-কপি-মটর শুঁটির আর একটি বীন ও বেগুনের। আচারও ছিল এবং দুটি করে মিষ্টি। রাত্রেও তাই, তবে ভাতের পরিবর্ত্তে ঘিয়ে-ভাজা মোটা পুরী। এত ভালো খাওয়া হলে হবে কি,আমিষের জন্যে ভারী একটা আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল, হয়তো আমিষ বর্জ্জিত বলেই। এমনি আরেকবার হয়েছিল কোটাগিরিতে—নীলগিরির অন্যতম ও ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম হিল ষ্টেশন। নীলগিরিতে থাকার সময় যখন আমি নির্জ্জনতা চাইতুম কোটাগিরিতে গিয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে আসতুম। কোটাগিরি উটকামণ্ড বা কুনূরের চেয়েও নির্জ্জন। আর তার মাধুর্য্য শুধু নির্জ্জনতাতেই নয়, নীলে সবুজে অপূর্ব সংমিশ্রণে। বিরাট বিরাট সব গাছ প্রাচীন যুগের ও মানা'লির কথা মনে আনে। প্রত্যেকটি বাড়ীর ছাঁদ বিলিতি এবং অভিজাত বিলিতি। অবসর প্রাপ্ত সিভিলিয়ান ও সম্পন্ন কফি প্ল্যাটার্সদের অবসর যাপনের জন্য মিউটিনির প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এই কোটাগিরির পত্তন হয়। তখনও দক্ষিণ ভারতে ফরাসী ও ইংরেজের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। কিন্তু একটি কারণে কোটাগিরি পরিত্যক্ত হয়ে উটকামণ্ডই সরকারী হিল ষ্টেশন হিসেবে স্বীকৃতি পায়। যে-কারণে ফতেপুর সিক্রি পরিত্যক্ত হয় সেই কারণেই কোটাগিরি তার নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও তার প্রাপ্য মর্য্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়। তবে যথার্থ নির্জ্জনতা-প্রেমিকরা এখনো কোটাগিরিকে ভুলে যান নি। একজন অবসর প্রাপ্ত আই. সি. এস, শ্রীশঙ্করনাথ মৈত্র এখানে স্থায়ীভাবে বাস করছেন শুনেছি।

আমার সময়ে কোটাগিরিতে একটিই আশ্রয় ছিল এবং সেটি ছিল নিরামিষ। কোটাগিরি অবশ্য হরিদ্বার নয় যে, সীমানার মধ্যে কোথাও আমিষ পাওয়াই যাবে না। বাজার এলাকায় ছোট ছোট চায়ের দোকান ছিল,সেখানে ডিম সিদ্ধ পাওয়া যেত। কিন্তু ঐ পর্যন্ত; কারি, ষ্টু বা বিরিয়ানির ইচ্ছা হলে একটু অস্বস্তি বোধই হতো। শেষ পর্য্যন্ত আমি একটা সমাধান খুঁজে বের করি। কোটাগিরি থেকে উটি পাহাড়ী পথে পঁয়ত্রিশ মাইল।

সকাল দশটার বাসে গেলে সাড়ে এগারোটার মধ্যে উটি পৌঁছানো যেত। তারপর Charing Cross-এর কোনও একটি বিলিতি রেস্তোরাঁয় (তখনো ২।১টি অবশিষ্ট ছিল) পরিপাটি মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে, একটু উটি পরিক্রমা করে,' তারপর চারটার ফিরতি বাসে কোটাগিরি প্রত্যাবর্ত্তন। কিন্তু সেদিনের গ্যাংটকে এরূপ বিকল্প ব্যবস্থা সম্ভব ছিল না। আজকের গ্যাংটকে অবশ্য ও সমস্যাই নেই, তাই সমাধানের প্রশ্নও নেই। সব হোটেলই শুনেছি উৎকৃষ্ট আমিষ খাদ্য পরিবেশন করে, আর দার্জ্জিলিঙের তুলনায় নাকি দক্ষিণাও কম।

সারাণ্ডা ও ভাগলপুরের জঙ্গল বিভূতিভূষণের লেখনীর গুণে পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। হাজারিবাগ ও পালামৌর জঙ্গল তা করেনি। হাজারিবাগের জঙ্গলের উপর উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ আছে। তাতে ঐ জঙ্গলের ক্ষীয়মাণ আয়তন সম্বন্ধে দুঃখ বোধ আছে, দুঃখবোধ আছে হাজারিবাগের বাঘের প্রায় অবলুপ্তিতে। আজকের হাজারিবাগের জঙ্গলে ভয় বাঘের নয়, মানুষের থেকে—রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক খুন জখম ডাকাতির।

পালামৌ, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে উপেক্ষিত হলেও, তার একটি অবিসংবাদী আভিজাত্য আছে। সেটি বঙ্কিমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের দান। বাংলা-দেশে এমন কেউ বোধ হয় নেই, যে সঞ্জীবচন্দ্রের "পালামৌ" পড়েনি। নিঃসন্দেহে এটি বাংলাভাষায় সর্বাধিক পঠিত রম্যরচনা। বিগতযুগের আদিবাসী অধ্যুসিত পালামৌ এবং বহু স্মরণীয় মন্তব্য লেখাটির প্রাণ। ঋষি যে কেবল প্রতিবেশী ত্যাগী গৃহী, বন্যেরা যে বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে, গৃহে জল থাকলেও যে গ্রাম্যবধূ জল আনতে যায়, এসবই আমাদের স্মৃতি ও মানসের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। পড়ন্ত বেলার বিষাদ-মিশ্রিত আনন্দে রচনাটি চিরদিনের সোনালী রঙে রঙীন হয়ে আছে। "পালামৌ" পড়ে আমরা সবাই বলি "বেলা যায়", কিন্তু সে লালাবাবুর "বেলা যায়' নয়, অস্তগামী সূর্য্যের বিদায়ী আলোয় বন্য পরিবেশের সঙ্গে পুনঃপরিচয় ও আপোষরফার। Alexander Smith-এর Dreamthorp, Hazlitt-এর Winterslow, Francis Brett-Young-এর Winstanslow এবং John Moore-এর Brensham Trilogyর সঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রের "পালামৌ" নিঃসন্দেহে তুলনীয়।

গোমো থেকে ডেহরি-অন-সোন্ ('গৃহদাহে'র স্মৃতিবিজড়িত ডিহরি)

গ্র্যাণ্ডকর্ড লাইনে যাওয়া যায়। একটি বিকল্প রেলপথও আছে—বিখ্যাত বড়কাকানা লুপ এই পথে পড়ে। এই লুপের প্রায় সবটাই পালামৌ জেলায়। বিহারের একমাত্র শৈল নিকেতন নেতারহাটও পালামৌ জেলাতেই। এপথের বন্য পরিবেশের সৌন্দর্য্য সারাণ্ডা বা সিংভূমের জঙ্গলের চেয়ে কম নয় বলেই আমার বিশ্বাস, এবং একটি উপরি সুবিধা এই যে ট্রেনের নিরাপদ আশ্রয়ে বসে' এই সৌন্দর্য্য 'লুক্রেশিয়ান' পদ্ধতিতে উপভোগ করা যায়। আমি কেবল এই জঙ্গল দেখার আকর্ষণেই দু'বার এই রেলপথে গোমো থেকে ডেহরি গিয়েছি এবং ফিরতি ট্রেনে ফিরে এসেছি। এই রেলপথের ষ্টেশনগুলির নামও ভ্রমণরসিকদের পক্ষে লোভনীয়—যেমন, মহুয়ামিলন, ম্যাকল্যাস্কিগঞ্জ। ভারী পরিতাপের বিষয় যে এই অঞ্চল কোনো প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্যিককে প্রেরণা দেয়নি। অন্ততঃ প্রমাণাভাব। হাজারিবাগের পট-ভূমিতে সুবোধ ঘোষের কয়েকটি ভালো গল্প তাঁর "ফসিল" ও 'পরশুরামের কুঠার' বই দুটিতে আছে। কিন্তু ম্যাকলাস্কিগঞ্জ ও বড়কাকানার পটভূমিকায় যে কয়টি গল্প বাংলা সাহিত্যে দেখেছি তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ও ঐ পরিবেশের অযোগ্য মনে হয়েছে।

ম্যাকল্যাস্কিগঞ্জও অবশ্যই এখন স্মৃতিমাত্র। একটি সম্প্রদায়ের উন্নত ও সুন্দর জীবন যাপনের সমবেত প্রয়াস কেন ব্যর্থ হলো এবং কেনই বা ম্যাকলাস্কিগঞ্জের অসংখ্য এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবার অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে আশ্রয় নিল, তার উত্তর সংবাদপত্রে অথবা সরকারী বিবরণে নেই। ম্যাকলাস্কিগঞ্জের জনহীন পথ ও বাসিন্দাহীন প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা ও ফলের বাগানওয়ালা বাড়ীগুলি দেখলেই বোঝা যায় এটি একটি পরিত্যক্ত জনপদ। ইংরেজ আমলে না কি এর চেহারা ইংলণ্ডের যেকোনো মফঃস্বল শহরের—বাথ, চেল্টেনহাম বা লীড্‌স্—মতোই ছিল। তেমনি ঝকঝকে তকতকে রাস্তা ঘাট। মোড় মোড়ে ডিপার্টমেণ্ট ষ্টোর আর টী-রুম্‌স্; একাধিক ড্যান্স-হল। এবং সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় ছিল একটি হাইষ্ট্রীট। যদুপতিদের মথুরা ও রঘুপতিদের উত্তর কোশল যে পথে গেছে সে আমলের ম্যাকল্যাস্কি-গঞ্জ ও সেই পথেই গেছে। এখন তার কঙ্কালটুকু অবশিষ্ট।

তবু ম্যাকলস্কিগঞ্জের সেই কঙ্কালই আমায় আকৃষ্ট করেছিল। ওখানকার একমাত্র আশ্রয়স্থলী "গেষ্টহাউস" এর পরিচালিকা মিসেস কার্নি একজন স্মরণীয় মানুষ এবং তখনই প্রায় কিংবদন্তী হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তিনি একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা, স্বামী ছিলেন তৎকালীন বেঙ্গল

নাগপুর রেলে উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ম্যাকলাস্কিগঞ্জ উপনিবেশটির এঁরাই অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। স্বামী দ্বিতীয় যুদ্ধে মারা যাওয়ার পরে নিজের ভরণ-পোষণের জন্যে মিসেস কার্নি এই অতিথিশালাটি স্থাপন করেন। এরূপ দ্বিতীয় আরেকটি অতিথিশালা গোটা ভারতবর্ষে আর নেই। আয়োজন কিছু অসাধারণ নয়—কিন্তু গেষ্টহাউসটি তার স্বকীয়তা অর্জ্জন করেছে কেবল মিসেস কার্নির অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক অতিথিবৎসলতার গুণে। তাঁর অতিথি হওয়া মানেই তাঁর নিকটাত্মীয়ের মর্য্যাদা ও সমাদর লাভ করা। এবং তাঁর সস্নেহ ব্যবহার তাঁর রন্ধনকুশলতার মতোই অবিস্মরণীয়। এরই আকর্ষণে পর্য্যটকমাত্রকেই অন্ততঃ আরেকবার এখানে আসতেই হয়। এককালে চুনারের স্বাস্থ্যনিবাসের আতিথেয়তা আন্তরিকতায় মিসেস কার্নির সঙ্গে তুলনীয় ছিল। কিন্তু তা এরকম উচ্চ মানের ছিল না। মিসেস কার্নি সেই রকম মহিলা যাঁকে দেখলেই মনে হয়—ইনি আমার কোনো নিকটাত্মীয়া হলে খুব ভালো হতো।

ম্যাকলাস্কিগঞ্জে আমি দশদিন ছিলাম। মিসেস কার্নি প্রথম দিকে ছিলেন না, কিন্তু এমনি নিখুঁত তাঁর ব্যবস্থা যে আমাদের কোনোই অসুবিধা হয়নি। বলতে ভুলে গেছি, মিসেস কার্নি প্রচলিত অর্থে খ্রীষ্টান নন। উনি Watch-tower Societyর সদস্য, যারা যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাশীল কিন্তু আনুষ্ঠানিক খ্রীষ্টধর্মে নয়। ইহুদিদের মতোই এঁরাও বিশ্বাস করেন Second Coming-এ, অর্থাৎ বিশ্বত্রাতার ভবিষ্যৎ অভ্যুত্থানে। Second Coming সম্বন্ধে কবি ইয়েট্‌স্-এর একটি মর্ম্মস্পর্শী কবিতা আছে যার প্রথম দুটি পংক্তি পৃথিবী সুদ্ধ লেখক আবৃত্তি করে,—"Things fall apart, centre can not hold, Mere anarchy is loosed upon the world"। ওয়াচ্-টাওয়ার সোসাইটি অবশ্য বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাসী ও আগ্রহী। মিসেস কার্নির মতো মানুষ যে-সংস্থার সদস্য তার প্রতি স্বতঃই শ্রদ্ধা অনুভব করলাম।

ম্যাকলাস্কিগঞ্জের গেষ্ট হাউসের পিছনেই জঙ্গল। অবশ্য খুব ঘন নয়, জঙ্গলের মধ্যে কিছু ঘর বাড়ী আছে। একটি রোমান ক্যাথলিক প্রার্থনা-গৃহও আছে। সেটি চ্যাপেল না চার্চ্চ স্মরণ করতে পারছি না। একটি বাড়ীতে থাকতেন শ্রীমতী সুনীতি চৌধুরী, যিনি ব্রিটিশযুগে কুমিল্লার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে গুলি করতে গিয়ে ধরা পড়েন। ওঁর সহকর্মিণীর নাম বোধহয় শ্রীমতী শান্তি ঘোষ। বর্তমানে এঁরা উভয়েই জীবনের শেষ প্রান্তে।

ম্যাকলাস্কিগঞ্জের জঙ্গলে মাইল দুয়েকের বেশী যাওয়া যেত না।

নিরাপত্তার অভাবে নয়, পথের অভাবে। রাঁচীগামী বাস বা ট্যাক্সি বিপরীত দিক দিয়ে যায়। জঙ্গলের মধ্যে পায়েচলা পথও বেশী দূর নেই, ফলে পথ-হারানোর আশঙ্কা পদে পদে। তবে গাছগুলির সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। সঞ্জীবচন্দ্র পালামৌ অঞ্চলে দেখেছিলেন শাল-তাল-তমাল-হিন্তাল—সম্ভবতঃ অনুপ্রাসের খাতিরে। শাল গাছই মেজরিটি সম্প্রদায়। অর্জ্জুন ও শিশু গাছও প্রচুর। ফুলের মধ্যে মহুয়া, পুটুস্, ফুল দাওয়াই ও জীরহুলের সমারোহ। শেষের দুটি নাম স্থানীয়, ফুল দুটিও পালামৌর বৈশিষ্ট্য। ফুল দাওয়াই টক্‌টকে লাল, কতকটা রক্তকরবীর মতো, তবে অনেক ছোট ছোট। আর জীরহুল ইংলণ্ডের ভায়োলেটের কথা মনে করিয়ে দেয়, যে-ভায়োলেট লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতেই ভালোবাসে এবং যার সঙ্গে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ লুসির তুলনা করেছিলেন। রাঁচীর পথে কৃষ্ণচূড়াও আছে কিন্তু জঙ্গলে দেখেছি মনে হয় না। মিসেস কার্নির কম্পাউণ্ডে অনেকগুলি ইউক্যালিপটাস গাছ ছিল। সেই গাছগুলির সঙ্গেও সখ্যতা জন্মেছিল আমার। ম্যাকলাস্কিগঞ্জের সেরা সময় ডিসেম্বর জানুয়ারী। কিন্তু আমরা অক্টোবরেও কম আনন্দ পাইনি। সকালে বেড-টি খেয়েই জঙ্গলে যেতাম। পথে ছোট চায়ের দোকানে আরেক প্রস্থ চা হতো। জঙ্গলে যাওয়ার একটা সমস্যা ছিল, একটা সাঁকো পার হ'তে হতো। কোনো রকমে পার হতাম। ফিরে এসে মিসেস কার্নির এলাহি ব্রেকফাস্ট—পুরী, আলুর তরকারী, রুটি, ডিম, কিছু ফল এবং চা বা কফি—আমাদের ক্লান্তি অপনোদন করতো। তার পর অনেকক্ষণ নির্জ্জনতা উপভোগ। বইপড়া, নির্জ্জনতা উপভোগ, সূর্যোদয় সূর্য্যাস্ত দর্শন —এসবই এক পর্য্যায়ের আনন্দ। ড্যানিয়েল জর্জ্জের ভাষায়—Lonely pleasures। হিলষ্টেশনগুলির বাইরে ম্যাকলাস্কিগঞ্জই সেই বিরল স্থান যেখানে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে Lonely pleasures আস্বাদন করা যায়। আর হটাৎ যদি একটু নাগরিক উত্তেজনা আস্বাদনে প্রলোভন হয়—সকাল সাড়ে সাতটার বাসে রাঁচী গিয়ে চারটের বাসে ফেরা যায়। তবে "আরণ্যক"-এর সেই মুহুরীবাবু যেমন ভাগলপুরে গিয়ে স্বস্তি পেতেন না, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব জঙ্গলে ফিরে আসতেন, আমরাও তেমনি রাঁচী গিয়ে ভারী অতৃপ্তি বোধ করতাম। ম্যাকলাস্কিগঞ্জের সেই ইউক্যালিপ্‌টাসকীর্ণ আশ্রয়গৃহে ফেরার জন্য ব্যাকুলতা বোধ করতাম, যেখানে মহুয়া, পুটুস, ফুলদাওয়াই, মনরঙ্গোলী ইত্যাদি নানা বর্ণের ফুল পথে পথে অপেক্ষা করতো আমাদের—যেমন অপেক্ষা করতো স্থানীয় রেলষ্টেশন ও ষ্টেশন মাষ্টার।

'বকালে ছায়াঘন ষ্টেশনটির কোনও একটি বেঞ্চে বসা, কলকাতাগামী (অর্থাৎ গোমোগামী) ডাউন প্যাসেঞ্জারটির আগমন প্রতীক্ষা করা, একটু আধটু চা-পান (ষ্টেশনের চায়ের ষ্টলটিও মিসেস কার্নির পরিচালিত), আর ষ্টেশন মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে আলাপন, এ আমাদের নিত্য কর্ম্ম ছিল। মাষ্টার-মশাইটি একটি স্মরণীয় চরিত্র। বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। অকৃতদার কিন্তু অনেকগুলি পোষ্য—তার মধ্যে বিধবা মা ও বিধবা বোন বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ম্যাকলাস্কিগঞ্জের অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সমান ওয়াকিবহাল। তবে তাঁর আসল বৈশিষ্ট হলো যাত্রীদের জন্য আশ্রয় ইত্যাদি সংগ্রহে তাঁর অক্লান্ত উদ্যম। মিসেস কার্নির গেষ্টহাউসটি ছোট, অনেক সময় যাত্রীদের অন্যত্র আশ্রয়ের সন্ধান করতে হতো। তখন ঐ ষ্টেশনমাষ্টারমশাই কখনো স্থানীয় অধিবাসীদের গৃহে, কখনো কলকাতা-নিবাসী গৃহস্বামীর চাবিবন্ধ গৃহে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে' দিতেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রে মালি বা কেয়ারটেকারকে দিয়েই তিনি ঘর খুলিয়ে দিতেন—তবে আসল চাবিকাঠি ছিল তাঁর কাছেই, তাঁর হৃদয়ে। ব্যক্তিগত চার্ম্ম্ যা বিশ্লেষণ করা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়, তা ম্যাকলাস্কিগঞ্জে অনেক দেখেছি—ওঁর মধ্যেও দেখেছি। ওঁর কোয়ার্টার্স্ ছিল ষ্টেশনের কাছেই। একদিন ওঁর বাড়ীতে চা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু ওঁর অসুবিধা হবে মনে করে' সে আমন্ত্রণ আমরা ইচ্ছা করেই গ্রহণ করিনি। তবে ওঁর অফিসে বসে চা খাওয়ার স্মৃতি ম্যাকলাস্কিগঞ্জের স্মৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। বলা নিশ্চয়ই বাহুল্য যে ম্যাকলাস্কিগঞ্জের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন মিসেস কার্নি। বর্ত্তমানেও যেসব এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পরিবার সেখানে আছে, তারাও পর্য্যটকদের মতো এই মাতৃস্বরূপা মহিলাকে তাদের সকলের পরিবারভুক্ত মনে করে। উনি নিজেও তাই করেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মিসেস কার্নি তাঁর গেষ্ট হাউস থেকে এক পয়সাও লাভ করেন না। এই সেদিন, ১৯৭৩ সালেও, মাত্র পনেরো টাকা দক্ষিণায় উনি আমাদের যে-পরিমাণ চিকেন কারি, চিকেন রোষ্ট, ও বিরিয়ানী খাওয়াতেন (পুডিং ও কেকের কথা ছেড়েই দিলাম) তাতে আমরা অনেক সময় আশ্চর্য্য বোধ করেছি। আমরা আবার একটা অসঙ্গত অনুরোধও করেছিলাম তাঁকে। তাও তিনি হাসিমুখে রেখেছিলেন। সেই কথাটা বলি।

মিসেস কার্নির বৈকালিক চা-টা তাঁর অন্য তিন প্রহ আয়োজনের (অর্থাৎ ব্রেকফাষ্ট, লাঞ্চ ও ডিনারের) সঙ্গে এক পর্য্যায়ের ছিল না। কেবল চা বা

কফি, সঙ্গে কিছু ক্রীমক্র্যাকার বিস্কুট। জলহাওয়ার গুণে বেশ ক্ষুধা বৃদ্ধি অনুভব করায় আমরা মিসেস কার্নিকে সসঙ্কোচে বললাম, ঐ বৈকালিক চা-তেও অতিরিক্ত ভোজ্যের আয়োজন হলে' আমরা অতিরিক্ত দক্ষিণা সানন্দে দিতে প্রস্তুত। সেই দিনই বিকেলে দেখি, বৈকালিক কফির সঙ্গে বিস্কুটের অতিরিক্ত এক প্লেট ভরতি গরম সিঙ্গারা—অন্ততঃ পঁচিশ ত্রিশটা। পরের দিন দেখি ডালপুরী আর আলুর দম। তার পরের দিন ষ্টাফ্‌ড্‌ পটেটো। এই রকম চললো। চলে আসার দিন দেখি বিলে দৈনিক পনেরো টাকার অতিরিক্ত এক পয়সারও উল্লেখ নেই। মিসেস কার্নির কাছে সেকথা উল্লেখ করে বললাম যে হিসাবে সম্ভবতঃ ভুল হয়েছে। ওটা তোলা হয়নি। মিসেস কার্নি বল্লেন, কোনো ভুল হয়নি। তোমাদের সামান্য আনন্দ দিয়ে আমি কত বেশী আনন্দ পাই তা জানলে তুমি টাকার কথা বলতে না। তোমাদের তো মনোমত কিছুই খাওয়াতে পারলুম না।—আমি একেবারে অভিভূত হয়ে গেলাম এই প্রায়বিস্মৃত ভাষা শুনে। ঠিক এই রকম কথা মা বলতেন যখন বিলাসপুর থেকে কলকাতায় আসতাম। ঠিক এমনই কথা বোধ হয় চিরদিনের মা আর দিদিরা বলেও এসেছে, কিন্তু আজকালও কি বলে?

মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তাঁর শেষ ইচ্ছা কি। তিনি না কি বলেছিলেন, "কাশ্মীর, কেবল কাশ্মীর।" ইংরেজ কবি টমাস মূর কাশ্মীরে না এসেও কাশ্মীরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে তাঁর জীবনের অনেক-খানি কাটিয়েছেন,—যার ফলশ্রুতি Lalla Rookh। কাশ্মীর পৃথিবীর অন্যতম শাংগ্রি-লা বা স্বপ্নরাজ্য—কাপ্রির চেয়ে আয়তনে অনেক বড় আর রিভিয়েরার চেয়ে অনেক বেশী সাধারণের আয়সাধ্য স্থান। আমার এক ইংরেজ বন্ধু John Argles (এঁকে কলকাতায় অনেকেই চিনবেন) আমার সঙ্গে একবার কাশ্মীর গিয়েছিলেন। উনি আমাকে সেদিন লিখেছেন, লণ্ডনের পথে ও পার্কে প্লেন-গাছ (Plane tree) দেখলেই ওঁর কাশ্মীরের কথা মনে পড়ে। Plane tree-র সঙ্গে কাশ্মীরের চেনারের সাদৃশ্য হয়তো আরও অনেকে লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু জনের মতো কেউ আমাকে সচেতন করেন নি-।

কাশ্মীর যাওয়ার পরে বিখ্যাত লেখিকা Rummer Godden-এর সঙ্গে ও আমার পত্রালাপ হয়। উনি একথা সেকথার পর লেখেন যে মাছরাঙা পাখী দেখলেই ওঁর কাশ্মীরের কথা মনে পড়ে—মাছরাঙা আর ওয়ালনাট্‌। ওয়ালনাটের কথা সহজেই বোঝা যায়, কারণ শ্রীনগরে প্রতিপদক্ষেপেই

ওয়ালনাটের ও ওয়ালনাট-প্রস্তুত আসবাব সামগ্রীর বিক্রেতারা চোখে পড়ে। কিন্তু ঝিলম নদীর তীরে, সন্ধ্যা বা সকাল যেকোনো সময়, মাছরাঙার প্রাচুর্য্য আমি অন্ততঃ লক্ষ্য করিনি। কিছু মাছরাঙা নিশ্চয়ই দেখেছি কিন্তু সেতো বিভূতিভূষণ ইছামতীতেও দেখেছেন। সন্ধ্যাবেলা ঝিলমের বাঁকা স্রোতটুকু চোখে পড়লেই মনে পড়তো, আমরা আর ইছামতী, কোপাই বা অজয়ের দেশে নেই।

তবে মাছরাঙা লক্ষ্য না করা, সম্ভবতঃ আমারই ত্রুটি। কারণ কাশ্মীরের প্রতীকগুলি সবই ওখানকার উডকাটে ও কাঠের আসবাবে খোদাইকরা দেখা যায়, যেমন দেখা যায় ওখানকার শালের এমব্রয়ডারি। চেনার বাগ, ডাল লেক ও ঝিলমের শিকারাওয়ালারা সবাই সিল্ক ও শাল ব্যবসায়ীদের এজেন্ট। প্রসঙ্গক্রমে বলি, কাশ্মীরের এই শিকারাওয়ালারা ভেনিসের গণ্ডোলাচালকদের (যাদের Gondolier বলে) কথা মনে আনে এবং পরোক্ষে বায়রণের Childe Harold-এর বর্ণনা। মোগল বাদশারা প্রজাদের উপর হয়তো অনেক অত্যাচার উৎপীড়ন করেছেন, কিন্তু তাঁরা যে সৌন্দর্য্যভূমি কাশ্মীর সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করেন এজন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। ইংরেজ সরকার অন্য হিল ষ্টেশনগুলির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং পহলগাম ও গুলমার্গের আকর্ষণও অনেক বৃদ্ধি করেছিলেন—কিন্তু শালিমার-বাগ ও নিশাতবাগ মোগল সম্রাটদেরই স্মারক।

মাছরাঙা যে কাশ্মীরের অন্যতম প্রতীক একথা বলেছি। অন্য প্রতীকগুলি বুলবুল (কাশ্মীরে ইরানীয় প্রভাব লক্ষণীয়), পদ্মফুল, iris আর চেনারের পাতা। সুইজারল্যাণ্ডের মতোই কাশ্মীর একটি বিরাট উদ্যান। সংখ্যাতীত হ্রদ আর নদী। জল প্রায়ই পাহাড়ের বরফগলা জল। আপেল বাগান আর অজস্র ফুল—যার তুলনা ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ডে মেলে। পাহাড়ী ফুলগুলির মধ্যে বেশী চোখে পড়ে gentian ও primula। সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে আরেকটি মিল এখানকার edelweiss। Edelweiss পর্বতগাত্র ছাড়া জন্মায় না এবং এর ফুলগুলি সাদা। ষ্ট্র্যাটফোর্ডে Avon নদীর তীরে যেমন উইলো গাছের প্রাচুর্য্য, কাশ্মীরের হ্রদগুলির তীরেও তেমনই দেখা যায়। এই উইলো গাছেই নাকি মাছরাঙাদের বাসা। ষ্ট্র্যাটফোর্ডের সঙ্গে আরেক মিল এখানে mulberry গাছের প্রাচুর্য্য। মালবেরীর সঙ্গেই হানিসাক্‌ল্ লতা ও গোলাপের সমারোহ।

(ক্রমশ)

ফকীরমোহন সেনাপতি

আত্মজীবনচরিত

মূল ওড়িয়া থেকে অনুবাদ : দিলীপকুমার বিশ্বাস

৮

উৎকলের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ (১৮৬৬)

হালম্ সাহেবের সহানুভূতি লাভ করে সুখ, আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে স্কুলের কাজ করতে লাগলাম। স্কুল ছুটির পর অনেক সময়ে তাঁর সঙ্গে সাহিত্যবিষয়ক আলাপ হত। আমি তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী হলেও উক্ত মহানুভব ব্যক্তি আমার সঙ্গে পরমাত্মীয়ের মতই ব্যবহার করতেন।

এই সময়ে ওড়িশায় খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল। এই প্রসারের অন্যতম বা বিশেষ কারণ উৎকলের তদানীন্তন ভীষণ দুর্ভিক্ষ। নবম অঙ্কে[১] (বা ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে) এই লোমহর্ষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আজও সেই নিদারুণ ঘটনার স্মৃতি জনসাধারণের মন থেকে মুছে যায় নি। একবৎসরের মধ্যে এই দুর্ভিক্ষে তিরিশ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। এর দরুণ দেশের প্রায় ছ'আনা পরিমাণ লোকের বংশ লোপ পেয়েছে—তার মধ্যে অনেক মৃত,—অবশিষ্ট নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে হারিয়ে গেছে। আমার বয়স তখন তেইশ বছর। আমি বালেশ্বর মিশন-স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলাম। তারপর থেকে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর কেটে গেল। কিন্তু সে-সময়কার ঘটনাগুলির স্মৃতি এখনো আমার হৃদয়পটে অম্লান হয়ে আছে।

ভাদ্রমাসে চারদিন প্রবল বৃষ্টিপাত হয়ে বর্ষা বন্ধ হয়ে গেল। ভাদ্র গেলে আশ্বিনের সুরু থেকে লোকে জলের জন্য কাতরভাবে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। কারও মুখে অন্য কোন কথা শুনতে পাওয়া যায় না—খালি 'জল! জল!' কার্তিক মাস আরম্ভ হতেই লোকের মন দারুণ নিরাশায় ভেঙ্গে পড়ল। এখন বৃষ্টি হলেও আর রক্ষা নেই। ধানগাছ সব মরতে আরম্ভ করেছে। বালেশ্বর জেলার একমাত্র ফসল ধান। এর উপর লোকের জীবন নির্ভর করে। ধানগাছগুলি শুকিয়ে শুকনো ঘাসের সামিল হয়ে গেছে। কিছুবা আধাআধি বেরিয়েছে, কিছু বা পুরোপুরি কিন্তু সবগুলিই বেঁটে বেঁটে, সাদা সাদা, বুনো আখের ডগার মত হাওয়ায় এদিক ওদিক দুলছে। লোকে

গরু বাছুর সব ক্ষেতের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু গরুগুলো ধানগাছ এক-একবার শুঁকেই মুখ ফিরিয়ে চলে যায়—খায় না।

আমার বাড়ী থেকে দক্ষিণে আধমাইল গেলেই বালেশ্বর সহরের লোক-বসতি শেষ। সেখান থেকে দিগন্তবিস্তীর্ণ একটানা ধানক্ষেত। মাঝে মাঝে সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপের মত এক-একটি গ্রাম জেগে আছে। প্রতিদিন সকাল নয়টায় স্নান সেরে একটি কম্বলের আসন বগলে একলা সেই ধান ক্ষেতে প্রবেশ করি। ক্ষেতের মধ্যে কোন জায়গায় আসনটি পেতে বসে মানুষের প্রাণরক্ষার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই।

দিন-মজুরেরা তাদের কাঁসা-পিতলের বাসন-কোসন এক-আধখানা যা ছিল তাই বেচে যতদিন পারল চালাল। কার্তিকের শেষাশেষি ঘর ছেড়ে যে যে-পথে পারল পালাল। স্বামী-স্ত্রী, বাপ্-ছেলে কারও সঙ্গে কারও দেখা নেই। দরজায় দরজায় ঘুরে যে-যার ভিক্ষা করছে। কার বা ঘরে চাল আছে যে ভিক্ষা দেবে!

চাষীরা অবস্থানুসারে প্রথমে কাঁসা-পিতল, গরু-বাছুর, সোনারূপো যার ঘরে যা ছিল বিক্রী করে মাঘ-ফাল্গুন পর্যন্ত দাঁত কামড়ে ভিটে আঁকড়ে পড়ে রইল। সে-সময়ে একটা বলদের দাম হয়েছিল এক গৌণী[২] থেকে পাঁচ গৌণী পর্যন্ত ধান—একটা গাই বিকোচ্ছিল এক গৌণী কি দু'গৌণী ধানে। সোনা রূপো ওজন করবার নিক্তি বা কোথায়—নিক্তি খোঁজবার তরটুকুও কারও সহ্য হয় না। দরদামের হিসাবই বা করে কে? যত গৌণী ধান বা চাল বিনিময়ে পাওয়া গেল—তাই সই। অনেক মধ্যবিত্ত লোক কোমরে টাকা গুঁজে গ্রামে গ্রামে ধান চাল খুঁজে বেড়াচ্ছে। ধান তো নেইই—যার বা যা ছিল সব লুকিয়ে ফেলেছে।

ফাল্গুনের শেষাশেষি দেখা গেল চাষীদের অধিকাংশ এবং কারিগরশ্রেণীর প্রায় সকলেই যে যার কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা পাচ্ছে-চিবোচ্ছে। তেতুঁল গাছে নূতন কচি পত্রোদ্গম হওয়া মাত্র এক-এক গাছে দশ-বিশজন চড়ে বানরের মত সেই সব পাতা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। যার দিকেই তাকানো যায়—অস্থিচর্মসার চেহারা, চক্ষু কোটরগত। অনেক ভদ্রঘরের বৌ-ঝি দু-তিন হাত ঝুলের শতগ্রন্থিযুক্ত এক-একখানি ন্যাকড়া কোমরে জড়িয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। মাতৃত্বের চিহ্ন শুষ্ক চর্মবৃন্ত দুটি তাদের বুকে দোলে। এদের কারও কারও কোলে অস্থিচর্মসার শিশু সেই চর্মময় স্তন মুখে দিয়ে ঝুলে আছে—জীবিত কি মৃত বোঝা যায় না। চৈত্রমাস থেকে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমে ক্রমে

বাড়তে লাগল। পথে, ঘাটে, জঙ্গলে, পুকুরপাড়ে যেদিকে তাকানো যায় মৃতদেহের ছড়াছড়ি।

সে-সময়ে উৎকলের পরম বন্ধু ও সহায় রেভেন্‌শ সাহেব সম্ভবতঃ নূতন কমিশনার পদে নিযুক্ত হয়ে এসেছেন।[৩] সেপ্‌টেম্বর কি অক্টোবর মাসে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে কমিশনার সাহেবের কাছে এই মর্মে চিঠি এল যে অনাবৃষ্টিহেতু ওড়িশায় দুর্ভিক্ষ হবার খুব সম্ভাবনা; অতএব প্রজাদের জীবন-রক্ষার জন্য সরকারের তরফে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবার প্রয়োজন আছে কি না? প্রয়োজন থাকলে, কি ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে? সরকারী চিঠির যথাযোগ্য উত্তর দেওয়ার জন্য কমিশনার সাহেব কাছারির সমস্ত আমলাকে নিয়ে পরামর্শ করতে বসলেন। দুই সেরেস্তাদার বললেন: "ওড়িশাতে দুর্ভিক্ষ হয় তো হোক—কোন চিন্তা নেই। মফঃস্বলের জমিদার-মহাজনের ঘরে যথেষ্ট ধান মজুত আছে। তাতে এক বছর বেশ চলে যাবে।" সেরেস্তাদারেরা যখন আগেভাগেই এমন কথা বলে বসেছেন—তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য পেশকার বাবুদের তো কিছু বাড়িয়ে বলতেই হবে। সুতরাং খাস কমিশনার সাহেবের পেশকার বললেন, "গোপালপুর মৌজার জমিদার-বাড়ীতে দশটা মরাই ভর্তি পঞ্চাশ হাজার ছালা ধানের স্তূপ পড়ে আছে। ভীমপুরের শ্যাম সাহুর গোলা থেকে অনায়াসে আরও চল্লিশ হাজার বস্তা পাওয়া যাবে। এ ছাড়া ছোটখাট মহাজনদের ঘরে তো ধান ভর্তি। কেবল এরাই যদি একবার গোলা খুলে দেয় অন্ততঃ দু'মাসের মত অবস্থা সামলে দিতে পারে।" পলিটিকাল এলাকার পেশ্‌কারবাবু আবার পঞ্চাশ হাজার ছালারও উপরে উঠে লোকেদের ঘরে লক্ষ লক্ষ বস্তা ধান মজুত থাকার হিসাব দাখিল করলেন। আর নিম্নপদস্থ আমলারা যা বললেন তাতে জানা গেল ওড়িশায় যে পরিমাণ ধান মজুত তার সীমা-পরিসীমা নেই—তাতে একবছরের সংস্থান হতে পারে। কাজেই কমিশনার গভর্ণমেণ্টকে উত্তরে লিখলেন: "ওড়িশায় দুর্ভিক্ষের আশংকা আছে বটে, কিন্তু দেশে প্রচুর ধান মজুত—তাতে একবছর বেশ চলে যাবে।"

কমিশনার সাহেব বড় ভুল করলেন। ওড়িশায় প্রকৃতপক্ষে এত ধান মজুত আছে কিনা; আবার যাদের ঘরে এই ধান সঞ্চিত, সাধারণ সংকটকালে তারা তা বিক্রয় বা বিতরণ করবে কিনা—এইসব বিষয়ে ভালকরে তদন্ত করে গভর্ণমেণ্টকে জানানো উচিত ছিল। কিন্তু বিধিলিপি যেখানে উৎকলের তিরিশলক্ষ অধিবাসীর বিনাশ এবং বিপর্যয়,—সে অবস্থায় কমিশনারের সুবুদ্ধি

আসবে কোথা থেকে ?

ফাল্গুনের সুরু থেকেই লোক মরতে আরম্ভ করল। মৃত্যু সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলল। রাস্তাঘাট, নদীতীর, মাঠ, বন যেদিকেই তাকানো যায় সেদিকেই মড়া পড়ে থাকতে দেখা যায়। ক্রমশঃ সমস্ত দেশটা যেন মৃতদেহে ছেয়ে গেল।

চালের দর হয়ে গেল টাকায় দশসের। তিন-চার দিনের জন্য টাকায় তিন সেরও হয়েছিল—তাও সহর অঞ্চলে পাওয়া যায় নি। তিন-চারদিন পরে রেংগুন থেকে চাল আসায় আবার সেই দশ সেরেই দাঁড়াল। দুর্ভিক্ষের আগের বছরে ধান টাকায়,বালেশ্বরী ওজনে, প্রায় দেড়শ সের.ও চাল টাকায় দেড় মণ পাওয়া যেত। সেই চাল দুর্ভিক্ষের বছর টাকায় দশ সের বিক্রী হওয়ায় লোকের এমন দুর্দশা ঘটল। সহরে তবু চাল কিছু পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে একেবারেই অপ্রাপ্য। গ্রামে যাদের ঘরে ধানচাল ছিল তারা তা লুকিয়ে ফেলল; অধিকাংশ লোক ঘরের মেজেতে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে রাখল।

মার্চ বা এপ্রিল মাসে কমিশনার সাহেব ওড়িশার তৎকালীন প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে ধানচাল পাঠাবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করলেন। গভর্ণমেণ্ট সম্ভবতঃ কমিশনারের পূর্বপত্রের কথা মনে রেখেই টেলিগ্রামে জবাব দিলেন: "তুমি চাল পাঠাবার জন্য টেলিগ্রাম করেছ, কিন্তু চাল তো টেলিগ্রামে পাঠানো যায় না।"

বর্তমানে কলকাতা থেকে পুরী পর্যন্ত যে সুন্দর ট্রাংক্ রোড্ দেখা যায়, সে-সময়ে সরু গলিপথের মত তার সামান্য চিহ্নমাত্র ছিল। সে-টুকুও আবার জঙ্গলে পূর্ণ ও চোর-ডাকাত উপদ্রুত। সুতরাং স্থলপথে ধানচাল আসবার কোন উপায় ছিল না। এদিকে নিমক-মহল উঠে যাওয়ায় বালেশ্বরের স্থানীয় সমুদ্রগামী জাহাজের বংশও বিলুপ্ত। বালেশ্বরবাসী কলের জাহাজের নামই কেবল শুনেছিলেন স্বচক্ষে তা কখনও দেখেন নি। যাই হোক সরকার কলকাতা থেকে বড় বড় মানোয়ারী জাহাজ ভাড়া করে রেংগুন ও বাঙ্লা-দেশ থেকে চাল পাঠাতে লাগলেন। সরকারের তরফে স্থানে স্থানে অন্নছত্রও খোলা হল।

অন্নছত্র খোলার খবর গ্রামাঞ্চলে রটে যাওয়া মাত্র অন্নক্লিষ্ট কাঙালীরা দলে দলে সহরমুখী ছুটল। প্রায় পনের-কুড়িদিন যাবৎ অন্নের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই—কচি পাতা ও অখাদ্য ফলমূল খেয়ে কোনক্রমে বেঁচে আছে।

চারটি ভাতের আশায় তারা সহরে এল। কিন্তু এত দূরপথ চলবার তাদের শক্তি কোথায় ? আন্দাজ দশ-বার আনা পরিমাণ লোক তো পথেই মরল। যারা কোনরকমে অন্নছত্র পর্যন্ত হেঁটে আসতেও বা পারল তারা মাত্র একবার করে ভাত খেয়েই কেউ বা ভেদবমিতে কেউ বা আমাশয়ে শেষ হল। তাদের পেট গিয়েছিল অন্নাভাবে শুকিয়ে। সামনে ভাত দেখে যে যত পারল পেট বোঝাই করে গিলল। হজম-শক্তি বিলুপ্ত—এত ভাত পেটে সইবে কেন ?

শুষ্কোদর কাঙালীদের চিকিৎসার জন্য এদিকে ডাক্তার উপস্থিত। সরকার বস্তা বস্তা সাগুদানা কলকাতা থেকে আনিয়ে অন্নছত্রে গুদামবন্দী করে রেখেছেন। কাঙালীদের প্রথম কয়েকদিন কেবল সাগু দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। প্রায় সব কটাই গেল।

অন্নছত্রের চারদিকে এবং সহরের অন্যত্র রাস্তাঘাটে যে সব মৃতদেহ পড়ে থাকত—সকাল থেকে মেথরেরা সেগুলিকে গরুর গাড়ীতে বোঝাই করে নদীতে ফেলে দিত। একমাস-দেড়মাস পর্যন্ত মেথরেরা প্রতিদিন তিন-চার গাড়ী বোঝাই মড়া নদীর দিকে নিয়ে চলেছে—এ দৃশ্য লেখক প্রত্যক্ষ দেখেছেন।

সরকার বিদেশ থেকে যে চাল আমদানী করেছিলেন, অন্নছত্রের প্রয়োজন-বাদে টাকায় দশসের হিসাবে জনসাধারণকে তা বিক্রয় করবার ব্যবস্থাও হয়েছিল। কিন্তু যাকে তাকে বা যত ইচ্ছা বিক্রয় করবার নিয়ম ছিল না। রিলিফ্-কমিটির সভ্যগণ লোক বুঝে একসের থেকে এক টাকা মূল্যের (দশসের) পর্যন্ত চাল দেবার টিকিট বিতরণ করতেন ; সেই টিকিট দেখিয়ে লোকে সরকারী গুদাম থেকে চাল কিনত।

পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। দুর্ভিক্ষেরও অবসান হল। দুর্ভিক্ষের পরবৎসর দেখা গেল কতগুলি বালক-বালিকা ও পূর্ণবয়স্ক মানুষ পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লঙ্গরখানার ভাত খেয়েছে-এই অপরাধে হিন্দুসমাজ তাদের তাড়িয়ে দিল। কিন্তু খ্রীস্টিয় মিশনারীরা তাদের পরম আদরে কোলে টেনে নিলেন, পুত্রস্নেহে প্রতিপালন করলেন এবং শিক্ষিত ও উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। এই অন্যায় বর্জনের জন্য কি হিন্দুসমাজ দায়ী নয় ? দুরবস্থায় পড়ে প্রাণরক্ষার জন্য অতি হীন অস্পৃশ্য জাতির ছোঁয়া অন্নগ্রহণ করা দূষণীয় নয়—হিন্দু পুরাণশাস্ত্রে এমন স্পষ্ট উল্লেখ আছে। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র এক সময়ে জীবনরক্ষার জন্য চণ্ডালের রান্না কুকুরের মাংস ভক্ষণ করেও পরে

মহর্ষিমণ্ডলে স্থানলাভ করেছিলেন—এ কাহিনী তো মহাভারতেই পাওয়া যায়। এই বর্জনের জন্য অবিবেকী সমাজই দায়ী।

৯

বালেশ্বরের প্রথম ছাপাখানা (১৮৬৮)

মিশন-স্কুলে শিক্ষকতা করবার সময়ে আমি ওড়িয়া সাহিত্যের বিস্তারের জন্য কায়মনোবাক্যে সচেষ্ট ছিলাম। প্রথমে আমি 'রাজপুত্রর ইতিহাস' নামক একখানি গল্পপুস্তক রচনা করি। উৎকলের তখনকার একমাত্র ছাপাখানা ছিল কটক মিশন প্রেস। উক্ত প্রেস-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পত্র-বিনিময় করে জানতে পারা গেল—বইখানি ছাপাতে চারশ টাকা পড়বে। সে-সময়ে আমার হাতে এত টাকা ছিলনা, সুতরাং নিবৃত্ত হলাম। পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে তাঁর বাঙ্‌লা 'জীবনচরিত' গ্রন্থখানি[৩] ওড়িয়াতে অনুবাদ করে কলকাতা ব্যাপটিস্ট্ মিশন প্রেস থেকে ছাপিয়ে আনি। বইটি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য নির্বাচিত হয়। এরপর আমি একখানি 'ব্যাকরণ' ও একখানি 'অঙ্কমালা' রচনা করি। সে-দুখানিও স্কুল-গুলিতে প্রচলিত হয়েছিল।

সাহিত্যের উন্নতি ও প্রচারের উদ্দেশ্যে আমরা এক সভা স্থাপন করে-ছিলাম। এর সভ্য ছিলেন :

বাবু জয়কৃষ্ণ চৌধুরী।
" ভোলানাথ সামন্ত রায়।
" গোবিন্দপ্রসাদ দাস।
" দামোদর প্রসাদ দাস (সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ)।
" ফকীরমোহন সেনাপতি।
" রাধানাথ রায়।

সভায় স্থির হল—উৎকলের সমস্ত প্রাচীন কাব্যের মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করা হবে। সর্বপ্রথম 'রসকল্লোল' ছাপা হবে এবং এর বিক্রয়লব্ধ অর্থে পরে অন্যান্য গ্রন্থের মুদ্রণকার্য হাতে নেওয়া যাবে। 'রসকল্লোল' ছাপার খরচ তুলবার জন্য এক কোম্পানী স্থাপনের প্রস্তাব হল—এক-একটি শেয়ারের দাম দু'টাকা। তিন-চার মাস পরিশ্রমের ফলে আড়াইশ টাকার মূলধন সংগৃহীত হল। তারপর আমরা 'রসকল্লোল' কাব্যের টীকা প্রণয়নে নিযুক্ত হলাম। প্রত্যহ রাত্রি ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত এই টীকা রচনার কাজ চলত। টীকা

তখনও শেষ হয়নি—এমন সময়ে সভায় আলোচনা হল—নিজেদের একটি ছাপাখানা না থাকলে 'রসকল্লোল'এর মুদ্রিত সংস্করণ নিঃশেষে বিক্রয় হওয়ার আগে অন্য পুস্তক ছাপাবার অর্থ পাওয়া যাবে না ; সেজন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু নিজেদের একটি মুদ্রাযন্ত্র থাকলে একসঙ্গে একাধিক পুস্তক ধরা যায়। ইতিপূর্বে কটকে প্রিন্টিং কোম্পানী স্থাপিত হয়েছিল। আমরা স্থির করলাম ঐ কোম্পানীর আদর্শে বালেশ্বরেও অনুরূপ একটি প্রিন্টিং কোম্পানী স্থাপন করতে হবে। 'রসকল্লোল'এর টীকাপ্রণয়নের কাজ বন্ধ হল। এর মুদ্রণের জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল কোষাধ্যক্ষ তা আর ফিরিয়ে দেন নি।

১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে বালেশ্বরে একটি ছাপাখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত পাকা হল। এর নাম স্থির করা গেল—পি. এম. সেনাপতি য়্যাণ্ড্ কো. উৎকল প্রেস। একটি শেয়ারের দাম পাঁচ টাকা। সভায় আমরা চার সদস্য কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পথে বেরিয়ে পড়লাম। কেউ প্রেসের উপকারিতা বুঝে, কেউ বা লাভের প্রত্যাশায়, আবার বেশ কিছু-লোক আমাদের বার বার অনুরোধে প্রেস-কোম্পানীর অংশ কিনতে রাজী হলেন। চার-পাঁচ মাস অবিশ্রান্ত অনুরোধের ফলে বারশ টাকা সংগৃহীত হয়ে কোষাধ্যক্ষের ভাণ্ডারে জমা হল।

ছাপাখানা বস্তুটি কি, এর কাজ কিভাবে চলে, এ-সমস্ত বিষয় বালেশ্বরে তখন কারোই জানা ছিল না। এদিকে কলকাতা থেকে প্রেসের কাজ-জানা লোক এনে কাজ চালানোর মত সম্বল আমাদের নেই। মুদ্রণের কাজ শিখে আসার জন্য আমার মামাতো ভাই জগন্নাথকে আমি কলকাতা পাঠিয়ে দিলাম। এক বছর সেখানে তাঁর ব্যয়নির্বাহের জন্য মাসিক পনের টাকা করে পাঠিয়েছিলাম। এই টাকাটা আমি কোম্পানীর পুঁজি থেকে না নিয়ে নিজেই দিয়েছিলাম। ছাপাখানার জন্য কি কি জিনিষ কেনা প্রয়োজন ও সে-সবের দাম কত পড়বে—এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে আমাদের লিখে জানাবার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেওয়া গেল।

ছাপাখানা-সংক্রান্ত সরঞ্জামগুলি বালেশ্বরী (পালের) জাহাজে ক্রমশঃ এসে পৌঁছাতে আরম্ভ করল। কলকাতা থেকে বালেশ্বর আসতে বাতাসের আনুকূল্য অনুসারে জাহাজের আট-দশ দিন থেকে কুড়িদিন পর্যন্ত লাগত। সবশেষে সমস্ত টাইপ সঙ্গে নিয়ে জগন্নাথবাবুও এসে পৌঁছে গেলেন। এ-সমস্ত ব্যাপারে আমার সর্বসমেত খরচ পড়েছিল আটশ টাকা। হাতে আছে বাকা

CENTRAL LIBRARY

চারশ টাকা। এখন একটি মুদ্রাযন্ত্র দরকার। অনুসন্ধান করে জানা গেল যে সাত-আটশ টাকার কমে মুদ্রাযন্ত্র পাওয়া যাবে না। তবে কি এত পরিশ্রম, এত অনুষ্ঠান-সব বৃথা যাবে? মেদিনীপুরে খ্রীস্টিয় মিশনারীদের একটি প্রেস ছিল। সেখান থেকে অল্পমূল্যে একটি মুদ্রাযন্ত্র পাওয়া যেতে পারে কিনা জানবার জন্য পত্র লিখলাম। চিঠির উত্তর আসার আগেই চার পাঁচ দিনের মধ্যে গরুর গাড়ীতে বোঝাই হয়ে একটি মুদ্রাযন্ত্র আমার কাছে এসে উপস্থিত। দাম বোধ হয় দেড়শ টাকা পড়েছিল।

বালেশ্বরের মোতিগঞ্জ বাজারের মধ্যভাগে আমাদের একটি পাকা বাড়ী ছিল। সেটি ভাড়া দেওয়া হত। জ্যাঠামশায়ের কাছে থেকে বাড়ীটি ভাড়া নিলাম। স্থির হল সেখানেই ছাপাখানা বসানো হবে। প্রিণ্টার—অর্থাৎ জগন্নাথবাবু সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ সেখানে সাজালেন। ছাপাখানার কাজ চালানোর জন্য আরও ছ'জন লোক নিযুক্ত করা হল। প্রিণ্টার তাদের কাজ শেখাবেন। ছাপার কাজ আরম্ভ হবে—একথা আমরা পরমানন্দে ঘোষণা করে দিয়েছিলাম। নির্দিষ্ট দিনে মোতিগঞ্জবাজারের অর্দ্ধেক দোকান বন্ধ। সহরের গণ্যমান্য লোকেরা পর্যন্ত ছাপা দেখতে এসেছেন। ছাপাখানার সামনের রাস্তায় পর্যন্ত লোকের ভিড। পথচারীদের চলাচল বন্ধ। অক্ষর-গুলিকে তো জোড়া দিয়ে যন্ত্রের মধ্যে রাখা হল। তারপর একটি কাঠের রোলারে কালি মাখিয়ে সেই সাজানো টাইপের উপর গড়িয়ে দেওয়া গেল। তার উপরে ফেলা হল কাগজ। শত শত লোক নিশ্বাস বন্ধ করে চেয়ে আছে। এইবার যন্ত্রের মধ্যে থেকে ছাপা বেরুবে। কিন্তু এ কিরে বাবা! একটিও ছাপা অক্ষরের চিহ্ন নেই-স্থানে স্থানে শুধু ধ্যাব্‌ড়া ধ্যাব্‌ড়া কালির ছাপ নিয়ে কাগজ বেরিয়ে এসেছে। প্রিণ্টারতো শুক্‌নো মুখে কাঠের পুতুলটির মত দাঁড়িয়ে। এদিকে আমরা দুনিয়াটা অন্ধকার দেখলাম। লজ্জায় ও মনঃকষ্টে মুখ থেকে কথা বেরোয় না। তার উপরে আবার শত শত প্রশ্ন বর্ষিত হচ্ছে—ছাপা কই? ছাপা কই? অতি কষ্টে উত্তর দিলাম, "আজ কেবল কাগজে কালি লাগানো হল। এর পর এই কালি থেকেই অক্ষর ফুটবে।"

পরে জানা গিয়েছিল-মুদ্রাযন্ত্রটা অকর্মণ্য হয়ে যাওয়ায় মেদিনীপুর-মিশন-কর্তৃপক্ষ ওটা ফেলে দিয়েছিলেন। এই বাতিল যন্ত্রে ছাপার কাজ হতে পারবে না স্থির হল। কলকাতা থেকে একটি নূতন মুদ্রাযন্ত্র আনানো প্রয়োজন। না হলে বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠান ও অর্থব্যয় সব বৃথা হবে। এইরকম একটি নূতন

যন্ত্রের দাম আটশ টাকা। এত টাকা পাওয়া যায় কোথায়?

এক বিপদ আর এক বিপদকে টেনে আনে। তখন জৈষ্ঠ মাস—প্রচণ্ড রোদ—তার মধ্যে দিনরাত দৌড়োদৌড়ি, দুর্ভাবনা ও আহার নিদ্রার অনিয়ম হেতু আমার দিনে আট-দশ বার রক্তদাস্ত সুরু হল। একদিন মুদ্রাযন্ত্র সাজানোর কাজে অনেক বেলা পর্যন্ত খাড়া দাঁড়িয়ে প্রচুর পরিশ্রম করার ফলে সমস্ত জামাকাপড় ঘামে ভেসে গেল ও সেই সঙ্গে পশ্চাৎভাগের রক্তস্রাব হেতু কাপড় ভিজে ঘরের মেজেতে পর্যন্ত রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল। বাড়ী ফিরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। সে-সময়ে অনেকদিন রাত্রি ৯'টায় প্রেস থেকে ফিরে বাড়ী পৌঁছাবামাত্র জ্ঞান হারিয়ে ফেলতাম। নিজের এই দুর্দশার বিষয় কাউকে কিছু বলি না। সাহসে ভর করে হাসিমুখে সকলের সঙ্গে প্রেস সম্বন্ধে আলাপ করি। শক্ত হাতে হাল ধরে বসে থাকি। এই ঘোর বিপদে পড়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম—প্রেসস্থাপন কিংবা শরীরপাতন।

কোন সৎকার্যে নিঃস্বার্থভাবে প্রাণপণে আত্মনিয়োগ করলে দয়াময় ঈশ্বর সহায় হন। বালেশ্বরের অন্যতম প্রধান জমিদার ও মহাজন বাবু মনোমোহন দাসের ভ্রাতা কিশোরীমোহন দাস আমার একজন প্রকৃত সুহৃদ ও সাহায্যকারী ছিলেন। তাঁর কাছে চাইবামাত্র তিনি বিনা লেখাপড়ায় আমাকে আটশ টাকা ধার দিলেন। একটি সুপার রয়েল এল্‌বিয়ন প্রেস কলকাতা থেকে আনানো গেল। তখন বর্ষাকাল বালেশ্বরী (পালের) জাহাজের যাতায়াত বন্ধ। অতএব প্রেসটি কলকাতা থেকে গরুর গাড়ী করে আনতে হল। বর্তমানে খোয়া-কাঁকর ফেলে পুরী পর্যন্ত রাস্তা পাকা করা হয়েছে—কিন্তু সে সময়ে তা কাঁচা মাটির রাস্তা ছিল। বর্ষাকালে সে পথ নিতান্ত অগম্য হয়ে পড়ত। স্থানে স্থানে বোঝাই গরুর গাড়ী কাদায় আটকে যেত। তখন আবার আশেপাশের গ্রামগুলি থেকে মজুর এনে টানাটানি করে গাড়ী ওঠাতে হত। আমাদের প্রেসবাহী গাড়ীটিও দাঁতন বাজারের মাঝের রাস্তায় কাদায় পড়ল। পনের-কুড়ি জন কুলি লাগিয়ে রাস্তা সাফ করাতে আটদিন লেগে গেল। যাই হোক কলকাতা থেকে রওনা হয়ে প্রেস বাইশ দিনে বালেশ্বরে এসে পৌঁছাল।

এখন আর কোন অভাব বা বিপদ নেই। নবনিযুক্ত কর্মচারীরা কাজ শিখে নিয়েছেন। ওড়িয়া ও ইংরেজিতে সুন্দরভাবে ছাপার কাজ চলেছে। একদিন বালেশ্বরের কালেক্টর বিগ্‌নোল্ড্ সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়ে এজন্য খুবই আনন্দ সহকারে ধন্যবাদ দিলেন ও আমাদের উৎসাহবর্ধনের জন্য

স্থানীয় কাছারি থেকে অনেকগুলি সরকারী ফরম ছাপাতে দিলেন। এই সব ফরম ছাপিয়ে প্রথম উদ্যমে প্রচুর লাভ পাওয়া গিয়েছিল।

রথ দেখতে আসার মত দু-তিনমাস পর্যন্ত প্রেস দেখবার জন্য দূর দূরান্তর থেকে লোকে সার বেঁধে ছুটে আসত। গ্রামাঞ্চল থেকে জমিদারেরা পাল্‌কী চড়ে ছাপার কাজ দেখতে আসতেন। ছাপার কাজ আরম্ভ হওয়ার দিন থেকে অনেক মাসপর্যন্ত বালেশ্বরের অধিবাসীরা দলবদ্ধ হয়ে এসে কাজ দেখতেন। আজ মুদ্রণকার্যের বহুল প্রচারের দিনে এ কাহিনী সকলের কাছে আশ্চর্য লাগতে পারে। কিন্তু লণ্ডনসহরে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র চালু হওয়ার দিনটিতেও স্বয়ং রাজারাণী সেই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করবার জন্য ছাপাখানায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

ছাপার কাজ আরম্ভ হওয়ার ছয়মাস পরে বিগ্‌নোল্ড ও পরবর্তী কালেক্টর জন্ বীম্‌সের সঙ্গে উৎকলের পরমহিতৈষী টি. রেভেন্‌শ সাহেব একদিন সকালে ছাপাখানা পরিদর্শন করতে এলেন। তিনি প্রেসের সব কিছু ঘুরে দেখলেন ও প্রেস-স্থাপনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুনে আমাদের দশটি টাকা দিলেন। সে-টাকা আমরা নিজেরা না নিয়ে সাহেবের নামে দুটি শেয়ার হিসাবে কোম্পানীতে জমা করে নিলাম। পরে কোম্পানী যখন উঠে যায় লভ্যাংশসমেত তিরিশ টাকা তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।

একবার কোন এক পার্বণ পূজা উপলক্ষে বহু ব্যক্তি বালেশ্বরের অন্যতম প্রধান ব্যবসায়ী বাবু মদনমোহন দাসের গৃহে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বাবু রাধানাথ রায় এবং আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সেই প্রকাশ্য সভার মধ্যে রাধানাথ বাবু আমাকে লক্ষ্য করে বলেন, "আপনি যে ভাবে প্রেস কোম্পানী স্থাপন করেছেন তা ইতিহাসে সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত থাকা উচিত।"

ছাপাখানার কাজ সুন্দরভাবে চলতে লাগল। অনেক লাভও থাকছিল। ইতিপূর্বে কটক প্রিন্টিং কোম্পানী 'উৎকল-দীপিকা' নামক এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। আমাদের কোম্পানীর কার্যনির্বাহক-সভা স্থির করলেন, আমাদের প্রেস থেকে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করা হবে। পত্রিকার নাম হল 'বোধদায়িনী এবং বালেশ্বর সংবাদ-বাহিকা'। এর মধ্যে 'বোধদায়িনী' অংশ সাহিত্য-বিষয়ক ও 'সংবাদ-বাহিকা' অংশ সংবাদ-পরিবেশক। পত্রিকা তো বেরুল ; কিন্তু এদিকে লেখকের অভাব। আমি সারাদিন স্কুল ও প্রেসের কাজ করে শ্রান্ত হয়ে পড়ি। রাত্রে আর বিশেষ

কিছু কাজ করবার শক্তি পাই না। সেজন্য পত্রিকার প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়তে লাগল। এর গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ ছিল। তার মধ্যে আট-দশ জনের কাছ থেকে মূল্য আদায় হত।'

(ক্রমশঃ)

টীকা ঃ

১. নবম অঙ্ক ঃ পুরীর তৎকালীন রাজা শ্রীদিব্যসিংহদেবের নামীয় বর্ষ গণনা অনুসারে তাঁর রাজত্বের নবম বর্ষে এই দুর্ভিক্ষ ঘটে বলে আধুনিক ওড়িশার ইতিহাসে তা 'ন-অঙ্ক দুর্ভিক্ষ' নামে পরিচিত। 'নবম অঙ্ক' অর্থে এখানে দিব্যসিংহদেবের নবম রাজ্য-সংবৎসর (১৮৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দ) বুঝতে হবে।

২. গৌণী ঃ বেত বা পিতলনির্মিত পাত্রবিশেষের পরিমাণ অনুযায়ী শস্যের নির্দিষ্ট মাপ। ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলে এর ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ। কটক অঞ্চলে এক গৌণীতে স্থান ভেদে দু'সের থেকে আট সের পর্যন্ত বোঝায় আশি গৌণীতে এক ভরণ।

৩. টি. ই. রেভেন্‌শ ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে ওড়িশার কমিশনার নিযুক্ত হন। ওড়িশার অবস্থা সম্পর্কে তখন তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন ও সেই হেতু দুর্ভিক্ষজনিত পরিস্থিতির গুরুত্ব প্রথম দিকে বুঝতে পারেন নি।

৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত 'জীবনচরিত' এর প্রকাশ কাল সেপ্টেম্বর ১৮৪৯।

অপরাজিত বিভূতিভূষণ

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়

(১৫)

বিভূতিভূষণের মা অনেক আশা নিয়ে রাজপুর হরিনাভিতে এসেছিলেন একথা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে একবার বলেছি। আবার নতুন করে সংসার গড়ে তুলবেন, জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দেবেন, অনেক দিনের অপূর্ণ সাধ পূর্ণ করবেন। কিন্তু বিয়ের কথায় বিভূতিভূষণ বেঁকে বসতেন আগেই বলেছি। চতুর্দ্দশী গৌরীর স্মৃতি তাঁর অনুভূতিপ্রবণ মন থেকে সহজে মুছে যাবার

নয়। তাঁর যৌবনের সঙ্গিনীকে তিনি কখনো ভুলতে পারেনও নি। এ-ত শ্লেট থেকে 'চকখ'ড়ি'র পেন্সিলের দাগ মুছে ফেলার মত জিনিস নয়। অতএব মায়ের সাধ অপূর্ণই থেকে গেল।

সেসময়ে ম্যালেরিয়া রোগ এ দেশে প্রবল। যশোর ও নদীয়া জেলার কত বর্ধিষ্ণু গ্রাম ও জনপদ ম্যালেরিয়া জ্বরের কবলে পড়ে জনশূন্য হয়ে উজাড় হয়ে গিয়েছে। বিভূতিভূষণের পৈতৃক গ্রাম বারাকপুরের কাছে 'বৈরামপুর' গ্রামে নাকি অবিভক্ত বঙ্গে সবচেয়ে বেশী ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল। সে সময়কার সরকার নাকি সমীক্ষা বা survey চালিয়ে এ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন—এ কথা লোকপরম্পরায় শুনেছি। সত্য মিথ্যে জানিনে।

বারাকপুর গ্রামের ম্যালেরিয়াও বিখ্যাত ছিল। বিভূতিভূষণের অনেক বইতেও ম্যালেরিয়ার বর্ণনা আছে। এই প্রসঙ্গে 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে দুর্গার মৃত্যু এবং 'দ্রবময়ীর' কাশীবাস' গল্পে দ্রবময়ীর ম্যালেরিয়া জ্বরের বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

বিভূতিভূষণের মা মৃণালিনীর ম্যালেরিয়া ছিল। বর্ষার শুরুতে জ্বরের পালা শুরু হোত—কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে যখন বর্ষা বিদায় নিয়েছে—দুর্গা পূজো, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজো, এমন কি শ্যামাপূজো পর্য্যন্ত যখন শেষ হয়ে গিয়েছে—তখন থেকে শীতের কয়েক মাস ম্যালোরিয়ার রোগীরা সুস্থ থাকতেন। বিভূতিভূষণেরও শৈশবে ম্যালেরিয়া ছিল। মৃণালিনী এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা নুটুবিহারীও ম্যালেরিয়ার কবল থেকে মুক্তি পান নি।

সোনারপুর এসে কিছুদিন ভালো ছিলেন মৃণালিনী। অবশেষে রাজপুর থাকতে থাকতে সত্য মজুমদারের বাড়ী এবং নগেন্দ্রনাথ বাগচির বাড়ীতে ম্যালেরিয়া জ্বরে কাতর হয়ে পড়লেন মৃণালিনী। শিশু পুত্র নুটুবিহারী সঙ্গে আছে। তাকেও ক্রমশ জ্বরে ধরলো।

বিভূতিভূষণ মায়ের চিকিৎসার কোনো ত্রুটী করেন নি। কিন্তু তিনি পুরুষ মানুষ। নিজের রান্নাটাও কোনো কালে নিজে রেঁধে নিয়ে খেতে পারতেন না। সম্ভবত কনিষ্ঠা ভগ্নী মণি তখন মৃতা, এদিকে জাহ্নবীর বিয়ে হয়েছে বারাকপুর গ্রামের পাশের গ্রাম চাল্‌কীতে। সম্ভবত তাঁকে খবর দিয়ে হরিনাভি-রাজপুরে এনেছিলেন বিভূতিভূষণ।

কিছুতেই কিছু হোলো না। রোগ ক্রমশ বাঁকা পথ ধরলো। ম্যালেরিয়া জ্বরের সঙ্গে নানা উপসর্গ দেখা দিল। দীর্ঘ দিনের মনোবেদনা ও মনঃকষ্ট তিনি বাইরে প্রকাশ করেন নি। দীর্ঘদিনের অর্দ্ধাহার—উপবাস, অনশনে তাঁর দেহ অল্প বয়সেই ভেঙ্গে গিয়েছিল। কনিষ্ঠ পুত্র মুটুবিহারী বালক। জ্যেষ্ঠপুত্র সংসার সম্বন্ধে নিঃস্পৃহ এবং উদাসীন। অনেকে তাঁকে ভয় দেখায় ছেলে 'সন্ন্যেসী' হয়ে যাবে। রাত জেগে জেগে ছেলে 'পরলোক তত্ত্ব'-এর বই পড়ে। আত্মা অবিনশ্বর কিনা তার খোঁজ করে।

তাছাড়া পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের একটি যুবক সংসার সম্বন্ধে উদাসীন। প্রথমা পত্নীর স্মৃতি তিনি সযত্নে হৃদয়ের মণিকোঠায় সঞ্চিত করে রেখেছেন। মায়ের তাই বিশ্বাস হয়েছিল ছেলে নিশ্চয় সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। ঘরে থাকার ছেলেও নয়। পিতা মহানন্দের স্বভাব পূর্ণ মাত্রায় পেয়েছে। পায়ের তলায় 'মাকু' বসানো আছে। এ ছেলে ঘরে থাকবে না—সংসার করবে না। সন্ন্যাসী না হোলেও—মহানন্দের ভবঘুরেমী পূর্ণ মাত্রায় তাঁর ছেলের চরিত্রে বর্তমান। দুশ্চিন্তা এবং ম্যালেরিয়া জ্বরে মায়ের রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

বিভূতিভূষণের 'দৃষ্টি প্রদীপ' উপন্যাসে মায়ের মনোবেদনা ও মনঃকষ্টের কথা পূর্ববর্ত্তী অধ্যায়ে একবার উল্লেখ করেছি। 'দৃষ্টি-প্রদীপ'-এর উদ্ভাসিত অলৌকিক আলোতে 'জিতু' মাকে মৃত্যু শয্যায় দেখতে পায়। সে মনের মধ্যে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা বহন করে দেশের বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। শেয়ালদহ ষ্টেশনে আকস্মিক ভাবে শ্রীরামপুরের ছোট বৌ ঠাকরুণের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ক্ষণিকের জন্যে। প্রথম যৌবনের আনন্দে উদ্বেল মুহূর্ত্তগুলির কথা ও মনে এসেছে হয়তো। অন্ততঃ 'ছোট বৌ ঠাকরুণের তো সেসব দিনের কথা মনে পড়েছিল। তবে বিভূতি-সাহিত্যে প্রেম কখনো উচ্চকিত কণ্ঠে ও সরবে ঘোষিত হয়নি। বিশ্ব সাহিত্যের কথা জানিনে। বাংলা সাহিত্যে নর নারীর প্রেম ও ভালোবাসাকে এত মহীয়ান ও গরীয়সী রূপে চিত্রিত করেন নি একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্য আর কেউ।

মায়ের মৃত্যু শয্যার পাশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে জিতু। সত্যি, তার অলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি শক্তি মিথ্যে নয়। মা মৃত্যু শয্যায়। মা কাতর হয়েছেন ছেলের ভবিষ্যত ভেবে। ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে—সে কথা ভেবে।

এ বোধহয় বিভূতিভূষণের নিজেরও কথা। মৃণালিনীও শেষের দিনগুলিতে

ছেলে "সন্ন্যাসী" ও "গৃহ ছাড়া" হয়ে যাবে ভেবে আকুল হয়ে যন্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারেন নি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিভূতিভূষণের প্রথম দিনলিপি "স্মৃতির রেখা" পড়লে সে কথা মনে আসা অসম্ভব নয়। মায়ের মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পরে ভাগলপুরের অরণ্যবাসের শেষদিনগুলিতে সে কথা তাঁর মনে এসেছে। তিনি "স্মৃতির রেখা" দিনলিপিতে লিখেছেন মায়ের সেই বিশ্বাসের কথা।

"...মাও ছিলেন তেমনি। মা চিরদিন ঐ বাঁশবনের ঘাটে, তেঁতুল-তলায় শান্ত জীবনযাত্রা সঙ্কীর্ণ ছোট গণ্ডীর মধ্যেই কাটিয়ে গিয়েছেন··· বিয়ে না করতে চাওয়ায় সংসার উল্টে গেল এই ভাবে কান্না···"

(বিভূতি-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ ৪২০)।

* * *

বিভূতিভূষণ কিন্তু দূরের হাতছানি শুনতে পেয়েছিলেন। ঘর সংসার ও বিবাহ করবেন—তখন তাঁর মনের মধ্যে ছিল না। তিনি খানিক বাদেই ঐ দিনলিপিতে লিখেছেন :

"আমায় দূরে যেতে হবে—বহুদূর। তা' হোলে ভারী চমৎকার জীবনের উপভোগ হবে। জ্যোৎস্না রাত্রি, ফুজিসান পর্ব্বতে, কি প্যারিসের কোনো বুলভার-এর ধারে, কি সমুদ্রের উপর জাহাজে, কি ইজিপ্টের লুক্সর, কি কণার্কের মন্দিরের মধ্যে, মিউরিয়া মরুভূমির উপরে—এইসব ভাবি।" (১।৩-১৯২৮॥ 'বিভূতি রচনাবলী', প্রথমখণ্ড, পৃ. ৪২১)।

এবার দ্রুত অনেক কথা সারতে হবে। 'জাঙ্গীপাড়া স্কুল' ছেড়ে, 'হরি-নাভি স্কুল'-এ বিভূতিভূষণ যোগ দিয়েছিলেন ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জুন। এখানে তিনি দু বছর একমাস চাকুরী করেন।*

বিভূতিভূষণ তাঁর প্রথম দিনলিপি 'স্মৃতির রেখা' তে হরিহরের মত পিতার ভবঘুরেমির কথা এবং রাজপুরে মাতা মৃণালিনীর মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছেন। মৃণালিনীর মৃত্যুর মাস—আশ্বিন মাস (ইংরেজি সেপ্টেম্বর মাস) বলে মনে হয়। বিভূতিভূষণ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস পর্য্যন্ত 'হরিনাভি

---

*দ্রঃ 'হরিনাভি স্কুল'-এর 'সার্ভিস বুক' (১৯২০-১৯২২)। 'হরিনাভি স্কুল' সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য সরবরাহের জন্য এতদঞ্চলের বিখ্যাত চিকিৎসক 'হরিনাভি স্কুল'-এর প্রাক্তন ছাত্র ডাঃ সুশীল ভট্টাচার্য্য (বারুইপুর) মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

স্কুল'-এ কাজ করেছিলেন জানা যায়। মনেহয়, ইংরেজি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে (বাংলা আশ্বিন মাসে) রাজপুর-হরিনাভিতে নগেন্দ্রনাথ বাগচীর গৃহে মৃণালিনীর মৃত্যু হয়।—

"বাবার দেশভ্রমণের বাতিক—সেই বড়দিনের সময় আমবনের কাছে বেড়ানো···কত পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে। ভগবান, তুমি সামনে টেনে নিয়ে যাচ্ছ—সামনে নিয়ে চল। সেই সোনারপুরে (?) এমন সময় মা মারা যাওয়ার দিনটি থেকে খুব নিয়ে চলেছ—সেই কিশোরী বাবুর বাড়ি, জ্যোৎস্নাময় পূর্ণিমার কথা মনে পড়ে।" ('বিভূতি রচনাবলী', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৩)।

২৬ সেপ্টেম্বর—বাংলা আশ্বিন মাস। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বিভূতিভূষণ 'হরিনাভি স্কুল'—এর শিক্ষকপদে ইস্তফা দেন। অতএব বিভূতিভূষণের মা মৃণালিনীর মৃত্যু ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর মাসের কাছাকাছি একটা সময়ে ঘটে ছিল ধরে নিতে পারি।

বিভূতিভূষণের মাতা মৃণালিনীর মৃত্যুও—অকাল মৃত্যুই। বঙ্গাব্দ ১২৯৬ সালে ১২ বছর বয়সের সময় তাঁর বিবাহ হয় মহানন্দের সঙ্গে। মৃণালিনীর জন্ম সময় আনুমানিক ১২৮৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে (বঙ্গাব্দ আশ্বিন ১৩২৮)। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স ৪৪ বৎসর পূর্ণ হয়েছিল। তারপর আর কয়েক মাস মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন।

উত্তরকালে খ্যাতিমান সাহিত্যসাধক—তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিভূতিভূষণের প্রথম প্রকাশিত 'উপেক্ষিতা' গল্পের "প্রবাসী" তে প্রকাশ হবার সংবাদও তিনি জেনে যেতে পারেন নি। 'উপেক্ষিতা' 'প্রবাসী' পত্রের ১৩২৮ সালের মাঘ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

বিভূতিভূষণ তখন শোকে ও দুঃখে কাতর ও পাথর। তাঁর সে সব দুঃখের দিনের স্মৃতি তাঁর বিপুল পরিমাণ রচনার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু তিনি মানুষটা ছিলেন চাপা স্বভাবের। নিজের শোক ও দুঃখের বিহ্বলতা ও কাতরতা বাইরে প্রকাশ করতে মোটেই সরব ছিলেন না। বরং লজ্জা পেতেন। তিনি লাজুক ছিলেন। খুব অল্প কয়েক বৎসরের ব্যবধানে প্রথমে গেলেন প্রথমা স্ত্রী গৌরী ও কনিষ্ঠা ভগ্নী মণি। তারপর অকালে গেলেন মা মৃণালিনী। মায়ের কথা তিনি 'স্মৃতির রেখা' তে লিখেছেন—আগেই একথা লিখেছি। তাঁর দিনলিপিগুলিতে ঈশ্বরের কাছে তাঁর হৃদয় বেদনার রুদ্ধ-দুয়ার বোধহয় খুলে দিয়েছিলেন তিনি।

CENTRAL LIBRARY

'হরিনাভি-স্কুল' থেকে বিভূতিভূষণ পদত্যাগ করেন ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে। ইতিপূর্ব্বে তাঁর প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' 'প্রবাসী' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। মায়ের মৃত্যুর পর বিভূতিভূষণ একদিন কলকাতায় আসবার সময় শেয়ালদহ "সাউথ ষ্টেশন" এ পা হড়্‌কে পড়ে যান। তাঁর পা যদিও ভাঙ্গেনি কিন্তু তিনি বেশ আহত হয়েছিলেন এবং বেশ কিছুদিন তাঁকে রাজপুরে "গৃহবন্দী" অবস্থায় কাটাতে হয়েছিল। সে সময় রাজপুর গ্রামের একটি বধূ তাঁর সেবা ও যত্ন করেন। ধীরে ধীরে বিভূতি-ভূষণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। তরুণী বধূটির সেবাপরায়ণতা, ভগিনী ও মাতৃসুলভ ভালোবাসা তাঁকে 'উপেক্ষিতা' গল্প লেখার অনুপ্রেরণা জোগায়। সেই সঙ্গে বালক কবি পাঁচুগোপালের উস্‌কানি তো ছিলই। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্পটি কিন্তু অনেকে সুনজরে দেখেন নি। হরিনাভি রাজপুর অঞ্চলের অনেকের ভালো মনে হয়নি "তরুণী বধূ"র কথা গল্পটির মধ্যে উল্লেখ থাকার জন্যে। বিভূতিভূষণের "হরিনাভি-স্কুল" থেকে পদত্যাগ করবার এটাও একটা অন্যতম কারণ বলে শুনেছি।*

বিভূতিভূষণ হরিনাভি ছেড়ে এসে মির্জ্জাপুরের পুরনো "মেস বাড়ী"তে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে একই 'মেস বাড়ী'তে থাকতেন প্রখ্যাত ইংরাজী লেখক শ্রীনীরদ চন্দ্র চৌধুরী। নুটুবিহারীকে রাজপুর হরিনাভি থেকে এনে 'বনগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে' ভর্ত্তি করে দিলেন বিভূতিভূষণ। নিজে আশ্রয় নিলেন মির্জ্জাপুরের পুরনো 'মেস বাড়ী'তে। আবার চাকুরী খোঁজার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানো—মাঝে মাঝে 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী'তে (বর্ত্তমান 'ন্যাশনাল লাইব্রেরী') অধ্যয়নের জন্যে যাওয়া। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র এবং তাঁর যশস্বী ছাত্রদের সঙ্গে "সন্ধ্যে বেলা"র গড়ের মাঠের আসরে আড্ডা দেওয়া—এই ছিল বিভূতিভূষণের কাজ তখন। ১৯২২-১৯২৩ সনে চাকুরী এত সহজলভ্য ছিল না। 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র কর্ম্ম-খালিতে বিজ্ঞাপন দেখে দেখে দরখাস্ত পাঠান আর দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করেন চাকুরী প্রাপ্তির পত্রের আশায়।

কিন্তু চাকুরী হচ্ছে কোথায়? শুধু বাংলার সুধীও বিবুধ জনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পরিধি বাড়ছে। শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরীর অসাধারণ পাণ্ডিত্য। দুজনে একসঙ্গে থাকেন। নানারকম আলাপ হয়।

---

* সংবাদদাতা: শ্রীযুক্ত কিশলয় ঠাকুর ('আনন্দ বাজার পত্রিকা' কলকাতা)।

বিভূতিভূষণের মুখে শুনেছি—বিভূতিভূষণের ছিল ইংরেজি 'বায়স্কোপ' দেখার অভ্যেস। তখনো সবাক চিত্রের যুগ আসেনি। নির্বাক চিত্র দেখতেন ফিরিঙ্গী পাড়ায় নিবিষ্ট চিত্রে। কিন্তু শ্রীযুক্ত নারদচন্দ্র চৌধুরী মশায় কখনো সঙ্গী হোতেন না। 'বায়স্কোপ' দেখলে হাল্কা হয়ে যাবেন বলে চৌধুরী মশায়ের ধারণা ছিল—বিভূতিভূষণের মুখে শুনেছি। তিনি তখন নির্বাক চিত্রও দেখেন নি।

ক্রমশ 'মেস'-এর খরচ চালানো কঠিন হয়ে পড়লো বিভূতিভূষণের পক্ষে। বনগাঁতে স্কুল বাড়ীর মেসেরও খরচ জোগাতে হোত বিভূতিভূষণকে নুটু বিহারীর জন্যে।

এমন সময় 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র বিজ্ঞাপন দেখলেন বিভূতিভূষণ—কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত জমিদার বাড়ীর জন্যে "প্রাইভেট সেক্রেটারী" চেয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। জমিদার বাবু কিন্তু আইন-পাশ "সেক্রেটারী" চেয়েছিলেন তাঁর বিজ্ঞাপনে। কপাল ঠুকে বিজ্ঞাপনের উত্তর দিলেন বিভূতিভূষণ। সেই সঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর ৬টি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে।

জমিদার বাবুর ম্যানেজারের উপরে দায়িত্ব ছিল প্রাথমিক ভাবে চাকুরী প্রার্থীদের আবেদন পত্র বিবেচনার জন্যে। তিনি বিভূতিভূষণের আইন জ্ঞানের অভাব দেখে আবেদন পত্র নাকচ করে দিলেন। কিন্তু জমিদার বাবুর ছিল বহুদর্শিতা। তিনি কিন্তু বিভূতিভূষণকেই বেছে নিয়েছিলেন অনেক আইনজ্ঞ ও অভিজ্ঞ আবেদনকারীদের মধ্য থেকে। তাঁর ধারণা হয়েছিল, যে লোক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী'তে গল্প লিখেছেন—তিনি বাজে লোক নন। জমিদার বাবুর হিসেবে ভুল হয়নি। এমনি ভাবেই বিভূতিভূষণ ঢুকেছিলেন কলকাতার প্রাচীন এবং বনেদী জমিদার পাথুরিয়া ঘাটার 'খেলাত চন্দ্র ঘোষের জমিদারী'তে। কিন্তু তার আগে আরো কিছু কথা বলতে হবে।

'গো রক্ষা প্রচারিণী সভা'র (Cow Protection League)এর ভ্রাম্যমাণ প্রচারক হিসেবে বিভূতিভূষণ কিন্তু "হরিনাভি রাজপুর স্কুল" পরিত্যাগের পরে কিছু কাল কাজ করেছিলেন। সেই সূত্রে তিনি সমগ্র পূর্ববঙ্গ, ত্রিপুরা রাজ্য এবং চট্টগ্রাম ও নিম্ন ব্রহ্মের আরাকান ইয়োমা পার্বত্যভূমি ও বনাঞ্চল ভ্রমণ করেন। সে কথা এর পর বলা দরকার।

CENTRAL LIBRARY

আঁধারের ওপারে

মৈনাক

॥ ১৭ ॥

গত বছরের মত নির্ধারিত ছুটির পরও মায়ের পীড়াপীড়িতে আর ও দুটি দিন কাটিয়ে ওকে রওনা হতে হল। বিদায়ের ক্ষণে অশ্রুসজল মুখে মায়ের সক্ষোভ উক্তি আর বাবার স্নেহে চকচকে দৃষ্টি। ছোট পিসিকে প্রণাম করতেই বিষণ্ণ হাসিতে উদ্ভাসিত মুখখানি আরও যেন করুণ হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি ওকে জড়িয়ে ধরে প্রায় অশ্রুত কণ্ঠে ছোট পিসি বললেন, দরকার নেই বোধহয় তবুও মনে করিয়ে দিচ্ছি আর এক বার। নিজের আর বাড়ীর মান মর্যাদা বজায় থাকে যেন আমাদের মেয়ের হাতে। সীমা ওকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বলল, থাকবে—থাকবে। হাক আর নীরু প্রণাম করার জন্য ওর পায়ের উপর ঝুঁকে পড়ায় আর কোন কথা হল না।

কলকাতায় পৌছাতে না পৌছাতে খবর—শহরের উত্তরাংশে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ খুন। হায় ভগবান, নাগরিকদের সেবা করা ছাড়া যাদের অন্য কোন কাজ নেই তাদের একজনের উপর এ কি নিষ্ঠুর আক্রমণ! কিন্তু কে জবাব দেবে এই প্রশ্নের—কে সমাধান করবে এই নূতন ধরণের সরকার বিরোধী কর্মসূচির রহস্য? হাঙ্গামা চলছে। তিনদিন পর আবার উত্তর কলকাতায় সারা দিন ধরে ব্যাপক হাঙ্গামা। বোমা, অগ্নিসংযোগ, গুলি। পুলিশ ও জনতার মধ্যে যুদ্ধে তিন জন নিহত। উত্তর কলকাতার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বন্ধ।

ডালহাউসি স্কোয়ারের বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে ভাবছিল সীমা। বাস চলাচল অত্যন্ত অনিয়মিত। তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবারও অফুরন্ত অবকাশ।

—খুব তাড়া নাকি বাড়ী ফেরার?

তমাল! সীমার সমগ্র সত্তা আনন্দে যেন নৃত্য করে উঠল। বহু প্রয়াসে উচ্ছ্বাসকে সংযত করে সীমা বলল, তাড়া থাকলেও ফিরতে পারছি কই? বাসের যা অবস্থা···

তাহলে আরও একটু পরে বাস ধরলে ক্ষতি নেই। তোমাকেই খুঁজছিলাম। চল, এগোন যাক।

সীমার দেহের প্রতিটি রক্তকণিকা বুঝি উত্তাল হয়ে উঠেছে। তোমাকেই খুঁজছিলাম···তোমাকেই খুঁজছিলাম···তোমাকেই! এত আনন্দ রাখবে কোথায়? পূজার ছুটির পর তমালের সঙ্গে দেখা হয়নি এ যাবত। দেখা করার প্রবল ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তমালও তো ওকে খুঁজছে—শুধু ওকেই। সীমার দেহে-মনে যেন ঘোর লেগেছে। কিন্তু না, ছোট পিসিকে কথা দেওয়া আছে—মান-মর্যাদা যেন বজায় থাকে। সীমা নিজেকেই নিজে শাসন করার চেষ্টা করে। এত বিহ্বল হলে চলবে না। কিন্তু এত সহজ কি আবেগকে সংযত করা?

তোমাকেই মনে মনে খুঁজছিলাম। চলতে চলতে আবার আত্মগত ভাবে উচ্চারণ করে তমাল। তারপর নীরবে পথ পরিক্রমা করে।

কেন—কেন খুঁজছিলেন আমাকে? কথাটা বলবে ভেবে বার বার মনে মনে মহলা দেওয়া সত্ত্বেও উচ্চারণ করতে পারে না সীমা। কী এক কুণ্ঠা এসে ওর কণ্ঠরোধ করে। নীরবে শুধু ও তমালের পাশাপাশি পথ চলতে থাকে।

মিশন রো পার হয়ে তমাল সোজা দক্ষিণ দিকে চলে। রাজভবনকে ডাইনে রেখে গভর্ণমেণ্ট প্লেস অতিক্রম করে। বাঁয়ে সুরেন্দ্রনাথ পার্ক।

প্রথম হেমন্তের অপরাহ্ণ-শেষের কলকাতা। ঈষৎ কুয়াশা আর ধোঁয়া ও ধূলায় শহরের বাতাস একটু ভারি। দূরে চৌরঙ্গীর দিকে লাল নীল নিওন আলোর খেলা। ডান পাশে চওড়া রাস্তায় দ্রুতগামী গাড়ীর মিছিল। হরিরাম গোয়েঙ্কার মূর্তির কাছে এসে থমকে দাঁড়াল তমাল।

এখানে বসবেন? সীমা প্রশ্ন করল।

কি বললে—এখানে বসা? তমাল যেন কোন্ স্বপ্নরাজ্য থেকে বাস্তব জগতে ফিরে এল। তারপর চারিদিকে চেয়ে বলল, বড্ড ভীড় এখানে। চল, ওদিকে এগোই। তমাল পশ্চিম দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল।

সাবধানে বড় রাস্তা পার হয়ে রাজভবনের পাশ দিয়ে ওরা এগোতে লাগল। নেতাজীর মূর্তির কাছে এসে আবার দক্ষিণ দিকে যাবার জন্য রাস্তা অতিক্রম করার উপক্রম করতেই সীমা প্রশ্ন করল, ইডেন গার্ডেনে যাবেন, না সেদিনের মত প্রিন্সেপ ঘাটে?

ন্ন, ন্না—তমাল স্বপ্নভঙ্গের মত বলল। অত দূরে নয়, তাড়াতাড়ি বসতে চাই কোথাও। কথা আছে।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়; আনন্দের পর আনন্দ। তমাল শুধু সীমাকে খুঁজছে

না। কথা আছে ওর সঙ্গে এবং তাড়াতাড়ি। তমালের কাছে ওর এত মূল্য! সীমা আনন্দে অধীর হয়ে উঠল।

রাস্তা পার হতেই অজ্ঞাত সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভ।

চলুন, এখানে বসা যাক। এর বেদিতে প্যাণ্ট পরে বসতে অসুবিধা হবে না। বন্দুক নীচু করে দণ্ডায়মান দুই সৈনিকের মূর্তিযুক্ত গেটের সামনে দাঁড়িয়ে সীমা প্রস্তাব করল।

তা মন্দ নয়—চল তাহলে। কতকটা অন্যমনস্কের মত তমাল সম্মতি জ্ঞাপন করল।

বসার জায়গা ভালই পাওয়া গেল স্তম্ভটির দক্ষিণ দিকে কি জানি কেন খুব লোকজন নেই ওখানে—যা এই সন্ধ্যা বেলায় আকস্মিক ব্যাপার বলতে হবে।

পরিবেশটাকে একটু হাল্কা করার জন্য সীমা সকৌতুকে বলল, এখানে বসতে রাজী হবেন ভাবতে পারিনি।

কেন? সীমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে তমাল প্রশ্ন করল।

হাসিমুখে সীমা জবাব দিল, প্রথম মহাযুদ্ধে মৃত অজ্ঞাত সৈনিকরা হয়ত আপনাদের মতে সাম্রাজ্যবাদী গণ্ডগোলের কিছু একটা ব্যাপার হবে ভেবে। তা ছাড়া পিছনে নেতাজী আর ও দিকে লোকমান্য তিলক……

সীমার রসিকতা তমাল বুঝতে পেরে হাসল। তবে কেমন পাণ্ডুর সেই হাসি। ঐ রকম ম্লান হাসি মুখে নিয়েই তমাল বলল, ঠাট্টা কোরো না, ক্রমশঃ বুঝছি দুনিয়াটাকে যেমন সাদা আর কালোতে ভাগ করেছিলাম তা আর বোধহয় চলবে না।

এবার বিস্মিত হবার পালা সীমার। অকৃত্রিম বিস্ময়ে ও বলে, একি নূতন কথা বলছেন?

হ্যাঁ—নূতন…অন্ততঃ আমার কাছে। সেই কথা আলোচনা করব বলেই তো তোমাকে মনে মনে খুঁজছিলাম ইউনিয়নের একজিকিউটিভের মিটিং-এর পর থেকে।

আমাকে খুঁজছিলেন? আরও বিস্মিত হল সীমা। আমি ইউনিয়নের কোন নেতা নই…আপনাদের পার্টি কেন, কোন পার্টির সঙ্গেই আমার যোগাযোগ নেই……

সেই জন্যই বেশী করে তোমার কথা মনে পড়ল, একটু উচ্ছ্বাসের ভঙ্গীতেই তমাল বলল। কোন পার্টি বা গ্রুপের নয় বলেই হয়ত তোমার কাছে একটা

নিরপেক্ষ বুদ্ধি পরামর্শ পাওয়া যাবে। মানে অবজেক্টিভ ভাবে ব্যাপারটা বোঝার সাহায্য হবে। পকেট থেকে প্যাকেট বার করে তমাল তার একটি সিগারেট ঠোঁটে চেপে তাতে অগ্নি সংযোগে মনোনিবেশ করল।

সীমা মনে মনে ভাবল—তাহলে নিরপেক্ষ মানুষেরও স্থান আছে তমালের রাজনৈতিক মানচিত্রে···অন্ততঃ এমনি কখনও কখনও। কিন্তু একথা ব্যক্ত না করে ও সহাস্য দৃষ্টিতে তমালের দিকে চেয়ে রইল। যে কোন কারণেই হোক, তমাল যে ওর পরামর্শকে মূল্য দিচ্ছে—এতেই ও খুশী।

বার কয়েক সিগারেটে টান দিয়ে তমাল বলল, ইউনিয়নের কমিটি মেম্বার রাম নগীনা সিংকে চেন নিশ্চয়। আমাদের কারখানার অনেক শ্রমিক ওর রিক্রুট। এর জন্য ওদের কাছ থেকে মাসে মাসে চৌধুরীয়ানা তো পায়ই···

চৌধুরীয়ানা! সীমা বলে উঠল।

ও—হ্যাঁ--তুমি জানবে কি করে? চৌধুরীয়ানা হচ্ছে এক রকম কমিশন যা বহু কলকারখানায় এই সর্দারেরা শ্রমিকদের কাছ থেকে পেয়ে থাকে। এছাড়াও রামনগীনার মত এই সব সর্দারদের অনেকেই মহাজনী কারবার করে—মানে অধীনস্থ শ্রমিকদের টাকা ধার করতে হলে ওদের কাছ থেকেই নিতে হবে এবং ওদেরই সুদ দিতে হবে। তবে এ ব্যাপারটা বহু দিন হল কারখানার জগতে চলে আসছে বলে আমরা এ নিয়ে মাথা ঘামাই নি। কারণ ইউনিয়ন চালাতে হলে এই সব সর্দারদের সাহায্য খুবই প্রয়োজন—অনেক লোকজন, অনেক ভোট ওদের হাতে। কিন্তু রামনগীনা করেছে কি না ইউনিয়নের রসিদ বই নিয়ে অন্ততঃ শ পাঁচেক টাকা চাঁদা তুলে তা আর জমা দেয় নি। এই নিয়ে বিবাদ। মজুরদের কাছ থেকে ইউনিয়নের নামে টাকা তুলে জমা না দেওয়ায় আমি খুব চাপ দিচ্ছি ওর উপর। কিন্তু ও দেখছি বড় বাঁকা লোক। একে সর্দার, তার উপর ইউনিয়নের কমিটি মেম্বার···

তা ইউনিয়নের অন্য কমিটি মেম্বাররা চাপ দিচ্ছেন না ওঁর উপর?

আরে, সেইটেই তো কথা। তমাল হতাশ ভাবে এক রাশ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল। মায়া তো জানই ইদানিং আমার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বলবেই বলবে। আরও হতাশ কণ্ঠে তমাল জানাল। ওর সঙ্গে আরও জনা দুয়েক আছে। কিন্তু বাকীরাও রামনগীনার উপর চাপ দিতে বা তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে রাজী হচ্ছে না। এমন কি আমাদের পার্টির উপরের দিকের নেতারাও ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চান না—টাকা খাবার অভিযোগ সুনির্দিষ্ট জেনেও।

আশ্চর্য···কিন্তু কেন ?

কতকটা যেন অভিমানের স্বরেই তমাল বলল, বলছেন এখন একটু বুঝে চলতে হবে। রাজ্যপালের শাসনের নামে বেনামে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের সরকার চলছে। তাছাড়া সামনে নির্বাচন। এসময়ে রামনগীনার মত প্রভাবশালী সর্দারকে চটানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

সুতরাং···

সুতরাং রাজনীতির লোকেরা এক্ষেত্রে যা করেন তাই হল। মায়া এবং আরও জনা দুই-এর প্রবল প্রতিবাদের জন্য তাঁরা মধ্যস্থতা করলেন। স্থির হল ব্যাপারটা এখন মুলতুবী রাখা হবে। এক রাশ ধোঁয়ার সঙ্গে যেন নিজের ক্ষোভকে বার করল তমাল।

প্রকাশ্য দুর্নীতির এমন ঘটনা সত্ত্বেও ? তাহলে সরকার বা অন্য দলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মানে কি ? সীমার ক্ষোভ গোপন রইল না।

বল—সেই কথা বলে কে ? তমাল সমর্থনের সুরে বলল। এই নিয়ে ভীষণ বাক্‌বিতণ্ডা—প্রায় আস্তিন গুটানোর উপক্রম হয়েছিল আজ কমিটির মিটিং-এ। মানে আমাদের সমর্থকরা তো মেজরিটি। কিন্তু পার্টির নেতাদের কথায় ব্যাপারটা মুলতুবী রাখতে হল।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে তার শেষাংশটুকু সক্ষোভে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তমাল আবার বলল, মালিক শ্রেণী বা বুর্জোয়াদের টাকা নিলে আমার আপত্তি হতনা···কিন্তু এতো শ্রমিক এবং তাদের ইউনিয়নের টাকা ঠকিয়ে নেওয়া। আন্তরিক ঊষ্মার সঙ্গে তমাল মন্তব্য করল।

তমালের কথা শুনে কেমন একটা করুণ হাসি ফুটে ওঠে সীমার মুখমণ্ডলে।

ভ্রু কুঁচকে তমাল প্রশ্ন করে, হাসছ যে ?

বলবে কি বলবে না—কয়েক মুহূর্ত এই নিয়ে দ্বিধা করার পর অবশেষে সীমা তেমনি সকরুণ হাস্যমণ্ডিত মুখে জবাব দেয়, আপনাদের এই ডিকটমি বা দ্বৈত মানসিকতা দেখে।

মানে ? তমাল প্রায় ফুঁসে ওটে।

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে সীমা জবাব দেয়, জীবনকে পরস্পর সম্পর্ক-বিরহিত ওয়াটারটাইট কামরায় ভাগ করা যায় না। বুর্জোয়াদের টাকার বেলায় একরকম নৈতিক মানদণ্ড আর শ্রমিকদের টাকার বেলায় অন্যরকম।

এই দু'মুখো নীতি চলবে না। ঠকানর স্বভাব যার হয়ে যাবে সে পাত্রাপাত্র বিচার করবে না—সুযোগ পেলেই ঠকাবে। যেমন রামনগীনাজী করেছেন বলে বলছেন। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সীমা আবার যোগ করল, শুধু তাই নয়—এই যে অফিসে-আদালতে, কলকারখানায় কাজে ফাঁকি দিয়ে শুধু আরও টাকা আরও টাকার যে বোল তুললেন আপনারা, তা কি আপনাদের রাজত্ব হলে দূর হয়ে যাবে ভাবছেন? কখনও না। দুই যুক্তফ্রণ্টের আমলে দূর হয় নি, ভবিষ্যতে আরও দীর্ঘকালের জন্য এবং এমন কি স্থায়ীভাবে রাজত্ব পেলেও তা হবে না। মানুষের স্বভাবকে একবার ফাঁকীবাজী শেখালে তারপর তা শোধরান সহজ নয়।

তমাল প্রথম দিকটায় একটু চুপসে গিয়েছিল। তারপর সামলে নিয়ে বলল, নিজেদের মানে শ্রমিক শ্রেণীর সরকার হলে শ্রেণীস্বার্থেই শ্রমিকেরা তখন কাজে ফাঁকি দেবে না। আরও বেশী উৎপাদন করবে সমাজবাদী পুনর্গঠনের জন্য, যেমন কমিউনিস্ট দেশগুলিতে করে।

তা করে না, করতে বাধ্য হয়। এবং কোন আদর্শবাদী প্রেরণায় নয়, স্রেফ চাবুকের ভয়ে। জান বাঁচাবার তাগিদে। সীমা তেমনি বিষণ্ণ ক্ষোভের সঙ্গে বলতে থাকে। দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক-শ্রমিকদের মাথার উপর সব সময় চাবুক উদ্যত রাখার ভয়ের ব্যবস্থাটা যে কী ভীষণ এক অক্টোপাসের মত, তার কথা ভাবতেও ভয় হয়। ঐ রকম ভয় আর তার সহকারী গোপনীয়তা, ষড়যন্ত্র, তোষামোদ—এই সব দিয়ে নূতন সমাজ আর নূতন সংস্কৃতি গড়বেন? হায়, আপনাদের অন্ধবিশ্বাস! কেমন উদাসভাবে দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক ভাবে শেষের কথাগুলি সীমা বলে।

একেবারে পুঁজিবাদী আর সাম্রাজ্যবাদী অপপ্রচার! নিম্ন কণ্ঠে কতকটা যেন নিজেকে প্রবোধ দেবার ভঙ্গীতে তমাল উচ্চারণ করে। তবে সে কণ্ঠস্বরে যেন তেমন জোর নেই।

কয়েক মিনিট উভয়েই চুপ করে থাকে। তারপর যেন সেই নীরবতাকে ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গীতে তমাল বলে, নাও—তর্কাতর্কি আর ভাল লাগছে না। সারা দিনে অনেক হল। এবার—এবার একটা গান কর বরং। মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হোক। তমাল আর একটা সিগারেট ধরাল।

গান! তমাল উপযাচক হয়ে গাইতে বলছে!! সীমার মনের সেতারের সব তারগুলি যেন এক সঙ্গে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। উদাস বিষণ্ণভাব কেটে গিয়ে মুহূর্তে ও যেন প্রাণস্পন্দনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তারপর আর অনুরোধের

অপেক্ষা না করে গুণ্ গুণ্ করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে আশে পাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। না, লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত ভীড় নেই। তারপর গান ধরল :

আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে দোলাও,
কে আমারে কী-যে বলে ভোলাও ভোলাও ॥
ওরা কেবল কথার পাকে নিত্য আমায় বেঁধে রাখে,
বাঁশির ডাকে সকল বাঁধন খোলাও ॥

ক্রমশ : তমালের অস্থির ভাব যেন একটু একটু করে কেটে যায়। শুধু তাই নয়—গাইতে গাইতেই নজরে পড়ে সীমার, তমাল হাত দিয়ে তাল দিচ্ছে নিজের পায়ের উপরে। খুব যে তালে তা হয়ত নয়। তবে গানটা যে মন দিয়ে উপভোগ করছে ও তাতে কোন সন্দেহ নেই। সীমার মনে মনে আনন্দ হল। উৎসাহ বেড়ে গেল। আরও দরদ দিয়ে ও গাইতে লাগল :

মনে পড়ে, কত না দিন রাতি
আমি ছিলেম তোমার খেলার সাথি।
আজকে তুমি তেমনি করে সামনে তোমার রাখো ধরে,
আমার প্রাণে খেলার সে ঢেউ তোলাও ॥

গান শেষ হল, সীমা থামল। তমালও নীরব হয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

গানটা নিশ্চয় সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের—মানে রবীন্দ্রনাথের লেখা। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে তমাল প্রশ্ন করল। রবীন্দ্রনাথকে জোর করে বিদ্রূপ করার কষ্টকর প্রয়াস সীমার কান ধরে ফেলল।

তমালের প্রশ্নের ভঙ্গীতে সীমা তাই মুখ টিপে হাসল। তারপর বলল, রবীন্দ্রনাথ 'চিরকালই বৃদ্ধ ছিলেন মনে করার কোন কারণ নেই, অন্ততঃ এই গানটি লেখার সময় যে বৃদ্ধ ছিলেন তা হলফ করে বলতে পারব না। আর যদিও বা থাকেন, তাহলে কি হয়েছে ?

না, ভাবছি। তমাল অন্যমনস্কের মত জবাব দিল।

কি ? সীমার কণ্ঠের কৌতুক গোপন রইল না।

তমাল কিন্তু গম্ভীরভাবে জবাব দিল, মানে তোমার এই "তোমার আপন হাতে" দোলান—এতো আমার বা আমার মত কোন মানুষের ব্যাপার নয় নিশ্চয়। তোমার হৃদয় আমার মত সাধারণ রক্ত-মাংসের মানুষ দোলাবে— এত অল্পে তুমি বা তোমার গানের গুরু রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় সন্তুষ্ট হবেন না।

সীমার বুকের ভিতরটা গুর্ গুর্ করে উঠল। হৃৎপিণ্ড যেন বক্ষপঞ্জরে আছাড় খেয়ে পড়ল। কয়েক মিনিট আচ্ছন্নের মত হয়ে রইল ও।

তমাল তখনও বলে চলেছে, তা সেই তিনি রবীন্দ্রনাথ আর তোমার হৃদয়ে যত পারুন দোলা দিতে থাকুন। আমার আপত্তি নেই—আর থাকলেও শুনছে কে? কিন্তু যা বলছিলাম তাহল এই যে, আমাদের মত সাধারণ মানুষকে ফাঁক পেলেই তাঁর মহিমা শোনাবার দরকার কি? ওসব তুমি টুমিতে আমার আস্থা নেই। শোষক শ্রেণীর বুজরুকী ঐসব অতিপ্রাকৃত শক্তির কল্পনা। শোষিতদের এ আফিং খাওয়ানর মত ঘুম পাড়িয়ে রাখে।

সীমা এতক্ষণে নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়েছে। আর চুপ করে থাকা ভাল দেখায় না বলে যথাসম্ভব হাল্কাভাবে বলার চেষ্টা করল, কোথায় ঘুম পাড়ান? শোষিতরা তো জেগেই রয়েছে। অন্ততঃ আমার সামনে যিনি…

তমাল হেসে ফেলল। বলল, খুব ঠাট্টা শিখেছ দেখছি! পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বলল, সিরিয়াসলি বলছি। তোমার সব কিছু ভাল। কিন্তু—কিন্তু কয়েকটা অবসেসন যদি না থাকত…যেমন এই ভগবান ভগবান বাতিক। মানে কেন তুমি বুঝতে চাও না যে ভগবান বলে কোন কিছু…

শেষের কথা যেন শোনেনি সীমা। ওর কানের ভিতর আবার সেতারের ঝঙ্কার। উত্তাল-উদ্দাম। কিন্তু অভিভূত হলে চলবে না ওর, ভেসে যাবে না ও। তাই মাঝ পথে বাধা দিয়ে ও বলে উঠল, এই না একটু আগে বলছিলেন যে সারা দিন তর্কাতর্কি করে আর ভাল লাগছে না? তাহলে আবার তর্ক কেন? তাছাড়া রইলই না হয় একটু অবসেসন আমার ভিতর। চাঁদেও তো কলঙ্ক আছে…নিজের অগোচরেই কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল সীমার! একি এতটা আবেগপ্রবণ হয়ে গেল ও কি করে? এতটা পার্সোন্যাল হল কেন? সাবধান, সাধু সাবধান! বেশ কিছুটা আয়াস করেই গলা পরিষ্কার করে তাড়াতাড়ি ও বক্তব্য শেষ করল, দ্বৈত আচরণের সমর্থক আপনি—আমার এ অদ্বৈত চট্ করে বোঝাতে পারব না। শেষের দিকে ওর কণ্ঠস্বর মাত্রাতিরিক্ত নৈর্ব্যক্তিক হয়ে পড়ল।

এই তো তোমার দোষ—অমনি মেটাফিজিক্স এনে ফেললে! বিব্রত ভাবে তমাল বলল। তারপর ওর একখানা হাত চেপে ধরে আন্তরিকতা সহকারে যোগ করে, রাগার কিছু নেই—ব্যাপারটা তোমাকে বুঝিয়ে বলছি।

সীমার দেহের প্রতিটি অনুপরমাণু যেন থর থর করে কেঁপে ওঠে। মস্তিষ্কের কোষে কোষে কী এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ! এক মুহূর্তের জন্য ও

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কথা বিস্মৃত হয়। তারপর হঁস হতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত হাতটা সরিয়ে নেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠে তমালের কাছ থেকে আরও খানিকটা দূরে গিয়ে সচকিত দৃষ্টিতে তমালের দিকে তাকিয়ে যেন ওর মনের ভিতরটা পর্যন্ত দেখার প্রয়াস করে।

কিন্তু না, তমালের মধ্যে কোন বিকার নেই। ব্যগ্র চোখ দুটি ওর দিকে তুলে ধরে একান্ত সরল ভাবেই বলছে, ওসব ভগবান টগবান যদি থাকত তাহলে দুনিয়াতে এই অসাম্য···এই অবিচার কেন? আসল কথাটা হচ্ছে···

অবিশ্বাসীদের চিরকালের প্রশ্ন তমালের কণ্ঠে, যার জবাব দিতে বিশ্বাসী-দের তরফ থেকে কোন কালেই কোন কসুর হয় নি। কিন্তু এমন আন্তরিকতা সহকারে তমাল আবার ঐ প্রশ্ন উত্থাপন করে চলেছে যে সীমা যে শিহরিত হয়ে পিছনে সরে গেল তার দিকে খেয়াল নেই তমালের।

এ আবেগকে এমনি থামান যাবে না। তাই নিজের কণ্ঠকে মনে মনে শাসন করে সীমা রঙ্গ ভরে বলে, মাপ করুন আপনার বুঝিয়ে বলা। ব্যাপারটা সুকুমার রায়ের বুঝিয়ে বলার মত হচ্ছে নাকি? এদিকে ক'টা বেজেছে খেয়াল আছে? আমাকে বাড়ী ফিরতে হবে না?

তমাল বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে সচেতন হয়। অপ্রতিভ কণ্ঠে বলে, তাই তো! তাই তো বড় দেরী করিয়ে দিলাম তোমার!

বাড়ী ফিরতে দেরী হবার জন্য কিন্তু সীমার মনে কোন উদ্বেগ নেই। বাসের ভীড়ের কষ্টও ওর মনে রেখাপাত করছে না। তমাল ওর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে রড ধরে। বাসের ঝাঁকুনীতে মাঝে মাঝে ওর দেহের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাচ্ছে। কখনও বা দুটি একটি অপ্রয়োজনীয় বাক্যবিনিময়। সীমার সমস্ত জগৎ যেন আনন্দময়। কীসের নেশায় বুঝি বুঁদ হয়ে আছে সীমা।

তমালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেন এক স্বপ্নের ঘোরে বাস থেকে নামল সীমা।

কিন্তু বাড়ীর দিকে কয়েক পা এগোতেই ওর সেই স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল। ওদের বাড়ীতে পৌঁছানর আগে রাস্তার উপরেই ছোটখাট একটি জটলা। সামনেই বিমানদের বাড়ী—নীতুর বন্ধু বিমান। এক সঙ্গে ওরা পড়ত, উঠত বসত। নীতুর সঙ্গেই ওর দলে যোগ দিয়েছিল। সীমা থমকে দাঁড়াল।

বিমানদের বাড়ীর ভিতর থেকে মেয়েলী স্বরে একটানা বুক ফাটা কান্নার স্বর ভেসে আসছে—ওরে বিমান রে—বিমান—আ—আ ন।

সীমাকে দাঁড়াতে দেখে পাড়ার কয়েকটি ছেলে এগিয়ে এল। যতীশও ওদের মধ্যে। সে বলল, বহরমপুর জেলে ওদের দলের আরও অনেকের সঙ্গে বিমানদাকেও খুব মেরেছে ওয়ার্ডাররা। বাঁচেন কি না বাঁচেন। খবর পেয়ে ওঁর বড়দা আর মামা রওনা হয়ে গেছেন।

সীমার পা যেন মাটির সঙ্গে এঁটে গেছে। কয়েক মিনিট স্তম্ভিতের মত ছেলেদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল ও। তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করে যতীশের উদ্দেশ্যে বলল, বাড়ী চল। কিছু করার নেই। অসহায় বাড়ীর লোকেদের কাঁদা ছাড়া আর কিছু করার নেই। পশ্চিম বাংলার কত ঘরে যে এই অসহায় কান্না আজ! না-শুধু আজই বা কেন, আজ কত দিন-বছর ধরে!

এগোতে এগোতে যতীশকে উদ্দেশ্য করে সীমা বলল, পূজো পার হয়ে গেছে কবে। কিন্তু এখনও পড়াশুনায় মন না দিয়ে সন্ধ্যার পর বাড়ীর বাইরে। পরীক্ষা দেবে কি করে?

যতীশ বিব্রত ভাবে জবাব দিল, বাঃরে—পাড়ার মধ্যে এমন একটা ব্যাপার হলে...আর তাছাড়া বিমানদা···একটু থেমে যতীশ আবার যোগ করে, জান বড়দি—বাৎসরিক পরীক্ষা এবারে বোধহয় হবে না।

মানে? সীমা বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

যতীশ বেশ সপ্রতিভ কণ্ঠেই জবাব দেয়, ওরা, মানে দাদা আর বিমানদার পার্টির ওরা হতে দেবে না। ওরা বলছে...মানে দেওয়ালে দেওয়ালে লিখে দিয়েছে যে এ শিক্ষায় কিছু হয় না। তাই তো স্কুল কলেজে আগুন দিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছে ওরা। কবে যে আমাদের স্কুলটাতেও দেবে! বেশ হাসি হাসি মুখে সেই প্রত্যাশিত শুভ দিনটিকে স্বাগত জানায় যতীশ।

বাড়ীর দরজার সামনে পৌঁছে যাওয়ায় যতীশকে আর কিছু বলতে পারে না সীমা। আর বলেই বা কি হবে? এসব কথা আকাশে বাতাসে ঘুরছে এখন। কত জনকে কি কি ব্যাপার নিয়ে শাসন করবে সীমা?

আতঙ্ক ওদের ঘরেও। পিসেমশাই মশারীর ভিতর থেকেই উঁ আঁ করছেন। রমার মুখও পাংশুবর্ণ। বড় পিসি খুলেই বললেন কথাটা। খবরটা পাবার পর থেকে শুধু সেই হতভাগার কথাই মনে পড়ছে। নীতুটা··· বলতে বলতে বড় পিসির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

CENTRAL LIBRARY

সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে সীমা বলল, ভয় পাচ্ছ কেন বড় পিসি ? নীতু তো আর জেলে নেই। সেদিনও তো গোলপার্কে দেখা হয়েছিল।

কান্না জড়ান কণ্ঠে বড় পিসি বললেন, ভরসাও কি মা ?

এই তো সেদিন কলেজস্ট্রীট পাড়ায় দেওয়ালে দেওয়ালে লিখছিল বলে কটা ছেলেকে গুলি করে মারল। যা চলেছে চতুর্দিকে···তা ঠিকই বলেছেন বড় পিসি। উত্তর কলকাতায় নয় ঘণ্টা ধরে নকশালপন্থী ও পুলিশে লড়াই। ট্রামে বাসে আগুন। তিন জন গুলি বর্ষণে মৃত। এর মধ্যে ঘণ্টায় ৬৬ মাইল বেগে ঝড় বয়ে গেল। শুধু কলকাতা বা পশ্চিম বঙ্গই নয়। পূর্ববঙ্গও ঝড়ে তছনছ। হাজার খানেক মৃত আর হাজার চল্লিশেক আহত।

ডেবরাতে হাজার খানেক গ্রামবাসী নকশালপন্থীদের ঘিরে ফেলে দুই জন আদিবাসী নেতাকে ধরতে পুলিশকে সাহায্য করেছে। বেলেঘাটায় পুলিশ আর মার্কসবাদীদের মধ্যে লড়াই-এ দুই জন অফিসার ঘায়েল। কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মূর্তির মাথা কাটা। এর মধ্যে ট্রাম ধর্মঘট গেল এক দিন। সীমাদের বাড়ীর কাছে চণ্ডীতলায় মার্কসবাদী মেয়রের উপর নকশালদের হাঙ্গামা। মেয়র পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। এক দিনে ছয় জায়গায় গুলিতে ছয় জন নিহত।

এর মধ্যে ভাইফোঁটা পার হয়ে গেল। রমা চোখের জল মুছতে মুছতে নীতুর উদ্দেশ্যে দেওয়ালে ফোঁটা দিল। পাছে রান্না ঘরে বড় পিসির চোখে পড়ে যায়—এই বলে রমাকে কোন মতে থামিয়ে সীমাও দেওয়ালে ফোঁটা দিল। হারু আর নীরুর উদ্দেশ্যেও।

পরের দিনের খবর—বালিতে জনতা ও পুলিশের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ। আগের দিন আটক নকশালদের ফোঁটা দেবার দাবিতে তাদের বোনেদের থানা অভিযান এবং পুলিশের আইনে এটা চলে না বলে বাধা দান। ফলে হাঙ্গামা ও ঐ খণ্ডযুদ্ধ। ঐ দিনই বেলেঘাটার জোড়ামন্দির এলাকায় রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ভেঙ্গে তাকে লোপাট করা। এবং শূন্য বেদিতে মাও-এর ছবি এঁকে রবীন্দ্রনাথেরই কবিতায় তাঁর বন্দনাঃ "মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক।" সেদিন গোলপার্কে নীতিশের মধ্যে যে স্ববিরোধ লক্ষ্য করেছিল সীমা, এখন দেখছে ওদের দলের আরও অনেকেই তার শিকার।

দিন কয়েক পরে অফিসের টিফিন রুমে উত্তেজিত আলোচনা হচ্ছিল। সোদপুরের সেই মেয়েটি উত্তেজিত কণ্ঠে বলছিল, এসবের সঙ্গে তুলনা হয় গত বছর বৈশাখ মাসে খড়দার বাজারের নারায়ণ দাস বলে যে ভদ্রলোকটিকে

প্রকাশ্য দিবালোকে পিটিয়ে মারা হয়—সেই ঘটনার সঙ্গে। ভদ্রলোকের অপরাধ মেয়েদের অপমানকারী দুই মস্তানকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেছিলেন...

আক্রমণের ভঙ্গীতে মায়া বলল, কেন তোমাদের মতে তো সি. পি. এমই যত নষ্টের গোড়া। এদিকে তাদেরই এক নেতার স্ত্রী—স্কুলের এক জন শিক্ষয়িত্রী, ক্লাসে পড়াবার সময় এমন মারাত্মক ভাবে ছোরা খেলেন!

যুথিকাদি মধ্যস্থতার ভঙ্গীতে বললেন, কোন দলের কথা হচ্ছে না। যে দলই খুনোখুনী করুক, এটা খারাপ। এত হৃদয়হীন হলে আর মানুষ কি···

মলয়াদি তাঁর কথার রেশ ধরে বললেন, নিষ্ঠুরতা বলে নিষ্ঠুরতা! হালতুর সেদিনকার ঘটনাটার কথা ভাব। দিন দুপুরে ক্লাস থেকে একটা পনের বছরের ছেলেকে টেনে নিয়ে গিয়ে স্কুলের মধ্যেই খুন করা! মা গো—কী করে পারে ওরা?

সীমা বলল, আজকের কাগজে মুচিপাড়াতে নকশালের হাতে আর এক নকশালের গলা কাটার যে খবর আছে—এই সবেরই পরিণাম তা। বলেছে, নাকি নিছক মতভেদের জন্য এই খুন। একটু থেমে সীমা আবার যোগ করে, অস্ত্র যে ধরে—অস্ত্রেই তার জীবনের উপর যবনিকা পড়ে। পরকে খুন করতে করতে খুনের পিপাসা শেষকালে আত্মজনের রক্ত পান করে।

কথাটায় সত্য আছে, এক জন বলল। আজকের আর একটা খবর চোখে পড়েছে নিশ্চয়, তমলুকের এক গ্রামে নকশালদের অত্যাচারে পীড়িত একটি গ্রামের অধিবাসীরা একটি নকশাল ছেলেকে ধরে তার চোখে অ্যাসিড ঢেলে প্রতিশোধ নিয়েছে।

আহা, কোন্ মায়ের সর্বনাশ হল! যুথিকাদি আর্তনাদ করে উঠলেন।

সত্যি সওয়া যায় না আর। বরানগরে নেতাজীর আর দেশপ্রিয় পার্কে যতীন্দ্রমোহনের মূর্তি ভাঙ্গছে—এসব খবর যদিও বা সয়ে আসছে কিন্তু সেদিন গ্যালিফস্ট্রিট আর আমাহার্ষ্ট স্ট্রিট অঞ্চলে পুলিশের গুলি, আর উগ্রপন্থীদের বোমা ও পাইপগানে পাঁচ জন মরল, অথবা তার পরের দিন কসবাতে তিন জন অকালে প্রাণ দিল—এসব খবর যেন আর শোনা যাচ্ছে না। সীমাদের বান্ধবীদের একজন বলল।

আর জোয়ান ছেলেগুলোর উপর পুলিশের জুলুম—বেধড়ক মারপিট আর কত রকমের অত্যাচার! কানে শোনা যায় না সেসব কথা। আর একজন মন্তব্য করল।

মলয়াদি বললেন, পুলিশই বা কি করবে—ওরাও তো মানুষ! ওদের

উপরও তো মারধর কম হচ্ছে না। পুলিশ খুনও হয়েছে অনেক, ওরাও যেন তাই পাগলা কুকুরের মত হন্যে হয়ে উঠেছে।

কে হন্যে হয়ে উঠল মলয়াদি আর কার জন্য? বলতে বলতে এক ঝলক দমকা হাওয়ার মত বন্দনা টিফিন রুমে ঢুকল।

মুহূর্তে মেয়েদের টিফিন রুমের মধ্যে প্রচণ্ড কলরব। কোথায় কোথায় গিয়েছিলি—কেমন সব দেখলি—এত দেরী হল কেন ইত্যাদি সমবয়সীরা নানা প্রশ্ন করল এক সঙ্গে।

হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে হাসি মুখে বন্দনা বলল, ট্রেন মাত্র সাত ঘণ্টা লেট ছিল বলে বাড়ীতে পৌঁছে কোন মতে মাথায় দু ঘটি জল ঢেলে কি না ঢেলেই ছুটে এসেছি। বড়বাবুর হাতে পায়ে ধরে যদি একটা দিনের ছুটি বাঁচান যায়। ছুটি আর নেই বললেই চলে।

বছর বছর এত বেড়ালে ছুটির আর কি দোষ? একজন নিম্নকণ্ঠে বলে।

কিন্তু বন্দনার কানকে এড়ান গেল না। ওর দিকে ফিরে কট্ কট্ করে জবাব দিল, বেড়াবার সঙ্গী থাকলে তুইও যেতিস। তা যখন নেই তখন শুধু শুধু হিংসে করে কি হবে?

যুথিকাদি বন্দনাকে ধমকে উঠলেন। বললেন, দিন দিন কি হচ্ছ তুমি বন্দনা? একেবারে তপ্ত খোলার মত হয়ে আছ যেন। মুখের লাগামও নেই একেবারে।

যুথিকাদি আর মলয়াদির হাঁ হাঁ অগ্রাহ্য করে বন্দনা তাড়াতাড়ি তাঁদের পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, মাপ করবেন—আপনারা আছেন ভুলে গিয়েছিলাম। ওর কণ্ঠের কৃত্রিমতা আর অভিনয়পটুতা কারও দৃষ্টি এড়াল না। সুতরাং আর এক দফা হাসির রোল উঠল। এর পর আর কি বলা চলে?

এদিকে টিফিনের সময় ও শেষ।

সীমা উঠছিল। বন্দনা তাড়াতাড়ি ওর হাত ধরে একটা হেঁচকা টান দিয়ে বলল, বেঁচে আছিস মুখপুড়ি? আজ···আজ থাক বরং কাল বলব। তোর সঙ্গে জরুরী কথা আছে।

পরের দিন এক সময়ে বন্দনা সীমার টেবিলে এসে হাজির হয়। অভ্যাস মত নির্দিষ্ট নম্বরটি ডায়াল করেই নির্দিষ্ট ব্যক্তিটিকে চায়। তারপর সীমার উপস্থিতি একেবারে অগ্রাহ্য করে মনের কথা বলা শুরু করে।

এই, ভাল লাগছেনা এমনি একা একা এত দিন এক সঙ্গে থাকার পর সারা রাত শুধু এপাশ ওপাশ করেছি। আর কত দিন এমনি চলবে? হুঁ—

তুমি তো তাই বলবে ! এত দিন পর আমি তো অধৈর্য বটেই। না-না-কোন কথা শুনব না আমি। আর ছয় মাস—মানে একাত্তর সনের মে মাস পর্যন্ত সময় দিলাম। এর মধ্যে একটা ফ্ল্যাট জোগাড় করতেই হবে তোমাকে যে কোন উপায়ে। তা না হলে আর দেখা শোনা, মেলা মেশা—কিছু নয়। ওতে আমার মন আরও খারাপ হয়ে যায়—হাতের কাছেই জলের গ্লাস, অথচ খেতে পারব না। হ্যাঁ—কি বলছ—না ? আমারও অফিস আছে...কাজের দোহাই আমিও দিতে পারি। না—হ্যাঁ। সত্যি-সত্যি, আচ্ছা, ছাড়ি এবার।

সীমা তাড়াতাড়ি হাতের কাগজপত্রের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। ফোন ছাড়ার আগে বন্দনা অধরোষ্ঠ কুঞ্চিত করে নির্লজ্জ সেই শব্দটা করবে।

ফোন ছেড়ে দিয়ে কয়েক মিনিট চুপ চাপ বসে থাকে বন্দনা। ওর পক্ষে এমন চুপ করে থাকা অস্বাভাবিক ব্যাপার !

সীমাই তাই নীরবতা ভঙ্গ করে, কি হল রে ? শরীর ভাল নেই ?

ম্লান হেসে বন্দনা নিজের বক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সীমা প্রশ্ন করে, কি—বুকে ব্যথা ?

বন্দনা এবারে খিল খিল করে হেসে ফেলে। বলে, দূর কোচবিহারী গবেট। ব্যথা বাইরে নয়—ভিতরে, মনে, শুনলি তো সব। আর এভাবে একা একা ভাল লাগে না। বিশেষ করে ছুটি ছাটায় এক সঙ্গে কিছু দিন কাটাবার পর। আর তাছাড়া শিং ভেঙ্গে তোদের মত বাছুরদের সঙ্গে যতই মিশি না কেন, মেঘে মেঘে বেলা মানে বয়স তো কম হল না আমার...

তা শুনেছি যে তোরা···তোরা তো ইয়ে মানে...কথাটা আটকে যায় সীমার কণ্ঠে।

ইয়ে মানে বিয়ে তো ? তা করেছি একটা ঠিকই নিয়ম রক্ষার মত। পাণ্ডুর হাসির সঙ্গে বন্দনা বলে। কিন্তু ঐ রেজিস্ট্রি করা পর্যন্তই। তারপর এই তিন বছরেরও উপর হল হা পিত্যেশ করে বসে আছি।

কিসের জন্য ? সীমার প্রশ্ন।

মেয়ে মানুষ হয়েও জিজ্ঞাসা করছিস এ কথা ? বন্দনা ঝঙ্কার দিয়ে বলার চেষ্টা করে। কিন্তু উষ্মার বদলে কেমন যেন আর্তনাদ ফুটে ওঠে, শুধু প্রেম করে ফুলে ফুলে মধু খেয়ে মেয়ে মানুষের মন ভরে না। আর দশটা মেয়ের মত আমিও ঘর কন্না করতে চাই, রেঁধে বেড়ে স্বামী আর ছেলে মেয়েদের খেতে দিতে চাই।

তা বাধা কিসের ?

বিয়ের আগে বাধা ছিল আমার তরফে। মা বাবার জ্যেষ্ঠ সন্তান হবার ট্যাক্স দিতে হয়েছে চাকরী করে বছরের পর বছর সংসার টেনে। ভাই-এর পড়ার খরচ যদি জোটে তো বোনের বিয়ের খরচের কি হবে? প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড আর কোঅপরেটিভ থেকে ধার নিয়ে বোনের যদি বিয়ে দিলাম তাহলে তার জন্য জামাই ষষ্ঠীর তত্ত্ব আর সাধের খরচ জোটাও। আর তাও যদিও বা হল তো বাবার স্ট্রোক্। এখন তাঁর চিকিৎসার খরচ জোগানর কামধেনু আমি। কারণ ভাইরা বেকার। বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের চিরকালের কাহিনী—পান্তা আনতে নুন ফুরোয়। অবস্থার আর উন্নতি হবে বলে ভরসা না হওয়ায় বছর চারেক অপেক্ষা করার পর অবশেষে এক দিন মরীয়া হয়েই রেজিষ্ট্রিটা সেরে ফেললাম।

সহানুভূতিতে সীমার দৃষ্টি গাঢ় হয়ে আসে। আবেগ মণ্ডিত কণ্ঠে ও বলে, তা বিয়ে করেও তো অনেক মেয়ে তো আজকাল বাপের বাড়ীতে সাহায্য করে নিজের মাইনের টাকায়। তুইও নাহলে তা-ই করতিস! উনি—মানে উনি নিশ্চয় বাধা দিতেন না।

আবার কয়েক মিনিট বন্দনা যেন ঝিম্ মারার মত চুপ করে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বলে, না বোধহয় ও 'দতনা। সেদিক থেকে মানুষটা খুবই বিবেচক। কিন্তু—কিন্তু···বলতে বলতে বন্দনার চোখে মুখে এক ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে। কিন্তু ওর সংসার—ওর দু দুটো সংসারে চলবে কি করে? একটা সংসারই চলেনা আজকাল একার রোজগারে।

দু দুটো সংসার! অকৃত্রিম বিস্ময়ে সীমা উচ্চারণ করে।

ব্যঙ্গ ভরে বন্দনা বলতে থাকে, হ্যাঁ দু দুটো। ও দীর্ঘ দিন বিয়ে না করলে কি হবে? ওর পিতৃদেব সে ক্ষোভ মিটিয়ে গেছেন। প্রথমার মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক ছেলেমেয়েদের মানুষ করার সাধু সঙ্কল্প নিয়েই নাকি তাঁর দ্বিতীয় বার ছাঁদনা তলায় যাওয়া। তা দ্বিতীয় আসতে না আসতেই প্রথম পক্ষের ওকে ভাই বোন সহ মামাবাড়ীতে যেতে হল, সেখানেই মানুষ ওরা সবাই। আর ইতিমধ্যে দ্বিতীয়ার গর্ভে ওর পিতৃদেবের সন্তান সংখ্যা বাড়তে বাড়তে পৌনে এক ডজনের কোঠায় পৌছাল, অবশেষে বছর কয়েক আগে উভয় পক্ষের প্রায় এক ডজন ছেলেমেয়ে রেখে তিনি পরলোকের টিকিট কেটেছেন। বিশ্বাস করবি—ওর ছোট ভাইটার বয়স মাত্র দশ বছর? সম্পত্তির মধ্যে রেখে গেছেন একটি পৈতৃক বাড়ী আর প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের হাজার কয়েক টাকা। তিনটি বোনের বিয়ে দিতে ঐ টাকা তো গেছেই,

ওকেও ধার নিতে হয়েছে নিজেদের অফিস থেকে। সুতরাং অবস্থাটা—মায়ে মেরেছে, ঘরেও ভাত নেই গোছের।

কয়েক মিনিট উভয়েই নিঃশব্দে বসে থাকে।

তারপর সীমাই আবার নীরবতা ভঙ্গ করে। বলে, তা একটা বাড়ী যখন আছে তখন সেখানে তো নিয়ে যেতে পারতেন বিয়ে করে।

বন্দনা যেন শিউরে উঠল। বলল, ক্ষ্যামা দে ভাই। ঐ নরকের মধ্যে আরও কয়েকটা অপোগণ্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করা? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বন্দনা যেন সেই নারকীয় অবস্থার ভীষণতার কথাই কল্পনা করতে লাগল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বলল, জানিস জ্ঞান হয়ে অবধি মেঝেতে ঢালা বিছানায় অথবা এক তক্তাপোষে পাঁচ ভাই বোন আমরা গাদাগাদি করে শুতাম। দেড় কামরার বাসা বাড়ীতে আর জায়গা কোথায়? জ্ঞান হয়ে অবধি দুই তিন জনে একই লেপ নিয়ে টানাটানি করেছি। ছোট ভাই-বোনেদের কুকর্মের দুর্গন্ধযুক্ত তোষক কাঁথায় নিয়মিত ভাবে শুয়েছি। আর সঙ্গে সঙ্গে ভেবেছি কবে বড় হব, রোজগার করব নিজের ঘর সংসার হবে আর বেশী কিছু নয় একটু ছিমছাম থাকব। পরিষ্কার বিছানা, কাচা তোয়ালে গামছা, বারোয়ারী নয়—নিজের একটা চিরুণী কি দুই একটা স্নো পাউডারের কৌটো, সাবান যা ঠিক জায়গায় থাকবে। তা নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালী মেয়ের সে স্বপ্ন এই এতকাল পরেও স্বপ্নই রয়ে গেল। আবার বন্দনা গুম্ হয়ে রইল।

আবার কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা। তারপর হঠাৎ বন্দনাই নীরবতা ভঙ্গ করল। গুম্ ভাবটা যেন জোর করে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে স্বপ্নোত্থিতের মত বলল, কী বাজে বকে মরছি নিজের কথা সাত কাহন করে—মরণও হয় না আমার? তোর কি খবর বল্—তমালবাবুর···।

চকিত বিস্ময়ে সীমা বন্দনার দিকে তাকিয়ে দেখে ওর সেই ক্ষণপূর্বের ঝিম্মারা ভাব আর নেই। কৌতুক আর চপলতায় ওর চোখ দুটি এক জোড়া খঞ্জনের মত নেচে উঠেছে। এতদিন রঙ্গ ব্যঙ্গে প্রাণোচ্ছল যে বন্দনাকে দেখতে সবাই অভ্যস্ত এ সেই বন্দনা।

সীমা তাড়াতাড়ি বন্দনার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, আবার ঐসব—

(ক্রমশঃ)

(৪৭২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কাটাতে পারে। তার ভাবাবেগগুলি নিয়ে যদৃচ্ছ টানটানি করা হয় না।

কিন্তু টোট্যালিটেরিয়ান রাষ্ট্রে ঠিক এর বিপরীতটাই ঘটে। এ-রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যই হলো : তা জনসাধারণের চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণ করবে ঠিকই কিন্তু তাদের একটা স্থায়ী ছাঁচে রূপ দেবেনা। একদিকে যেমন কতগুলি প্রশ্নাতীত বিশ্বাস বা dogma-র প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে তেমনি অন্যদিকে মাঝে মাঝে তাতে অদলবদলও ঘটানো হবে। ঐ dogma গুলো খুবই দরকার কারণ তার প্রয়োজন যে প্রজাদের প্রশ্নহীন বশ্যতা। কিন্তু ক্ষমতাবাদী রাজনীতির তাগিদে তাতে মাঝে মাঝে কিছু পরিবর্তনও জরুরী হয়ে পড়ে, তাও সে এড়াতে পারে না। একদিকে এ-রাষ্ট্র নিজেকে অভ্রান্ত বলে ঘোষণা করে, অপরদিকে আবার বিষয়মুখ (objective) সত্যের ধারণাও অস্বীকার করে।

একটা স্থূল দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর পর্যান্ত প্রত্যেক জার্মানমাত্রকেই রুশ বলশেভিকতন্ত্রকে ঘৃণা ও আতঙ্কের চোখে দেখতে বলা হতো। আবার ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর থেকে তাকে ঐ রুশ বলশেভিকবাদকেই প্রীতিও প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখতে বলা হলো। যদি রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধ বাধে * এবং পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই তার সমূহ সম্ভাবনা,—আবার একবার জার্মানদের মনোজগতে একটা বড় ওলটপালট ঘটবে। জার্মানদের সব চিত্তবৃত্তি, তাদের ঘৃণা ভালবাসা ইত্যাদি রাতারাতি সরকারী প্রয়োজনে, যখন যেমন তখন তেমন পালটে যাবে, এটাই তাদের সরকারের হুকুম। এখন, সাহিত্যের উপরে এজাতীয় ব্যাপার স্যাপারের প্রভাবটা কেমন হতে পারে তা আর খুলে বলার দরকার করেনা। কারণ সাহিত্যরচনা হৃদয়ের অনুভূতি নির্ভর এবং অনুভূতি বাইরের চাপ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। যখনকার যেমন তখনকার তেমন সরকারী গোঁড়ামির প্রতি মৌখিক আনুগত্য প্রকাশ করা চলে বটে, তবে ভালো লেখা কেবল তখনই সম্ভব যখন লেখক যা হৃদয় দিয়ে সুনিশ্চিত অনুভব করেছেন তারই বিষয়ে বলেন। ওটি না হলে সৃজনী প্রেরণাই আসতে পারে না।

তথ্য-প্রমাণাদি থেকে আমরা এটা বলতে পারি যে, টোট্যালিটেরিয়া-নিজ্‌ম্ তার অনুগামীদের কাছে ভাবাবেগের যেরূপ হটাৎ-হটাৎ পরিবর্তন

*এই প্রবন্ধটি ১৯৪১-এ জার্মানী কর্তৃক রাশিয়া-আক্রমণের পূর্বে লিখিত ও রেডিওতে পঠিত হয়েছিল। তখন জার্ম্মানীর সঙ্গে রাশিয়ার মিত্রতার সম্পর্ক চলছিল।—সম্পাদক

দাবী করে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে তা অসম্ভব। এবং তাই আমি বলেছি যে, যদি টোট্যালিটেরিয়ান-তন্ত্র সারা বিশ্বে জয়ী হয়, তা হলে সাহিত্য বলতে এতদিন আমরা যা জেনে এসেছি তার ইতি। এবং বাস্তবিক পক্ষে এখন পর্য্যন্ত সাহিত্যের উপর টোট্যালিটেরিয়ানিজমের প্রভাব মোটেই ভিন্নরূপ কিছু হয় নি। যেমন, (ফ্যাসিষ্ট) ইটালীতে সাহিত্যকে পঙ্গু করা হয়েছে, এবং (নাৎসী) জার্ম্মানীতে তা আর বেঁচে নেই বল্লেই হয়। সোভিয়েট রাশিয়াতেও যে-সাহিত্যিক রেনেসাঁর প্রত্যাশা করা গিয়েছিল, তা ঘটেনি। বরং ওখানে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় লেখকদের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যই হলো, হয় তারা আত্মহত্যা করে, কিম্বা জেলের গারদের পেছনে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আমি আগে একবার বলেছি যে, উদারনৈতিক ধনতন্ত্রের দিন দৃশ্যতঃই শেষ হয়ে এলো ;—এ থেকে অনেকের হয়তো মনে হতে পারে যে আমি এখানে চিত্তের স্বাধীনতার মৃত্যুরই সুনিশ্চিত আভাষ দিয়েছি। আমার বিশ্বাস কিন্তু তা নয়। বরং আমি এটাই সোজাসুজি বলে এপ্রসঙ্গ শেষ করবো যে, সাহিত্য কেবল সেই সব দেশেই বাঁচবে বলে' আশা করা যায়, যেখানে উদারনীতির মূল সর্বাধিক গভীরে প্রবিষ্ট—যেমন অযুদ্ধবাদী দেশ-গুলিতে * পশ্চিম য়ুরোপে ও আমেরিকায়, এবং ভারতে ও চীনে †। আমার বিশ্বাস—এবং এ আমার সাধু আশা মাত্রই হয়তো—রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি সর্বব্যাপী হওয়া সত্ত্বেও, ঐ সব দেশে একপ্রকার অ-টোট্যালিটেরিয়ান সমাজবাদের উদ্‌বর্তন ঘটবে—যার ফলে,অর্থনৈতিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ বিলুপ্ত হলেও চিন্তার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হবে না। ঐ আশাই এখন একমাত্র আশা যা সাহিত্য-অনুরাগীরা পোষণ করতে পারেন। যারাই সাহিত্যের মূল্য সম্বন্ধে অবহিত, মানব-ইতিহাসের বিকাশে তার মুখ্য ভূমিকা সম্বন্ধেও সচেতন, তাদের অবশ্যই টোট্যালিটেরিয়ানিজ্‌ম্‌কে প্রতিরোধের জীবন-মরণ প্রশ্নটিও বিবেচনা করতে হবে ; তা সে টোট্যালিটেরিয়ানিজ্‌ম্‌ বাইরে থেকে আমাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হোক বা ভিতর থেকেই চাপানো, যা—ই হোক্‌ না কেন।†

---

* সুইজারল্যাণ্ড, স্কাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলি, আইসল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম —এগুলি য়ুরোপের অযুদ্ধবাদী দেশ।=সম্পাদক

† চীনেও যে দশবছরের মধ্যেই কম্যুনিষ্ট টোট্যালিটেরিয়ানিজ্‌ম্‌ জারী হয়ে যাবে, লেখক তা কল্পনা করেননি। =সম্পাদক

† এটি বি,বি, সি,-র বৈদেশিক রেডিও-সম্প্রচারে পঠিত। এবং Listener পত্রিকার ১৯ জুন ১৯৪১ সংখ্যায় প্রকাশিত।

CENTRAL LIBRARY

"রবীন্দ্র" পুরস্কার

এ বছর রবীন্দ্র-পুরস্কার নিয়ে তুমুল বাদ বিতণ্ডা হয়েছে। এখনো তা সম্পূর্ণ মিটে গেছে বলা চলে না। বিতণ্ডার কেন্দ্রে একটি বিক্ষুব্ধ অভিযোগ আবর্ত্তিত হচ্ছে এবং তা হ'লো এবারের পুরস্কৃত উপন্যাসটির (শ্রীসতীকান্ত গুহ রচিত 'নাটাকার'-এর) সাহিত্য মূল্য অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর এবং এই পুরস্কার পাবার সম্পূর্ণ অযোগ্য ; এবং একে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ উৎকর্ষ বিচারে নির্দ্ধারিত হয় নি, হয়েছে রবীন্দ্র পুরস্কার-কমিটির কিছু সদস্যের--পক্ষ পাতিত্বের জন্য। পক্ষপাতের বিবিধ কারণও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সংবাদপত্রে রবীন্দ্র-পুরস্কার নিয়ে এজাতীয় হৈ চৈ এর আগে আর দেখা যায় নি। বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজের সর্ব্বস্তরেই এর অভিঘাত লক্ষ্য করেছি আমরা। অনেকেরই অভিমত শুনেছি যে, 'রবীন্দ্র' পুরস্কার পাওয়ার পেছনে যোগ্যতা নয়, তা পাওয়ানোর কূট কৌশল ও নোংরা "কারবাই" টাই মুখ্য ব্যাপার। এবং এটা নাকি বেশ কিছুদিন ধরেই চলেছে। রবীন্দ্র পুরস্কার আর সাহিত্যিক উৎকর্ষের নিরিখ নয়, ওটা এখন চাকুরি পাওয়ার মতো বিশেষ গণ্যমান্য মুরুব্বিদের জোর তদ্বিরের পরিচয়—এমন কি আরো জঘন্য ঘুষের খেলাও বলা চলে।

জনমানসে এধরণের সন্দেহ ও অভিযোগ ধীরে ধীরে পুঞ্জিত হয়ে এবার-কার পুরস্কার উপলক্ষে ফেটে পড়েছে। এবং এ-জাতীয় সন্দেহ বহুব্যাপ্ত বলেই আজ এমন ধারা কুৎসিত পাঁক ঘুলিয়ে উঠতে পারলো। এর সত্যতা যা-ই হোক, এই-যে সন্দেহ যে, সর্ব্বক্ষেত্রে, এমন কি সাহিত্য-পুরস্কারের ক্ষেত্রেও—এবং সাহিত্যিকদের মধ্যেও—দুর্নীতির চক্র গূঢ়প্রবিষ্ট;—এর মধ্যে আমাদের সমাজের ভারী রুগ্ন একটা চেহারা যে ফুটে উঠেছে তাতে ভুল নেই। আজ এই বিক্ষুব্ধ অভিযোগের দর্পণে সত্যের যে প্রতিচ্ছবিটা ফুটে উঠেছে তাকে যেন আমরা সকলেই লজ্জা ও আত্মধিক্কারের সঙ্গে নত মস্তকে স্বীকার করে নিই।

এখন প্রশ্ন,—রবীন্দ্র-পুরস্কার কমিটির কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে দুর্নীতির অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা যদি থাকে, তবে তার প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান কী ভাবে সম্ভবপর। রবীন্দ্র-পুরস্কারকে দুর্নীতি ও অনাচারের উর্দ্ধে এমন ভাবে

প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যিক যে, জনমানসে তার ভাবমূর্তি কখনো যেন ম্লান না হয়।

বর্ত্তমানে রবীন্দ্র-পুরস্কার দানের প্রণালীটি, আমরা যতদূর জানি, এইরূপ। পঃ বঙ্গ সরকার প্রতিবৎসর একটা নির্দ্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করে', লেখক ও প্রকাশকদের ঐ তারিখের মধ্যে, বিগত তিন বৎসরে প্রকাশিত তাঁদের বাংলা ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য গ্রন্থের নিদর্শন (বারো কপি করে') রবীন্দ্র-পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবার উদ্দেশ্যে দাখিল করতে আহ্বান করেন। দাখিলীকৃত গ্রন্থগুলি পুরস্কার কমিটি কর্ত্তৃক বিবেচিত হওয়ার পরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী গ্রন্থটিকে তাঁরা (কমিটি) পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেন। তবে শুধু দাখিলীকৃত গ্রন্থই নয় পুরস্কার কমিটি অভিরুচি মতো তার বাইরেও কোনো লেখকের কোনো বইকে পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করতে পারেন। পুরস্কার-কমিটির সদস্য সংখ্যা নয়জন, এঁদের একজন সভাপতি মনোনীত হন। প্রত্যেক বৎসর নূতন কমিটি গঠন করা হয়। আরও কয়েকটি নিয়মও আছে, যেমন, আকাদেমি বা অন্য কোনো পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থ রবীন্দ্র-পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে না। এবং যে-লেখক একবার রবীন্দ্র-পুরস্কার লাভ করেছেন তিনি দ্বিতীয়বার আর এ-পুরস্কারের অধিকারী হবেন না, ইত্যাদি।

নিয়ম কানুন যা আছে, খারাপ নয়। কিন্তু যা খারাপ তা হলো একই ব্যক্তির বারংবার ঐ পুরস্কার কমিটির সদস্য মনোনীত হবার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিষেধ না থাকা। আমাদের মনে হয় যারা একবার সদস্য মনোনীত হবেন তাঁরা পরবর্ত্তী অন্ততঃ তিন বছর আর মনোনীত হতে পারবেন না, এরূপ নিয়ম থাকা উচিত। তারপর একটি বৃহৎ প্যানেল বা নামের লিষ্ট থেকে লটারি করে' প্রতি বৎসর সদস্য নির্ব্বাচন করা যেতে পারে। এ ব্যবস্থার দ্বারা সদস্য মনোনয়নের ব্যাপারে পক্ষপাতের অভিযোগ খণ্ডিত হবে। এবং প্রতি বৎসর পুরস্কার ঘোষণার পরে সে বৎসর কে কে সদস্য ছিলেন তাঁদের নামও ঘোষিত হওয়া ভালো।

আরেকটি নিয়মেরও প্রবর্ত্তন দরকার। প্রতিটি প্রতিযোগী বই-ই যাতে পুরস্কার কমিটি দ্বারা বিবেচিত হয় তার আবশ্যিক বিধি থাকা উচিত। এবছর না কি পঞ্চাশ-বাহান্নটি বই দাখিল করা হয়েছিল। কিন্তু কমিটির যে-চূড়ান্ত অধিবেশনে 'নাট্যকার' বইটিকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়, (কাগজে যে-অধিবেশনের বিবরণ সদস্যদের নিজেদের জবানীতেই পৃথক পৃথক ভাবে প্রদত্ত হয়েছে) সেখানে দাখিলীকৃত অন্য কোনো বই-এর নামও উচ্চারিত হয়-

নি দেখলাম। এটি খুবই রহস্যজনক ব্যাপার। অন্য পঞ্চাশটি বইএর একটির-ও নামোল্লেখ হলো না। সদস্যেরা যে সেগুলি কষ্ট করে' পড়েছেন তাও সুস্পষ্ট নয়। বরং অন্য সন্দেহটাই জাগে। তা হলে' সদস্যরা কি একবার মাত্র একত্রে মিলিত হয়েই দু-এক কথার মধ্যেই স্থির করে' ফেলেন কোন্ বইকে তাঁরা পুরস্কার দেবেন? একজন বইটার নাম প্রস্তাব করলেন, আর সকলে ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলেন! খুবই অদ্ভুত কাণ্ড। কমিটির সদস্যদের অর্থাৎ বিচারক মণ্ডলিকে না কি কোনো পারিশ্রমিকই দেওয়া হয় না। সে-ক্ষেত্রে তাঁরা বেশী কষ্ট করতে যাবেন এমন প্রত্যাশা করাটাও সুবুদ্ধি নয়।

আমাদের মনে হয় কমিটির সদস্যদের শ'পাঁচেক করে' টাকা পারিশ্রমিক দানের ব্যবস্থা থাকা উচিত। এবং তাঁরা যে প্রতিটি প্রতিযোগী গ্রন্থ যত্ন সহকারে পড়েছেন তার নিদর্শন স্বরূপ প্রতিটি বই সম্বন্ধে তাঁদের লিখিত মন্তব্য পেশ করতে হবে। এবং যে পাঁচখানি বই তাঁরা প্রত্যেকে (নিজ অভিরুচি মতো) শ্রেষ্ঠ মনে করেন সেগুলি সম্বন্ধে বিস্তৃততর মন্তব্যও যেন তাঁরা দেন।

তারপর প্রত্যেক বিচারকের মনোনীত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থপঞ্চকগুলি বাছাই করে' যে-কুড়ি পঁচিশখানি বই হবে, (তার বেশী হবে মনে হয় না) তাদের উপরে single transferable preferential voting পদ্ধতি-তে সদস্যদের ব্যালট ভোট নেওয়া হবে। প্রত্যেক বিচারককেই এতে যোগ দিতে হবে। এবং এই ভাবে যে-বই সর্ব্বাধিক ভোটে শ্রেষ্ঠ নির্ব্বাচিত হবে তাকেই রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত করা হবে।

এছাড়া আরেকটি বিধানও থাকা বাঞ্ছনীয় যে, যে-লেখক একবার পুরস্কৃত হলেন পাঁচ বছর পরে তিনি পুনর্ব্বার এ-পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগী হতে পারবেন, কিম্বা তাঁর কোনো গ্রন্থ পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হতে পারবে। ভালো লেখকরা একবার পুরস্কার প্রাপ্তির পরেই যাতে একেবারে ঝিমিয়ে না যান তারই জন্য এরকম বিধি থাকা সঙ্গত।

তারপর, যদি পুরস্কার কমিটির চারজন সদস্যও, তাঁদের লিখিত মন্তব্যে এরূপ মত প্রকাশ করেন যে, সে বছর ঐ পুরস্কারের যোগ্য কোনো উপযুক্ত বইই তাঁরা পেলেন না, তা হলে কমিটি সেবছর কোনো পুরস্কার ঘোষণা করবেন না। তবে সরকার ইচ্ছা করলে প্যানেল থেকে আবার লটারী করে' নতুন একটি কমিটি গঠন করতে পারেন, এবং সেই নতুন কমিটি সেবছর পুরস্কারের বিষয়ে নতুন করে বিবেচনা করতে পারেন, এবং পুরস্কারও ঘোষণা করতে পারেন।

পুরস্কার কমিটির সদস্যদের কোনো মন্তব্যই সাধারণ্যে প্রকাশ করা হবে না। তবে যদি পুরস্কার নিয়ে কুৎসিত বাদানুবাদ সৃষ্টি হয় তখন কমিটি বিবেচনা করে' দেখতে পারেন সদস্যদের কোনো মন্তব্য প্রকাশ করবেন কিনা,কিম্বা কতটুকু করবেন। এবিষয়ে তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

আমাদের মনে হয় এই রকম রক্ষাকবচ সম্বলিত নিয়মাবলী গঠিত হলে' এবং সাধারণ্যে সে বিষয়ে বিশদ প্রচার হলে, রবীন্দ্র-পুরস্কারের ক্ষেত্রে দুর্নীতির সম্ভাবনা অনেকখানি হ্রাস পাবে—জনমনে পুরস্কার সম্বন্ধে নানা সন্দেহ ও অভিযোগেরও নিবৃত্তি হবে।

সমাজচিন্তা

ইমারজেন্সির এক বছর

গত ২৫শে জুন, ১৯৭৬, নয়া ইমারজেন্সির এক বছর পূর্ণ হলো। সরকার ও শাসক দল এই ইমারজেন্সির এক বৎসর পূর্ত্তিকে নানা উৎসব ও ঘোষণা দ্বারা অভ্যর্থিত করেছেন—এই বৎসর কালে ভারত যে বিপুল সাফল্য ও অগ্রগতি অর্জন করেছে তার জন্য নিজেদের অভিনন্দিত করেছেন।

এই এক বছরে ভারতের অর্থনীতিতে ও জনজীবনে যে বেশ কিছু শুভ লক্ষণ সূচিত হয়েছে, শৃঙ্খলা ও কর্ম্মতৎপরতা যে সর্ব্বক্ষেত্রে বেড়েছে, একথা আমরাও স্বীকার করি। এবং এই ইমারজেন্সির সঙ্গে সঙ্গেই যে-কুড়ি দফা কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে এবং রূপায়িত হয়ে চলেছে তারও ফলে যে সমাজের দরিদ্র ও অবহেলিত শ্রেণীদের ত্বরিত উন্নয়নের সম্ভাবনা লক্ষিত হচ্ছে, তাও স্বীকার করি।

কিন্তু তবু প্রশ্ন আছে। প্রথম প্রশ্ন, ইমারজেন্সি আরোপের সময় (গতবছর ২৬শে জুন) যে সব জরুরী কারণ উল্লেখ করে' তার আরোপ আবশ্যিক, অনিবার্য্য ও অপরিহার্য্য বলে' ঘোষণা করা হয়েছিল,—যেমন, দেশের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাতী ও সংহতিবিনাশী শক্তির অতি-অভ্যুদয় এবং সেই আসন্ন জাতীয় বিপদ নিবারণের জন্য জরুরী ক্ষমতা অধিগ্রহণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি—সেই সব কারণ এখনও সমভাবে বিদ্যমান কি না—এবং বিদ্যমান থাকার স্বপক্ষে কী তথ্য ও যুক্তি আছে, আর তা যদি সেরূপ বিদ্যমান

না থাকে তবু জরুরী অবস্থার আরো প্রলম্বন যুক্তিযুক্ত কি না—এই সব কথা আর তেমন আলোচিত ও আলোড়িত নয়। ইমারজেন্সির সার্থকতা দর্শিত হচ্ছে ক্ষেত্রান্তরে গুরুত্ব আরোপ করে,' যথা অর্থনৈতিক উন্নতি, শৃঙ্খলাবোধের বিবৃদ্ধি ও কুড়ি দফা কার্য্যসূচীর বৈপ্লবিক সাফল্য ইত্যাদি।

তাই দ্বিতীয় প্রশ্ন ওঠে, এই অর্থনৈতিক উন্নতি ও কুড়িদফা কার্য্যসূচী প্রভৃতি যতো গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয়ই হোক, ইমারজেন্সি যখন এসকলের জন্যে আরোপিত হয়নি তখন এদের উপলক্ষে ইমারজেন্সি কি দীর্ঘায়িত করার যথেষ্ট যুক্তি আছে? চিন্তা করতে হবে, ইমারজেন্সির জন্যে জনগণকে কী মূল্য দিতে হচ্ছে। তাদের সবগুলি মৌলিক অধিকার এখন প্রত্যাহৃত, আদালতের উচ্চ অধিকার আর নেই, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা একান্ত সঙ্কুচিত, বিরোধী দলগুলির রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ স্তব্ধ, হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্ম্মী বিনাবিচারে অবরুদ্ধ, এবং সরকারের বিরুদ্ধে সব সমালোচনারই কণ্ঠ-রোধ করা হয়েছে। দেশের ঘোর বিপদ ও উপপ্লবের আসন্ন দুর্যোগের মোকা-বিলার জন্য অবশ্যই এ মূল্য জনগণের দেয়। সে প্রশ্নই নেই। কিন্তু সেরূপ ভয়ঙ্কর বিপদ ও দুর্যোগের আশঙ্কা যদি আর বিদ্যমান না থাকে তা হলেও কি ঐ অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও জনজীবনে শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজনে জনগণকে জরুরী অবস্থার এই ভয়ঙ্কর মাশুল আরও দিতে বলা সঙ্গত? ঐ অগ্রগতি ও শৃঙ্খলাবোধ সাধারণ আইন কানুনের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রয়োগের দ্বারা কি আয়ত্তী-ভূত হয় না?

জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে কোনো বিক্ষোভ নেই, এই যুক্তিতে জরুরী অবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী করা উচিত হবে না। সোচ্চার বিক্ষোভ না থাকতে পারে, কিন্তু সরকারের হাতে জরুরী ক্ষমতার বলে যে অকল্পনীয় ও অপ্রতিরোধ্য ভয়ঙ্কর আয়ুধ সকল জমা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিক্ষোভ বা প্রতিবাদের অস্তিত্বের কথা ভাবতে হবে। সাধারণ মানুষ এমনিতেই অত্যন্ত ছা-পোষা, নুন আনতে তাদের পান্তা ফুরায় তাই তারা সর্ব্বদাই শশব্যস্ত। তারা নিজেদের অতি নিকট সমস্যা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না। মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ঙ্কর ক্ষতি ও সমস্যা তারা উপলব্ধিই করতে পারে না। কিন্তু তারা পারেনা এ-সত্বেও তো আমাদের সংবিধান-প্রণেতৃগণ তাদের মানবিক মর্য্যাদার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধায় ঐ সব অমূল্য মৌলিক অধিকারের সম্পদ তাদের দিয়ে গিয়েছেন। তাঁরা জনগণের সচেতনার মাপকাঠিতে ঐ সব অধিকার মাপেন নি, এবং তাদের মহৎ উত্তরাধিকার

নির্দ্ধারণে কোনো কার্পণ্যও করেন নি।

যারা অপেক্ষাকৃত সচেতন তারাও ভীত, সন্ত্রস্ত, সাহসহীন। এ-অবস্থাটা দেশ ও জাতির পক্ষে কল্যাণের নয়। দেশের মানুষ মাথা তুলে কথা বলতে সাহস পাবেনা, এই অবস্থাটা দীর্ঘস্থায়ী হলে জাতির মেরুদণ্ড সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যাবে, মানুষ হিসাবে আমরা অনেক নীচে নেমে যাবো। সেটা যাতে না হয়, ভারতীয়গণ যাতে অকুণ্ঠিত ভাবে সত্যভাষণে সাহসী হয় এবং নিজের আদর্শ ও সত্য উপলব্ধি মতো কাজ করতে সাহসী হয়-তারই উপযুক্ত গণতান্ত্রিক বাতাবরণ অবিলম্বে পুনঃপ্রবর্ত্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় ক্ষতি হয়তো নানা দিক দিয়েই অপূরণীয় হতে পারে। আমরা জাতি হিসাবে মনুষ্যত্ব খুইয়ে বসতে পারি, সরকারের হাতে অতি কেন্দ্রায়িত অপরিসীম ক্ষমতা তাঁদেরকেও স্বেচ্ছাচারী করে' তুলতে পারে, এবং আমাদের ভারতীয় সমাজ জীবনের আদর্শ ও ধারাই নষ্ট হতে পারে। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজির উক্তি—

Centralization as a system is inconsistent with non-violent structure of society'—(Harijan 18.1.42) অবশ্য স্মর্ত্তব্য। এবং কবিগুরুর বাণীও—

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর···
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
··· ··· ··· ···
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।"

যেন আমরা না ভুলি। ঐ দুই মহামনীষী আমাদের জাতীয় জীবনের যে আদর্শের কথা চিন্তা করে' গেছেন আমরা তা থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছি কিনা, তাঁদের সে আদর্শকে আমরা নিষ্ফল করে' দিচ্ছি কি না, এটা আমাদের প্রতিনিয়ত, প্রতি পদক্ষেপে, চিন্তা করতে হবে।

সংবিধান সংশোধন প্রস্তাব

শাসক কংগ্রেস দল ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেছিলেন। এর সভাপতির নামানুসারে এটি 'স্বরণ্ সিং কমিটি' নামে খ্যাত। এই কমিটি তার রিপোর্ট দাখিল করেছে বলে প্রকাশ। লোকসভার আগামী অধিবেশনেই এই সংশোধন প্রস্তাব বিবেচিত এবং—বলা বাহুল্য—গৃহীত হবে, এরূপ শোনা যাচ্ছে।

CENTRAL LIBRARY

কমিটি যে-সব সুপারিশ করেছেন তার মধ্যে কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমতঃ সংবিধানের Preamble বা ভূমিকায় 'সেক্যুলার' (ধর্ম্মনিরপেক্ষ) ও সোস্যালিষ্ট (সমাজতন্ত্রী) এই দুটি কথা নাকি যোগ করা হয়েছে। তারপর, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আদালতের অধিকার সঙ্কুচিত করা হয়েছে,—যেমন, সংবিধানের চতুর্থ অংশে (Part IV-এ) যে নির্দেশক নীতিগুলি সন্নিবেশিত আছে, সেই নীতিগুলির বাস্তব রূপায়ণের উদ্দেশ্যে যে সব আইন প্রণীত হবে,তার উপরে আদালতের হস্তক্ষেপ চলবে না। তা ছাড়া নাগরিকের মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) গুলির সঙ্গে কিছু মৌলিক কর্ত্তব্যও (Fundamental Duties) সন্নিবিষ্ট হবে।

এজাতীয় সংবিধান সংশোধন ব্যাপারটা খুবই বিতর্কমূলক। এবং বর্ত্তমানে ইমারজেন্সির মধ্যে,—যেখানে জনগণের যথার্থ অভিপ্রায় ও অভিমত সংগ্রহ করা প্রায় অসাধ্য—এবং যে-সংসদের জীবন সীমা অতিক্রান্ত হওয়ায় এখন জরুরী ক্ষমতার বলে তার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে, তারই দ্বারা সংবিধানের এই সব মৌলিক পরিবর্তন সাধন, আমরা যে বিশেষ অনুমোদন করি না, পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যাগুলিতে সেবিষয়ে উল্লেখও করেছি। সম্প্রতি প্রখ্যাত আইন-বিদ শ্রীযুক্ত এ. এন. পালখিওয়ালা মহাশয় এই সংবিধান সংশোধন সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান কথা বলেছেন। ২৪/৬/৭৬ তারিখের ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বক্তব্যের বিবরণ থেকে আমরা এখানে অংশ বিশেষ তুলে দিচ্ছি।—

"বোম্বাই, ২৩শে জুন,—শ্রীযুক্ত এ. এন. পালখিওয়ালা গতকলা এখানে বলেছেন যে, স্বরণ্‌ সিং কমিটির কিছু সুপারিশ (ভারতীয়) সংবিধানকে তার স্বকীয়তা থেকে ভ্রষ্ট করবে এবং এ-দেশের গণতান্ত্রিক নীতি পদ্ধতিকে (democratic policy) অগণতান্ত্রিক করে ফেলবে। এখানকার রোটারি ক্লাবের এক অধিবেশনে ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি স্বরণ্‌ সিং কমিটির সুপারিশগুলির পিছনে যে তত্ত্ব বিদ্যমান,যথা সংসদই সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার আধার এবং সংবিধান সংশোধনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী, তার সমালোচনা করে' বলেন যে, এই তত্ত্ব দ্বারা শুধু যে সুপ্রীমকোর্টের কেশবানন্দ ভারতী মামলায় আইনের যে চূড়ান্ত সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হয়েছে তারই সুস্পষ্ট উল্লঙ্ঘন হবে তাই নয়, নীতি হিসাবেও এটি ভ্রান্ত।

শ্রীপালখিওয়ালা বলেন, এই ভ্রান্তির উৎপত্তি হয়েছে সংসদের অভি-প্রায়কেই জনগণের অভিপ্রায় বলে' সিদ্ধান্ত করায়। সংসদ ও বিধানসভার

সদস্যগণের নির্বাচিত হওয়ার পেছনে বহুবিধ কারণ কাজ করলেও তার সঙ্গে সংবিধান সংশোধন রূপ বিষয়ের কোনো সম্পর্কই নেই। এটা বহু দেশে বার বার প্রমাণ হয়ে গেছে—যেখানেই পার্লিয়ামেণ্টের সংবিধান-সংশোধনী প্রস্তাবের পিছনে জন সমর্থন আছে কিনা তা যাচাই-এর জন্যে 'রেফারেণ্ডাম' বা জনমত সংগ্রহ পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ,—অষ্ট্রেলিয়ার জনগণ একটি রেফারেণ্ডামে পার্লিয়ামেণ্টের প্রস্তাবিত বত্রিশটি সংবিধান-সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে মাত্র পাঁচটির পক্ষে ভোট দেয়। শ্রীপালখিওয়ালা বলেন যে, ১৯৭৩ সালে অষ্ট্রেলিয় পার্লিয়ামেণ্ট বিপুল সংখ্যাধিক্যে দু'টি সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব পাশ করেছিল;—কিন্তু সেই দু'টিই জনগণ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নাকচ করে' দেয়।

শ্রীযুক্ত পালখিওয়ালা স্বরণ্ সিং কমিটির প্রস্তাব যে, সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলি (কেবল মাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও অনগ্রসর শ্রেণীর বিশেষ অধিকারগুলি ছাড়া) কোনোটিই সংবিধানের Directive Principles অনুসারী আইন বা সরকারী আদেশের বিরুদ্ধে কার্যকর হবে না, অর্থাৎ আদালতে গ্রাহ্য হবে না, তারও সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, এর ফলে অমূল্য মানবিক অধিকারগুলি, যার মধ্যে বাঁচবার অধিকার, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অধিকার, বাক্ স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, পরস্পর মেলামেশা করা ও সভা সমিতিতে শান্তিপূর্ণভাবে মিলিত হবার অধিকার, ভারতবর্ষের সর্বত্র স্বাধীন ভাবে যাতায়াতের অধিকার, এ সব অধিকারই অন্তর্ভূত, সে সবই বিলুপ্ত হবে।

শ্রীযুক্ত পালখিওয়ালা ঐ কমিটির অপর একটি প্রস্তাব, যে,—কোনো আইন সংবিধান-অসিদ্ধ ঘোষণার জন্য সুপ্রীম কোর্টের ফুল-বেঞ্চের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রয়োজন হবে, তারও সমালোচনা করেন। কারণ এর অর্থ হবে, কোনো আইন সুপ্রীম কোর্টে সংবিধান-অসিদ্ধ ও অগ্রাহ্য সাব্যস্ত হলেও তা যেহেতু দুই তৃতীয়াংশ বিচারপতির সংখ্যাধিক্যে ঘোষিত হলো না তাই সে-আইন শাসন কর্তৃপক্ষ জনগণের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে' চলতে পারবেন। এরকম বিধান Rule of Law বা আইনানুগ শাসনের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং তা সংবিধানের একটি মূল নীতিরই মূলোচ্ছেদ করবে।"...

আমরা এই খ্যাতনামা আইন বিশারদের সমালোচনার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি। আশা করি সংবিধান সংশোধন কমিটিও এর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ ও গুরুত্ব দেবেন।

CENTRAL LIBRARY

নির্বাচন আসন্ন ?

একটা কথা আজকাল অনেকের মুখেই শোনা যাচ্ছে। সংসদীয় নির্বাচন নাকি শীঘ্রই হতে পারে। এবং ইমারজেন্সির অবসানও যে তার জন্য একান্ত আবশ্যিক তাও নাকি নয়। স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীই সেদিন (দ্রঃ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান, কলকাতা ১২.৭.৭৬) এক আমেরিকান টেলিভিসনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, এর পূর্বের সংসদীয় নির্বাচনের কালেও একটি ইমারজেন্সি বলবৎ ছিল, কাজেই ইমারজেন্সি চালু থাকাটা নির্বাচনের পক্ষে কোনো প্রতিবন্ধক বলে' গণ্য হওয়ার কারণ নেই।

আমরা জানিনা শাসকদল শেষ পর্য্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে যদি তাঁরা শীঘ্র সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা হলে' এটাও তাঁরা যেন বিচার করেন, গণতান্ত্রিক নির্বাচনের অনুকূল বাতাবরণ দেশে আছে কিনা।

এখন তা যে নেই তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বহু রাজনৈতিক কর্ম্মী যখন বিনাবিচারে কারারুদ্ধ এবং 'মিসা'র ভয়ে কেউই প্রায় মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছেন না ; সংবাদপত্রও কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে স্বাধীন প্রকাশ-মাধ্যম হিসেবে অস্তিত্ব হারিয়েছে ; 'হেবিয়াস কর্পাসে'র অধিকার ও অন্যান্য সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারগুলি প্রত্যাহৃত,—তখন গণতন্ত্রসম্মত অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে না। কিন্তু অবাধ নির্বাচন না হলে সে-নির্বাচন অর্থহীন হবে। বরং নির্বাচন না হওয়াও ভালো, প্রয়োজনে বর্ত্তমান সংসদের কালসীমা আরও বাড়ানোও যেতে পারে,—কিন্তু স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচনের উপযুক্ত আবহাওয়া ফিরিয়ে না এনে নির্বাচন অনুষ্ঠান মোটেই সঙ্গত হবে না। বর্তমান ইমারজেন্সির প্রত্যাহার কিম্বা তাকে যথোচিত শিথিল না করা হলে সে আবহাওয়া ফেরা সম্ভব নয় বলেই আমরা মনে করি।

CENTRAL LIBRARY

গ্রন্থসমালোচনা

Scholar Extraordinary : by Nirad C. Chaudhuri—Publishers—OxfordUniversity Press, London : Indian Edition by Oxford University Press, Delhi—6 : Pages : 393+8 : Price : Rs 85/=

ম্যাক্সমূলার বা মোক্ষমূলর ("মোক্ষমূলর বলেছে আর্য্য সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য্য") বর্তমান কালে—ভারতবর্ষেও—একটি প্রায় বিস্মৃত বিধূসর নাম। তাঁর কৃতি জ্ঞান বিজ্ঞানের কোন্ বিভাগের অন্তর্গত, তাঁর শ্রেষ্ঠতা কোথায় এবং কতখানি, তিনি কোন্ দেশের মানুষ, ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র কোথায়—এসব প্রশ্নের অত্যন্ত ভাসা ভাসা উত্তরও সাধারণ শিক্ষিত মহলে এখন পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। তাই একালে ম্যাক্সমূলারের একটি সুবৃহৎ জীবনী প্রকাশ—এবং তাও যখন তাঁর প্রথম মৃত্যু শতবার্ষিকী ও দ্বিতীয় জন্ম শতবার্ষিকা দুইই দূর ও দূরতরবর্ত্তী তখন—বলতে গেলে একটু অসাধারণই। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের এই আশ্চর্য্য উদ্যমের পেছনের কারণটা জিজ্ঞাস্য হতে পারতো যদি না জীবনী লেখকের নামটা শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী হতো। বেশ বোঝা যায়, নীরদবাবুকে ম্যাক্সমূলারের আগ্রহী জীবনীকার রূপে পেয়ে তাঁরা নিশ্চিত হয়েছিলেন যে এটি একটি অত্যন্ত উপাদেয় গ্রন্থ হবে এবং সর্বদেশের পরিশীলিতমানস পাঠক মহলে সাদরে গৃহীত হবে। প্রকাশকদের এ বিশ্বাস নির্ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে। গ্রন্থখানি রচনাগুণে—রচয়িতার বৈদগ্ধ্য ও ব্যক্তিত্বের গুণে—একটি অসামান্য সাহিত্য কর্ম হয়ে উঠেছে। এবং শুধু তাই নয়, ম্যাক্সমূলারের সর্বাবয়ব প্রতিকৃতি হিসাবেও এ-জীবনী গ্রন্থটি যে অদ্বিতীয় বলে গণ্য হবে, তাও নিঃসন্দেহে বলা চলে।

তবে তথ্যের পূর্ণতায় জীবনীর সার্থকতা নয়। তথ্যের স্তূপে মানুষটিই যদি চাপা পড়ে তা হলে সে-তথ্য বৈভবের কোনো দাম নেই, জীবনীর আসল উদ্দেশ্যটাই সেখানে ব্যর্থ। মানুষটিকে আমাদের চিত্তের গোচর ও প্রত্যক্ষগম্য করতে হবে, মানবিক রসে সমৃদ্ধ করে আকর্ষণীয় করতে হবে, নইলে তিনি থাকবেন একটি ছায়াসদৃশ নাম, ও তথ্য ঝোলানোর বিবিধ

গৌজ বিশিষ্ট এ ধটি দারুমূর্ত্তি হয়ে। সার্থক জীবনী রচয়িতাকে তাই শুধু তথ্যের সুমিত ব্যবহার জানলেই হবে না, সার্থক ঔপন্যাসিকের মতো, ঘটনা-যে চরিত্রের প্রকাশক এবং সেখানেই তার মূল্য ও তাৎপর্য্য এ-বোধেও স্থিতচেতন থাকতে হবে। অর্থাৎ ঔপন্যাসিকের রসদৃষ্টিতে কেন্দ্রবর্ত্তী মানুষটিকে দেখে', তথ্য নির্বাচন করে,' তার আলোকে মানুষটিকে উদ্ভাসিত করতে হবে। তথ্যের নির্বাচন সব জীবনীকারকেই করতে হয়। কিন্তু কোন্ তথ্য দ্বারা আসল মানুষটি আলোকিত হবে, তাঁর ব্যক্তি স্বরূপ আমাদের রস-দৃষ্টির গোচরীভূত হবে, তা বোঝা ও জানাই শ্রেষ্ঠ জীবনীকারের অভিজ্ঞান। এটা তাই অস্বীকার্য্য নয় যে, জীবনী রচনাও উপন্যাস রচনার মতোই সৃজনী কর্ম: রসকল্পনার দৃষ্টিতে চরিত্রটিকে প্রত্যক্ষ করে' ঘটনার দ্বারা তাকে ব্যঞ্জিত করা। কিন্তু ঔপন্যাসিকের চেয়েও জীবনীকারের কাজ বোধ হয় কঠিনতর যেহেতু ঔপন্যাসিক স্বাধীন কল্পনার আনন্দলীলায় চরিত্রকে সৃষ্টি করেন জীবনীকারকে বিপুল তথ্য সম্ভারের জটিলতা ভেদ করে চরিত্রের অন্তরতম সত্য রূপটি হৃদয়ঙ্গম করে' তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনার আলোকে তাকে পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ করতে হয়। এটি তাই দুরূহতর শিল্প কর্ম। এবং এ কারণেই সব সাহিত্যেই মহৎ উপন্যাসের তুলনায় মহৎ জীবনীর এতো স্বল্পতা। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে একটিও মহৎ জীবনী রচনার সাক্ষাৎ মেলে না। ইংরাজী সাহিত্য অন্যান্য দিকের মতো এদিকেও সমৃদ্ধতর, কিন্তু তবু এ-বিভাগে মহৎ নিদর্শন খুব বেশী নেই।

শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরী কৃত আলোচ্য এই জীবনী গ্রন্থটি ইংরাজী সাহিত্যের জীবনী বিভাগকে যে সমৃদ্ধতর করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এজন্য তিনি অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য।

তাঁর কালে ও তাঁর অনতিদূর পরবর্ত্তীকালে আচার্য্য ম্যাক্সমূলার তাঁর বিশ্ববিশ্রুত পাণ্ডিত্যের জন্য পরিচিত ছিলেন। সায়নভাষ্য সহ সমগ্র ঋগ্‌বেদ সম্পাদনা তাঁর মহৎ কীর্ত্তি। পঞ্চাশ খণ্ডে Sared Books of the East গ্রন্থমালার প্রকাশনাও তাঁর অপর সমুচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভ। তাঁর জীবৎকালীন য়ুরোপে সংস্কৃত চর্চা ও ভারত-বিদ্যাচর্চার তিনি ছিলেন মহত্তম নায়ক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ; ভাষা-বিজ্ঞান (Linguistics) ও তুলনামূলক ব্যাকরণ চর্চার (Comparative Gramar এর) ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অগ্রণী ও বিশিষ্ট একটি নাম। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অনুশীলনেও (Comparative Religion-এ) মৌলিকতায় ও গভীরতায় তাঁর অবদান সকলের শ্রদ্ধা

আকর্ষণ করেছিল। মানুষের চিৎশক্তির ক্রমবিকাশের পদচিহ্নগুলি তিনি ভাষা-বিজ্ঞানের ও প্রাচীন পুরাণ কাহিনীর মধ্যে অন্বেষণ করেছিলেন—এবং এ ক্ষেত্রেও তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা সর্বজনমান্যতা লাভ করেছিল। অর্থাৎ মানব সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজ্যে ম্যাক্সমূলার তাঁর দেশে কালে ছিলেন উত্তুঙ্গ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। এ কথা এ জন্যেই বিশেষ করে বলছি ও বিশেষ রূপে স্মর্তব্য যে মনীষায় ও পাণ্ডিত্যে যিনি এরূপ হিমালয় সদৃশ বিরাট পুরুষ তাঁকে একটি বিরাট মস্তিষ্ক রূপে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। ব্যক্তিত্ব বলতে যে ছায়া-রৌদ্র-লীলায়িত ভয়-বিস্ময়-আনন্দ-বেদনা-কম্প্র রহস্যপ্রগাঢ় ব্যক্তি স্বরূপের কথা মনে আসে এরূপ সার্বভৌম সম্রাট পণ্ডিতদের অনুষঙ্গে তা একেবারেই আসে না। বিশেষ, যে-পাণ্ডিত্য প্রাচ্য-বিদ্যারূপ প্রায়ান্ধকার মহাদেশ-আশ্রয়ী, ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব রূপ বিভীষিকার রাজ্যে যার বিচরণ, সেখানে গোটা মানুষটাই যে প্রত্নশীলায় রূপান্তরিত এরূপ সম্ভাবনাই মনে প্রবল হয়। কিন্তু এরূপ আপাত নৈরাশ্যজনক ক্ষেত্রেও যে অপরূপ ব্যক্তিত্বের সুষমা ও সুরভি, বেদনাকম্প্র সৌকুমার্য্য ও দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তা বিদ্যমান থাকা সম্ভব, এ-অবিশ্বাস্য সত্য কেবল মহৎ জীবনালেখ্যকার দ্বারাই উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। ম্যাক্সমূলারের এই জীবনীটিতে তাঁর এই একান্ত মানবিক সত্তাটি গভীর সহানুভূমির সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে' তাঁর প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য, তপস্যা ও সিদ্ধির চিত্রও যে কিছু মাত্র ফিকে হয়ে গেছে তাও নয়। দিগ্বিজয়ী মহামহোপাধ্যায় আচার্য্যের কৃতি ও কীর্ত্তির গুরুত্ব বিন্দুমাত্র কোথাও হ্রাস করা হয়নি। পরিপ্রেক্ষিতের এই যাথাযথ্য এই জীবনালেখ্যর একটি বিশিষ্ট গুণ। অনুপাত ও সামঞ্জস্য কোথাও সামান্য মাত্রও স্খলিত নয়।

ম্যাক্সমূলারের জন্ম, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে, জার্ম্মানীর আনহাল্ট দেসাউ নামক অতি ছোট একটি ডাচির রাজধানী দেসাউ সহরে। পিতা ভিলহেল্‌ম্ মূলার ছিলেন সুকবি ও ডিউকের গ্রন্থাগারিক। কিন্তু হটাৎ অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটায় ম্যাক্স শৈশবেই হয় পিতৃহীন। মায়ের আত্মীয় স্বজনরা অভিজাত শ্রেণীর হলেও ম্যাক্সকে শৈশবেই কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে পড়তে হয়। মা ছিলেন বিদুষী, এবং অসাধারণ চরিত্রবতী। আর বিয়ে করলেন না। তাঁর কাছ থেকেই ম্যাক্সএর চরিত্রে গভীর ঈশ্বর প্রীতি ও ঈশ্বরনির্ভরতা সঞ্চারিত হয়েছিল। দেসাউ-এ উচ্চশিক্ষার ভালো ব্যবস্থা ছিল না, তাই তেরো বছরের মেধাবী পুত্রকে বিধবা মা পাঠিয়ে দিলেন লাইপজিগে। সেখানে উচ্চ

বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে কৃতিত্বের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হলেন ম্যাক্স ও কুড়ি বছর বয়সেই "ডক্টরেট" অর্জ্জন করে প্রতিভার পরিচয় দিলেন। তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভাও উল্লেখ করতে হয়। অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি সঙ্গীতে, বিশেষ করে পিয়ানো বাদনে, পারদর্শিতা অর্জ্জন করেন। সঙ্গীতকে বৃত্তিহিসাবে গ্রহণ করার কথা তাঁর মনে হয়নি—কারণ তাঁর বিধাতানির্দ্দিষ্ট বৃত্তি, সংস্কৃত চর্চ্চা, প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই তাঁকে বরণ করে নেয়—তবে সঙ্গীত ছিল তাঁর জীবনে সান্ত্বনা, নির্ভর স্থল ও আনন্দের উৎস। এবং সঙ্গীতে অসামান্য দক্ষতাই তাঁকে প্রথম জীবনে সর্ব্বত্র দিয়েছে সাগ্রহ প্রবেশ পত্র ও সকল হৃদয়ের আতিথেয়তা।

শৈশবের পশ্চাদপট-টি সকলের জীবনেই বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। ম্যাক্স মূলারের জীবনে আনহাল্ট-দেসাউ-এর স্থানও সামান্য নয়। উনিশ শতকের প্রথম পর্ব্বের বড়-ছোট নানা ডিউকডমে বিভক্ত সেই জার্ম্মানী, যেখানে আনহাল্ট দেসাউএর মতো অতি ক্ষুদ্র ডাচিও ছিল, এবং ছিল সেই অতিছোট রাজ্যের বিশিষ্ট জীবন ধারা—এই ঐতিহাসিক পরিবেশটি সুন্দর ফুটে উটেছে এইগ্রন্থে। সেই শান্ত মন্থর নিরুদ্বেগ ঐতিহ্যশাসিত সুনিয়ত সমাজ ও সহৃদয় ভদ্রজীবন, এই পরিবেশের প্রভাব ম্যাক্স মূলারের জীবনে সামান্য নয়। কোনো মানুষকে জানতে হলে তার পরিবেশের মধ্যেই তাকে দেখতে হবে, সেখানেই আদানে-প্রদান, কাজে কর্ম্মে সে নিজেকে প্রকাশ করছে, পরিণতিও লাভ করছে। এই পরিবেশ যেমন মানবিক ও সামাজিক, তেমনি ভৌগলিক সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিকও। শ্রীচৌধুরী পরিবেশের এই প্রধান ও সর্ব্বগত ভূমিকার কথা কখনো বিস্মৃত হননি। সে যুগের জার্ম্মানী, আনহাল্ট-দেসাউ, লাইপজিগ, বার্লিন, প্যারিস, লণ্ডন, অক্সফোর্ড,—এই ভৌগলিক নামগুলি যে-ইতিহাস সংস্কৃতি ও সমাজের অন্যোন্যপ্রবিষ্ট Gestalt বা সামগ্রিক অস্তিত্বে সত্য ছিল, লেখক আশ্চর্য্য তথ্যাভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে তাকে তুলে ধরেছেন। আমরা তাঁর নায়ককে এই দেশকাল সমাজ সংস্কৃতির সর্ব্বতোপ্রবিষ্ট প্রতিবেশের মধ্যে সর্বদা দেখি বলে' তিনি এত বাস্তব ও প্রত্যক্ষগম্য হয়েছেন।

সংস্কৃতচর্চাকে জীবনের ধ্রুবতারা করে দর্শনের ডক্টরেট ম্যাক্সমূলার অস্থির ভাবে বার্লিন প্যারিস লণ্ডন ও অক্সফোর্ডে ছুটাছুটি করেছেন। কী কঠিন তপস্যা, কী সাধনা ও একাগ্রতা। অনেক নৈরাশ্যের মধ্যে দৈব সংযোগের মতো দুটি একটি ঘটনা—বুরনুফ, বুনসেন, উইলসন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, ঋগ্‌বেদের অনুলেখন, সম্পাদনা, সায়ন ভাষ্যসহ প্রকাশের আয়োজন—কেমন

ধীরে ধীরে, কার অলক্ষ্য ইঙ্গিতে মূলারের তীরে যেন তরী এসে ঠেকে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসে ঋগ্‌বেদ ছাপা হতে থাকে, মূলারের ভৃতি বাৎসরিক দুশো পাউণ্ড ধার্য্য হয়। কী অদ্ভুত যোগাযোগ। এই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপনা কর্মে তাঁকে বাকী জীবন (চুয়ান্ন বছর) কাটাতে হবে, এবং অক্সফোর্ডকে কেন্দ্র করেই তাঁর মহৎ কীর্ত্তিগুলি জগতে ঘোষিত হবে। সবই যেন পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট। প্রথমে য়ুরোপীয় ভাষাগুলির টেইলরিয়ান উপ-অধ্যাপক পদ, পরে অধ্যাপক পদ, এবং অবশেষে নবসৃষ্ট ভাষাতত্ত্ব ও তুলনামূলক ব্যাকরণের অধ্যাপক পদ—ধাপে ধাপে ম্যাক্স মূলার অক্সফোর্ডের সারস্বত মণ্ডলে সম্মানের আসনে আরোহণ করেন। তাঁর মহত্তম কীর্ত্তি, ছয়খণ্ডে সায়নভাষ্যসম্বলিত সম্পূর্ণ ঋগ্‌বেদ এর প্রকাশ, ১৮৪৭ থেকে ১৮৭৩,এই ছাব্বিশ বছরের ফসল। কিন্তু এই কালপর্ব্বের মধ্যেই, এবং ঋক্‌বেদ প্রকাশনার নিরবচ্ছিন্ন ব্যাপৃতির মধ্যে, তাঁর জীবনের সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি ঘটে। এর মধ্যে তাঁর প্রেম ও বিবাহ মুখ্যতম। ১৮৫৩-র ২৬শে নভেম্বর ত্রিংশৎ বর্ষীয় মূলার উনিশ বছরের ইংরেজ কন্যা জর্জ্জিনা গ্রেনফেলকে দেখেন ও দেখা মাত্র প্রেমে পড়েন। কিন্তু ধনী কন্যাপক্ষের দ্বারা তাঁর বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। তারপর দীর্ঘ ছয় বৎসর মূলার অনন্যব্রতী নিষ্ঠায় ঐ আশাহীন প্রেমকে রক্তাক্ত হৃদয়ে লালন করে' চলেন। অবশেষে প্রেমের তপস্যার জয় হয়। মূলার-সংবরণ জর্জ্জিনা-তপতীকে লাভ করেন। তবে তাঁর তপস্যার সঙ্গে কন্যার তপস্যাও মিলিত হয়েছিল এবং কন্যার নিদারুণ স্বাস্থ্য-ভঙ্গই কন্যার পিতাকে মত পরিবর্ত্তণে বাধ্য করে।

ম্যাক্স মূলার ও জর্জ্জিনার প্রেম ও বিবাহিত জীবন দুইই কাব্যের মতো অনুপম। জীবনীকার বলেছেন, এই প্রেম রোমান্টিক প্রেমের এক মহোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রোমান্টিক আন্দোলনের অনেক অমূল্য অবদানের মধ্যে মধ্যযুগীয় একনিষ্ঠ স্বর্গীয় প্রেমের আদর্শের পুনরুদ্ধারকেও অন্যতম বলেছেন তিনি। তাঁর মতের সঙ্গে সর্ব্বাংশে পাঠকের মিল না হলেও এটা অনস্বীকার্য্য যে, এই জাতীয় বুদ্ধিদীপ্ত ভাষ্যর আলোচনা—যা নানা ভাবেই বহুস্থলে অনায়াসে এসে পড়েছে এই গ্রন্থে—গ্রন্থটির উপাদেয়তাকে কোনো অংশে ক্ষুণ্ণ করেনি, বরং বাড়িয়েছে। জীবনীকার শ্রীচৌধুরী লিটন ষ্ট্র্যাচির গোত্রের নন। বরং বলা চলে তাঁর গোত্র কিছুটা কার্লাইলের। তিনি ষ্ট্র্যাচির মতো ঘটনার বিন্যাসের মধ্যেই সব কিছু উহ্য ও স্বপ্রকাশ রাখেন নি। তিনি ঘটনাকে সব কথা বলতে দিয়েও নিজেও গভীর আগ্রহে তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করে'

চলেছেন এবং মাঝে মাঝে য়ুরোপীয় সাহিত্য সংস্কৃতি সঙ্গীত চিত্রকলা বিষয়ে মতামতও দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। কিন্তু যেহেতু তাঁর বৈদগ্ধ্য প্রশ্নাতীত, ও তাঁর উক্তি সর্ব্বদাই অকপট ও প্রত্যয়ভূয়িষ্ঠ, তাই তা পাঠককে কখনো প্রতিহত করে না। বরং একজন পরিশীলিতচিত্ত জীবনরসিক দার্শনিকের আলাপন ও সাহচর্য্য আনন্দই দেয়।

ঋগ্‌বেদের পরে Sacred Books of the East-এর সম্পাদনা পঞ্চাশ খণ্ডে। এরই মধ্যে চললো তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের উপর গভীর তত্ত্বদর্শী আলোচনা; মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাসের সন্ধান; 'মীথলজি'র তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ; সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত রচনা; উপনিষদের অনুবাদ; ধর্মপদের অনুবাদ; আপস্তম্বসূত্রের অনুবাদ; বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা; ভারতীয় ষড়্‌দর্শনের আলোচনা। রামকৃষ্ণ-পরমহংসদেবের জীবনী; "India : What Can It Teach Us ?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে এক রহস্যময় গভীর প্রীতি নাড়ীতে নিয়ে জন্মে-ছিলেন ম্যাক্সমুলার। এ তাঁকে কখনো স্থির থাকতে দেয় নি। সংস্কৃতের প্রতি তাঁর চিত্তকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করেছে। এবং কৃতবিদ্য যুবক মূলারকে তাঁর বিধাতানির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম উদ্‌যাপনের জন্য দেশ থেকে দেশান্তরে টেনে নিয়ে গেছে এবং অবশেষে 'উক্ষতরণাভিধানগরে' (অর্থাৎ অক্সফোর্ডে) 'ভট্ট মোক্ষমূলর' রূপে তাঁকে দিয়ে, ঋগ্‌বেদ উদ্ধার (অর্থাৎ প্রকাশ) করিয়েছে। সারা জীবনই তিনি ভারতের কল্যাণ, ভারতের মানুষের কথা, ধর্ম্মের কথা, জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা চিন্তা ও আলোচনা করে গেছেন, পরম ভক্তের মতো, বন্ধুর মতো, আত্মীয়ের মতো। কোথা থেকে এলো এই অহৈতুকী প্রীতি ভক্তি আত্মীয়তা ? একে "জননান্তর সৌহৃদং" বলতে ইচ্ছা করে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী সঙ্কলিত "স্বামী শিষ্য সংবাদ"গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দও এমনই একটা কথা বলেছেন।—

"মনে হ'ল কি জানিস—সায়নই নিজের ভাষ্য নিজে উদ্ধার করতে ম্যাক্স-মূলর-রূপে পুনর্বায় জন্মেছেন। আমার অনেক দিন হতেই ঐ ধারণা। ম্যাক্সমূলরকে দেখে সে ধারণা আরও যেন বদ্ধমূল হয়ে গেছে।" ("স্বামীশিষ্য সংবাদ"—পৃঃ ৩৪)

অক্সফোর্ডে মূলারের গৃহ ভারতীয়দের জন্য সদা অবারিত ছিল। তিনি

তাঁদেরগণ্য করতেন পরমাত্মীয় বলে'। ভারতীয় ভূখণ্ডে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিও সাগ্রহ সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন তিনি সারা জীবন। ভারতীয়দের অতীতের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা এবং তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য সদাজাগ্রত উৎকণ্ঠা—মূলার চিত্তের এই স্থায়ীভাবের কোনো ব্যত্যয় কখনো ঘটেনি।

তবে এটা মনে করলে ভুল করা হবে যে, ম্যাক্সমূলরের সব প্রীতি শুধু ভারতের প্রতিই নিবদ্ধ ছিল। ম্যাক্সমূলারের জার্মান জাতীয়তাবাদও তাঁর চরিত্রের অপর লক্ষণীয় দিক। এবং এই প্রীতির প্রেরণায় তিনি তাঁর সুদীর্ঘ ইংলণ্ড বাস কালে জার্মানীর বেসরকারী রাষ্ট্রদূতের ভূমিকা গ্রহণ করে', ইংরেজদের কাছে (ও বিশ্বের কাছে) জার্মানীর রাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যা ও সমর্থন করে গেছেন। বিশেষ করে' প্রুশিয়ার সঙ্গে ডেনমার্কের যুদ্ধের সময় এবং পরে অষ্ট্রো-প্রুশিয়ান ও ফ্র্যাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের সময়, এই তিনবার, জার্মানদের বিশেষ বক্তব্য ও তৎ-স্বপক্ষে যুক্তি তুলে ধরতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। সংবাদপত্রে চিঠি লিখে ও সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ দ্বারা এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে চিঠিপত্র ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তিনি অক্লান্তভাবে জার্মানীর স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে' গেছেন। তাঁর সহস্রবিধ সারস্বত কর্ম, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে গবেষণার মধ্যেও ঐদিকে তাঁর মনোযোগ অথবা সময়ের কখনো অভাব ঘটেনি। এই জার্মানী-প্রীতি এবং অপরদিকে ভারতপ্রীতি, এই দুটি loyalty তাঁর স্বভাবের দুটি বৃহৎ আবেগ। জার্মানী-প্রীতি প্রীতিরসে তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে' মাঝে মাঝে বিচিত্র অপযুক্তি ও আত্মখণ্ডনে টেনে নিয়ে গেছে তাঁকে—বিসমার্কের যুদ্ধবাজ নীতিকে ন্যায় ধর্মের যুক্তিতে সমর্থনের চেষ্টা করলে তা অপ্রত্যাশিতও নয়। কিন্তু স্বাজাত্যপ্রীতির এমনি মোহ যে. প্রায় আজীবন প্রবাসী ম্যাক্সমূলর তাঁর এজাতীয় আত্মখণ্ডন ও যুক্তির স্খলন বুঝতে পারতেন না। ওদিকে এই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতই আবার দুরূহ শাস্ত্র, দর্শন, ভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদির আলোচনার নির্মোহ সত্যের প্রতি স্থিরনিবদ্ধ দৃষ্টি! মানুষের মনের এই যে বৈপরীত্য, শক্তি ও দুর্বলতার এই যে সহাবস্থিতি, আলোক ও অন্ধকারের এই যে কোলাকুলি এখানেই মানব চরিত্রের গহন দুর্জ্ঞেয়তা। এবং তার চমৎকারিতাও এইখানেই।

আসলে ম্যাক্সমূলারের অন্তঃপ্রকৃতি ছিল আবেগপ্রবণ। এবং সেই আবেগই তাঁর জ্ঞানতপস্যার পিছনেও প্রেরণা জুগিয়েছে। মূলারের

অপরিসীম স্নেহপ্রবণতা (তাঁর প্রথমা কন্যা আডার মৃত্যুর পরে তিনি যেভাবে কন্যার স্মৃতির মধ্যেই দীর্ঘ দশ বৎসর কাল নিমজ্জিত হয়ে বাস করেন), প্রণয়ে নিষ্ঠা, মাতৃভক্তি, ভগবদ্‌ভক্তি, এ সকলেরই উৎসে তাঁর স্বভাবের গভীর-তলশায়ী আবেগপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। 'টিউটনিক' আত্মশাসন, ধৈর্য্যশীলতা ও আপাত-ঔদাসীন্যের অন্তরে প্রবল আবেগ সর্বদা ক্রিয়াশীল ছিল তাঁর প্রকৃতিতে।

তপস্বীর তপশ্চর্য্যার পিছনে যদি না আবেগ কাজ করে, তার তপস্যার প্রেরণা আসবে কোথা থেকে ? যে যতো বড় তপস্বী, যার আত্মত্যাগ যতো বিরাট তার অন্তর্নিহিত আবেগও নিঃসন্দেহে তদনুপাতী। আজীবন বিদ্যাব্রতী ম্যাক্সমূলারের তপশ্চর্য্যার কঠোরতা, বিস্তার ও পরিধি আমরা দেখি ও বিস্মিত হই। কিন্তু এর পিছনের বাষ্পবেগ, অন্তঃস্রোতোশীল আবেগ-প্রবাহ আমরা লক্ষ্য করি না। তপস্বীর এই মানবিকতা, জ্ঞানতাপস ম্যাক্সমূলরের এই একান্ত মানবধর্ম্মিতা জীবনীকার চৌধুরী মহাশয় আশ্চর্য্য মর্মজ্ঞ সহানুভূতির সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। ম্যাক্সমূলর চরিত্র উপন্যাসের চরিত্রের মতোই সারল্যে জটিলতায়, মুগ্ধতায় মহত্বে, বীর্য্যবত্তায় দুর্বলতায়, অসাধারণ আকর্ষণীয়—এই অপূর্ব সত্যটি আমরা নীরদ চৌধুরী মহাশয়ের এই জীবনী আলেখ্য থেকে লাভ করি। এ গ্রন্থ পাঠ একটি দুর্লভ অভিজ্ঞতা। শ্রদ্ধায় ও প্রীতিতে ম্যাক্সমূলারের মহত্ব ও মানবিকতা হৃদয়ে অনুভব করতে পারাও কম সৌভাগ্য নয়।

123

istration No. R. N. 18431/70 rice Rs.
EKHYA Vol. VI No. 6 May-June

দার্জিলিঙে বর্ষার সজল রূপ উপভোগ করুন

আপনার চারপাশে রয়েছে অপরূপ সবুজ প্রান্তর আর চা-বাগান। এপাশে-ওপাশে রয়েছে বন্য বৃক্ষের সমারোহে পূর্ণ পাহাড়ের সারি। উপরে তুষারকিরীটী কাঞ্চনজঙ্ঘা। সর্বত্রই নয়ন মনোহর প্রাকৃতিক শোভার অফেল সম্ভার। রঙিন্নাত গোলাপ, লিলি আর রকমারি অর্কিড দেখে চোখ ফেরাতে পারবেন না। সবসময়ে দেখবেন আপনাকে ঘিরে রয়েছে সাদা, পেঁজা মেঘের রাশি···।

এই হ'ল বর্ষায় দার্জিলিঙ। স্নিগ্ধ, সজল ও অপরূপ। কখনও মন ভোলাবে, কখনও বিস্ময়ে, আনন্দে মন ভরে তুলবে।

আপনি যাতে দার্জিলিঙ ও কালিম্পঙে বর্ষার রূপ উপভোগ করতে পারেন, তার জন্যে ওখানকার প্রতিটি ট্যুরিস্ট লজে এসময়ে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়। জুলাই ও আগস্ট মাসে এই সুবিধা পাবেন।

বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন :
রিজার্ভেশন কাউন্টার, ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, ৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ঈস্ট), কলিকাতা-৭০০ ০০১ অথবা ট্যুরিস্ট লজের ম্যানেজারদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

বিশদ বিবরণের জন্যে যোগাযোগ করুন :

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

দার্জিলিঙ, ফোন : ২০৫০ গ্রাম : DARTOUR
কিংবা ৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ্ বাগ (ঈস্ট)
কলিকাতা-৭০০ ০০১ ফোন : ২৩-৮২৭১ গ্রাম : TRAVELTIPS
পর্যটন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।